শ্রীশ্রীঠাকুরকে
যেমন
দেখেছি
শ্রীনাথ

মুখবন্ধ

সব গ্রন্থেরই মুখবন্ধ লেখার একটি রীতি আছে। সেই রীতি মেনেই এ-গ্রন্থের জন্যেও মুখবন্ধরূপে দু-চার কথা লিখতে হচ্ছে।

ইতিপূর্বে শ্রীধাম দেওঘর থেকে পরমপুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের মল্লিখিত জীবনকথা একাধিক গ্রন্থ রূপে প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্গভাষাভাষী পাঠক সেই গ্রন্থ পাঠ করে তৃপ্ত হয়েছেন, এ-ঘটনা গ্রন্থকারের কাছে অবশ্যই আনন্দবহ। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মভূমি ও প্রথম লীলাভূমি শ্রীধাম হিমাইতপুরের তথা বাংলাদেশের পুরুষোত্তম–চেতন নরনারীর এক বৃহদংশের একান্ত সাধ ছিল— তাঁর এই জীবনীকারের একখানি জীবনীগ্রন্থ সৎসঙ্গের আদি আশ্রমক্ষেত্র শ্রীধাম হিমাইতপুর থেকেও যেন প্রকাশিত হয়।

তাই, অনেক দিন থেকেই বাংলাদেশবাসী সৎসঙ্গিবৃন্দ লেখকের সঙ্গে সেই চেতনা থেকে আলোচনারত ছিলেন। বাংলাদেশান্তর্গত শ্রীধাম হিমাইতপুর থেকে তদ্দেশীয় সৎসঙ্গের নায়ক-ব্যক্তিত্ব প্রথিতযশা পণ্ডিত ড. রবীন্দ্রনাথ সরকার সকলের হয়ে লেখকের সঙ্গে সেই অভিলাষের কথা জানিয়ে এসেছেন। তারই ফলস্বরূপ এই গ্রন্থ-প্রকাশের আয়োজন। বিনম্রচিত্তে সকল বাংলাদেশী সৎসঙ্গী তথা পুরুষোত্তম-চেতন-মানুষের হাতে এই জীবনীগ্রন্থ তুলে দিতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। পাঠকগণ তৃপ্ত হলে নিজেকে কৃতার্থ বিবেচনা করবো।

এই প্রসঙ্গে আমার পণ্ডিতপ্রবর ভ্রাতৃতুল্য ড. রবীন্দ্রনাথ সরকারের উৎসাহ ও প্রেরণা আমাকে যে বল দান করেছে, তা স্মরণ করে অভিভূত হচ্ছি।

আমার অন্তরের ভাই সৎসঙ্গিবৃন্দের অতি আপনজন সেই বহুগুণসম্পন্ন রবীন্দ্রনাথ সরকারকে এই সুযোগে আমার উষ্ণ আলিঙ্গন জানিয়ে ধন্য হচ্ছি।

পরিশেষে আরও একটি কথা। শ্রীরবীন্দ্রনাথ সরকার যে আসলে শ্রীরবীন্দ্রনাথ— এই কথা সকলের কাছে ফাঁস করে দিয়ে অন্তরে পরিতৃপ্তি বোধ করছি। বঙ্গভাষাভাষী বাংলাদেশীয়দের মনের দাবি এতদিনে মিটলো, সেই আনন্দের অনুস্বাদন আমি এ-বঙ্গে বসেও ভোগ করছি।

শ্রীনাথ
(শ্রীউমাপদ নাথ)

কুঁইকোটা (মেদিনীপুর পশ্চিম)
উল্টোরথ, ২৪শে আষাঢ়, ১৪১০

॥ এক ॥

পুরাকালে দক্ষিণ সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চলে যবন-নামক এক জাতির বাস ছিল। ভারত-ভূখণ্ডের ঋষিকুলশাসিত আর্য-জীবনধারার সঙ্গে এদের জীবনধারার কোন মিল ছিল না। অনেকে আবার এই যবনজাতিকে গ্রীকদেশীয় এক জাতিরূপে চিহ্নিত করেছেন। সে যাই হোক, এই যবনজাতির বাহুবল ও সমরশক্তি অতি বিখ্যাত ছিল। ভারতীয় আর্যজাতির সঙ্গে এই যবনশক্তির সংঘর্ষও এক সময়ে লক্ষিত হয়। পুরুষোত্তম কৃষ্ণের দেহান্তের পরে এই যবনশক্তির কাছে ভারত বিখ্যাত সমরবীর স্বয়ং অর্জুনও পরাজিত হন।

ভারতীয় আর্যজাতির দ্বিজবংশীয় মুনি গার্গ্য এক সময়ে এই যবনশাসিত সমুদ্রতীরস্থ দেশে এসে তপস্যারত হন। তাঁর তপস্যার উদ্দেশ্য হলো অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া। যাদববংশীয় বীরেরা একবার স্বজনকর্তৃক গার্গ্য অপমানিত হলে অপমানকারী দলে যোগদান করে হাসি-তামাসা করেছিল। তাতে গার্গ্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যদুবংশ-ধ্বংসের সংকল্প করেন। সেই সংকল্পপূরণের উদ্দেশ্যে দৈবশক্তি লাভের আশায় গার্গ্য এই যবনদেশে এসে আশ্রয় নেন। এখানেই তিনি ঐ কামনা নিয়ে তপস্যায় বসেন। যবনদেশের তৎকালীন রাজা গার্গ্যের এই আর্যনিরোধী সংকল্পের সহায়তাকল্পে তাঁর প্রতি মিত্রতা প্রকাশ করলেন। ফলে, যবনরাজের প্রাসাদে গার্গ্যের মিত্রসুলভ যাতায়াত অবাধ হয়ে উঠলো। আর্যগণের পরাক্রম-ধ্বংসের পরিকল্পনাতেও উভয়ের মধ্যে গোপন আলোচনা-বৈঠকাদিও হতে লাগলো। এই রন্ধ্রপথে যবনরাজের পত্নী গার্গ্যমুনির প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়লেন। যবনরাণী এক সময়ে গার্গ্যের সহবাসে সন্তানবতী হলেন। যথাকালে রাণী কালোভ্রমরের মতো এক কৃষ্ণবর্ণ পুত্র-সন্তানের জন্মদান করলেন। অত্যন্ত কালো বলে এই ছেলে কালযবন নামে খ্যাত হলো।

এই কুলকলঙ্ক কালযবনই কালক্রমে আর্যজাতির ভয়ংকরতম শত্রুরূপে আত্মপ্রকাশ করলো। গার্গ্যমুনির আর্যবিরোধী তপস্যার বরপ্রাপ্তি ঘটে এই ভাবেই।

বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে এই গার্গ্যসৃষ্ট কালযবন এক সময়ে এলো মথুরা আক্রমণ করতে। ষড়যন্ত্র এবং যুদ্ধায়োজন তার পূর্ব থেকেই চলছিল, গোয়েন্দামুখে বাসুদেব কৃষ্ণ সে কথা অবগতও ছিলেন। তাই তিনি বিকল্প নগর হিসেবে গড়ে তুলতে লাগলেন পশ্চিম সমুদ্রের উত্তর উপকূলে দ্বারকা–নামক স্থানে এক সুদৃঢ় দুর্গনগর। তৎকালীন হিসেবে বারো যোজন স্থান নিয়ে এই দুর্গনগর দ্বারকা নির্মাণ সম্পন্ন করলেন যদুপতি বাসুদেব কৃষ্ণ। যখন কালযবন মথুরা

আক্রমণ করে তখন যদুবংশীয়দের নতুন রাজধানী দ্বারকাপুরীর নির্মাণ কার্য সমাপ্ত। কৃষ্ণ শিশু, নারী এবং বেশ-কিছু যাদব বীরকে স্থানান্তরিত করলেন নবগঠিত দুর্গনগর দ্বারকাপুরীতে। কিছু সমরাস্ত্রও মজুত করা থাকলো সেখানে। চতুর্দিকে খনন করা হয়েছে গভীর খাত। সব দিক-দিয়েই দুর্ভেদ্য এই নগরী। আবার রাজপুরী হিসেবেও প্রশস্ত রাজপথ সুশোভিত উদ্যান, জলজ পুষ্প-সমাকীর্ণ সরোবর প্রভৃতির সমন্বয়ে সে পুরী যেন দ্বিতীয় অমরাবতী।

এদিকে কালযবন মথুরা আক্রমণ করতে এলে স্বয়ং চতুর-চূড়ামণি কৃষ্ণই এলেন তাঁর মুখোমুখি হতে। কৃষ্ণকে দেখে ক্রুদ্ধ কালযবন খালি হাতেই ছুটে এলো তাঁকে বধ করতে। মদমত্ত আত্মদম্ভী যবনপুত্র ভাবলে, এই আর্যপুত্র কৃষ্ণকে বধ করতে মুষ্ট্যাঘাতই যথেষ্ট। কালযবনকে তেড়ে আসতে দেখে চতুর দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে প্রবেশ করলেন এক পর্বত গুহায়। ঐ গুহায় তখন নিদ্রিত ছিলেন মুচুকুন্দ নামক এক শক্তিশালী নৃপতি। দুষ্ট যবন মুচুকুন্দকে দেখে কৃষ্ণ মনে করে সজোরে পদাঘাত করলো তাঁর দেহে। মুচুকুন্দের নিদ্রাভঙ্গ হলো। তিনি সক্রোধে যবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করা মাত্রই সে তাঁর নয়ননিসৃত ক্রোধানলে তখনই ভস্মীভূত হলো। এই ভাবে জীবনাবসান হলো কালযবনের। কথিত আছে, দেবগণের সঙ্গে অসুরদের যুদ্ধকালে মুচুকুন্দ তাঁর সেনাবল নিয়ে অসুরদের পরাজিত ও বিতাড়িত করায় দেবগণ খুশি হয়ে তাঁকে ঐ ক্রোধানল প্রয়োগের বরদান করেছিলেন।

কালযবন নিহত হলে কৃষ্ণ এলেন তাঁর নবনির্মিত দ্বারকাপুরীতে। মথুরা হলো তাঁর জন্মভূমি, দ্বারকা হলো তাঁর স্বনির্মিত নিজস্ব রাজধানী— তাঁর শেষ জীবনের অবস্থানক্ষেত্র।

মথুরানন্দন শ্রীকৃষ্ণ যেমন এলেন দ্বারকায়, হিমাইতপুর-তনয় শ্রীঅনুকূলচন্দ্র তেমনি পদার্পণ করলেন বৈদ্যনাথ দেওঘরে। শ্রীঅনুকূলচন্দ্রের জীবনে হিমাইতপুর হলো মথুরা, কুষ্টিয়া হলো বৃন্দাবন আর বৈদ্যনাথ দেওঘর হলো দ্বারকা।

পুরুষোত্তম কৃষ্ণ দ্বারকায় পুরী নির্মাণ করে সেখানে নতুন বসতি স্থাপন করেছিলেন। পুরুষোত্তম অনুকূলচন্দ্র বৈদ্যনাথধামে এসে ভাড়াবাড়িতে উঠলেন। এসবই কালোপযোগী ব্যবস্থা। যশোহর জেলার নড়াইলের বড়াল-পদবীধারী জমিদারদের একটা বিশালায়তন প্রকাণ্ড হাতাওয়ালা বাড়ি ছিল দেওঘরের উপকণ্ঠে, রোহিণী রোডে। বড়ালদের নামানুসারে ঐ ভবনের নাম ছিল বড়াল

বাংলো। সেই প্রশস্ত খোলা জমিযুক্ত বড়াল বাংলোই ভাড়া নেওয়া হলো শ্রীশ্রীঠাকুর ও তার পরিজনদের জন্যে। আশেপাশে আরও কিছু বাড়ি ভাড়া করা হলো তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগিগণের জন্যে। মোটামুটিভাবে রোহিণী রোড অঞ্চলের একটা অংশ নিয়ে নতুন করে স্থাপিত হলো হিমাইতপুরের সৎসঙ্গ আশ্রম।

ঠাকুর হিমাইতপুর থেকে বেরিয়েছিলেন ১৯৪৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বর রবিবারের দুপুরে, রোহিণী রোডের এই বড়াল বাংলোয় এসে প্রবেশ করলেন পরদিন ২রা সেপ্টেম্বর সোমবারের সকালে।

দেওঘরে আসার পরে প্রথম যে সৎসঙ্গ সম্মেলন হলো, সেটা হলো ৩৪তম ঋত্বিক্-সম্মেলন।

বড়াল বাংলোয় ঢোকার মুখে যে চওড়া গেট, তারই উল্টো দিকে রোহিণী রোডের অপর পারে আর এক বড়সড় বাড়ি। তারও সঙ্গে মস্ত কমপাউন্ড এবং এক পাশে রাস্তার দিকে এক বিশাল চাতালযুক্ত সুগভীর ইঁদারা। ঋত্বিক্-অধিবেশন হলো এইখানে। এই বাড়িটিও ভাড়া নেওয়া হয়েছিল সৎসঙ্গের অতিথিশালা ও আনন্দবাজার করার জন্যে। এই বাড়ির প্রকাণ্ড খোলা জায়গায় ছাউনি করে বহু লোকের জন্য সভাস্থল নির্মাণ করা হতো। এরই পিছন দিক দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে নাতিপ্রশস্ত দারোয়া নদী। জল কমে-গেলে পড়ে থাকে সুবিস্তৃত বালুচর। অতিথিরা আনন্দ পেতে সেখানে পদচারণা করেন।

আর বড়াল বাংলোয় ঢোকার গেটের কাছেই বাইরের দিকে ছিল এক প্রাচীন আম গাছ। ভিতরে রোহিণী রোডের পার্শ্বস্থ পাঁচিলের প্রায় গা ঘেঁষেই ছিল আর এক মহীরুহ— এক অশ্বত্থগাছ। এর গোড়াটা পাকা বেদী করে ঘেরা। এখানে গ্রীষ্মের দিনে বেশ আরাম করে বসা যায়। ঠাকুর মাঝে মাঝে এসে বসতেন এই সব গাছের নিচে। নাতিশীত এবং নাতি-গরমের দিনে এখানে বসে কিছুক্ষণ কাটাতে ভালোই লাগতো তাঁর। হিমাইতপুরের বাবলা-তলার কিছুটা অভাব মেটাতো এই গাছ দু'টি। কখনো কখনো গরমের অপরাহ্নে গিয়ে বসতেন দারোয়ার মুক্ত চরের কাছে। আত্মভোলা হয়ে তাকাতেন অদূরের অগভীর জলধারার দিকে আর তার বুকের উপরে বিস্তৃত প্রমুক্ত আকাশে ভাসমান শীর্ণ মেঘফালিগুলির দিকে। হয়তো এই ভাবেই উপভোগ করতেন তাঁর আজন্মের অতি-সাধের বিশাল পদ্মাচরের দৃশ্যদর্শন আর তার উপরের আকাশ-সম্ভোগ।

রোহিণী রোড নামক সড়কটি শহরের মধ্যেকার যোশিডি-বৈদ্যনাথধাম শাখা রেলপথের গেট থেকে প্রসারিত হয়ে দারোয়া নদীর কাছাকাছি দিয়ে খানিকটা গিয়ে একটু ঘুরে মাঠ ভেঙ্গে চলে গিয়েছে রোহিণী নামক রেল স্টেশনে। বৈদ্যনাথধাম এবং রোহিণীর মধ্যে এটাই সংযোগকারী সড়ক। অনেক গ্রামের সঙ্গেও যোগাযোগ ঘটিয়েছে এই রাস্তা। ধীরে ধীরে বড়াল বাংলোকে কেন্দ্রবিন্দু করে আশপাশের ঘরবাড়ি নিয়ে গড়ে উঠলো নতুন সৎসঙ্গ-নগর—একালের দ্বারকা। দেওঘরেও ধীরে ধীরে জমে উঠছে সেই জনসমাগম— সেই জিজ্ঞাসু ও তত্ত্বানুসন্ধানীদের গতায়াত।

একদিন এলেন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-বিভাগের গণ্যমান্য আচার্য ডক্টর মুখোপাধ্যায়। তিনি অনেক কথা কইলেন ঠাকুরের সঙ্গে। বেদ নিয়েও কথা উঠলো। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বললেন, বেদ জ্ঞানের আকর-গ্রন্থরূপে গ্রাহ্য। ক্রিয়া কাণ্ডেরও একটা দিক আছে। যাগযজ্ঞ প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা এবং তার অনুষ্ঠানসংক্রান্ত বিধিবিধানও রয়েছে বেদে।

যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্পর্কে অধ্যাপক-প্রবর প্রশ্ন করলেন ঠাকুরকে, একটা খারাপ প্রকৃতির লোককে দিয়ে যদি যজ্ঞ সম্পন্ন করানো যায় যথানিয়মে, তাহলে কি তার ফলপ্রাপ্তি সম্ভব?

'নিয়মমাফিক নিখুঁতভাবে করলে ফলপ্রাপ্তিই তো সম্ভব। কারণ, নিয়ম মেনে নিখুঁতভাবে করতে গিয়ে প্রয়োজনীয় চরিত্রশুদ্ধি তো ঘটতেই থাকে। মূল জিনিস হলো ইষ্টনিষ্ঠা। সেটা যেমন স্বপ্রতিষ্ঠ হয়, ফলও তেমনি প্রাপ্ত হওয়া যায়। যজ্ঞকে তাই বলা যায় সংবর্ধনী কর্ম।' বললেন ঠাকুর।

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বললেন, যজ্ঞসম্পর্কে এমন কথা আছে যে, যজ্ঞপুরুষ বিধাতাকে যজ্ঞের ফলদানে বাধ্য করে থাকেন। তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এই ফল আদায় করে দেন।

ঠাকুর এই কথা শুনে খুব উৎফুল্ল হলেন। তিনি সর্বদাই করে ফললাভ করার কথা বলেন। যথাবিহিত ত্রুটিহীন কর্মই ফল আদায় করে নেয়, বিজ্ঞান বিধান মেনেই।

বললেন, এই আদায় করে নিবার ব্যাপারটা আমার খুব ভালো লাগলো। এটাই তো বিজ্ঞানের কথা। করো, পাও, হও। বিজ্ঞান এই কথাই বলে।

সৎসঙ্গী-সমাবেশ এবং জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের আগমন ক্রমে বাড়ছে দেখে ঠাকুরের মন-মেজাজ বেশ ভালোই আছে। নতুন করে নতুন পরিবেশে আবার আশ্রম গড়ে তোলার একটা প্রেরণা এবং উদ্যোগ তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সবাইকে বলে রাখছেন, আশপাশে খালি বাড়ি পেলেই সেগুলি যেন ভাড়া নেবার চেষ্টা করা হয়। পাবনা-হিমাইতপুর থেকেও বহু ভক্ত ক্রমে দেওঘর-সৎসঙ্গে এসে পুনর্বাসনের সন্ধান করছেন। এ দিকে চোখ রেখেই ঠাকুর সবাইকে বাড়ির সন্ধানে থাকতে বললেন। এ ছাড়া তাঁর পরিবার-পরিজনদেরও এই পরিমণ্ডলেই বাসস্থান দরকার। দেশবিভাগও তো আসন্নই মনে হচ্ছে। সেই দুর্ঘটনাটা ঘটে গেলে তো কথাই নেই। সৎসঙ্গীদের ঢল নামবে এই সৎসঙ্গকেন্দ্রে।

আর বললেন, এই পুনর্গঠনের কাজের জন্যে পয়সাও লাগবে অনেক। তোমরা সেদিকেও নজর দাও। অন্ততঃ হাজার পঁচিশ লোক জোগাড় করো, যারা প্রতি মাসে— ইষ্টার্থে যোগান দিতে পারবে।

কর্মীদের বলে দিলেন, এই সব ব্যাপার এবং নানা ব্যাপার নিয়ে তোমাদের এখন ঘোরাঘুরি করতে হবে। তাই কই, রেলের দুখানা ইন্টার ক্লাস মাসিক টিকিট করে রাখো দেওঘর থেকে হাওড়া পর্যন্ত যাতায়াতের জন্যে। ঐ দু'জন দেওঘর-কলকাতা করে বেড়াতে পারবে।

আবার এই দেওঘরে বসেই একদিন বললেন, আজকাল একটা রকম হয়েছে এই যে, হিন্দু-সংহতির কথা বললেই অনেকে মনে করে, সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করা হচ্ছে। আমি তো এর মানেই বুঝি না। হিন্দুরা সাম্প্রদায়িক হতে যাবে কেন? হিন্দু যদি তার ধর্মের ভিত্তিতে সংহত হয়, তাহলে সেই সংহতি তো পৃথিবীর প্রত্যেকটি সম্প্রদায়েরই সত্তাসম্বর্ধনী স্বার্থের পরিপোষক হবে। সেটা কি অবাঞ্ছনীয় কিছু?

'আমি বলি, হিন্দু প্রকৃত হিন্দু হোক, মুসলমান প্রকৃত মুসলমান হোক, খ্রিষ্টান প্রকৃত খ্রিষ্টান হোক। একমাত্র তাহলেই গড়ে উঠবে প্রকৃত সাম্প্রদায়িক ঐক্য।'

'ধর্ম কখনো এক বই দুই নয়।'

খোলা তলোয়ারের মতো ধারালো কথা বললেন ঠাকুর, দেশ বিভাজনের কিছু আগে। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরের ঠিক মাঝামাঝি সময় সেটা।

॥ দুই ॥

১৯৪৭ সালের জুন মাসের শেষ দিক। তখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে দেশভাগ হয়নি, সব ঠিকঠাক হয়ে আছে। ঠাকুরের বুদ্ধি নিয়ে কোন নেতা কাজ করতে নামলো না, বিভাজনের বিরুদ্ধে কোন বাস্তব প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে উঠলো না। তাই, কিছু করা গেল না। সেই দুঃখটা ঠাকুরের মনকে এখনও পীড়া দেয়।

এখন তিনি দেওঘরে, ভাড়া-নেওয়া বড়াল বাংলার চত্বরে একখানা তক্তপোষে অর্ধশায়িত। তখন প্রচণ্ড গ্রীষ্ম। সাঁওতাল-পরগনার লু-হাওয়ার কবলে দেওঘরের জন-জীবনও ক্লান্ত, দুঃসহ। যারা পূর্ববঙ্গ থেকে নতুন এসেছে এখানে, তাদের কাছে এই গরম হাওয়াটা বেশি কষ্টদায়ক মনে হয়। সন্ধ্যার আগে বাতাসের অগ্নিতাপ কমে না। তাই, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেলে ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়ে কখনো ফাঁকা হাতায়, কখনো বা একেবারে বাইরে মাঠের দিকে গিয়ে বসেন।

সেদিন তিনি হাতার মধ্যেই একটা গাছের নিচে তক্তপোষে আধশোয়া হয়ে জিরোচ্ছেন। দিনের বেলায় খানিকটা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় আজকের হাওয়াটা মোটামুটি স্নিগ্ধ এবং আরামপ্রদ।

দেশভাগ অতি আসন্ন। সেই বেদনায় এবং হতাশায় তিনি অতিশয় ক্লান্ত, বিমর্ষ এবং বিহ্বল। সেই দুঃখের ক্ষতাঘাত মনে নিয়েই তিনি হঠাৎ বলতে লাগলেন, 'নেতার পিছনে দ্রষ্টাপুরুষ না থাকলে এমনই হয়, ভালো করতে গিয়ে মন্দ করে ফেলে।'

'অবস্থাগতিকে দেশ-ভাগ হতে চলেছে। হিন্দু-মুসলমান কারও পক্ষেই এটা ভালো হবে না।'

বলতে লাগলেন, 'মুসলমানের ক্ষতি হয়ে হিন্দুর ভালো হোক, তাও আমি চাই না আবার হিন্দুর ক্ষতি হয়ে মুসলমানের ভালো হোক সেটাও আমি চাই না। কারো ক্ষতি করে কারও ভালো হয়, এমন বিশ্বাস আমার নেই। এক পক্ষের ক্ষতি হলে অপর পক্ষেরও ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। সব পরস্পর যুক্ত।'

কথাগুলি বলে নিয়ে জামাই সুধাংশু মৈত্রের কাছ থেকে রেডিওর প্রচারিত খবরটা শুনে নিলেন।

তারপরে বললেন, 'এ অবস্থায় দীক্ষা বাড়ানোর দিকে সবাই মন দাও। এ ছাড়া বাঁচার আর কোন পথ নেই।'

'দীক্ষিতের সংখ্যা বাড়লে এবং তাদের ইষ্টস্বার্থে সংগঠিত করে তুলতে পারলে কৃষ্টিটা রক্ষা পাবে—দেশ টুকরো হয়ে যাবার পরেও ধ্বংসের হাত থেকে পরিত্রাণের একটা পথ খোলা থাকবে।'

আবার এক সময়ে কথাপ্রসঙ্গে বললেন, আসল হলো শ্রদ্ধা-উদ্দীপী চরিত্র। এই চরিত্রই লোকজীবনের উদ্ধাতা। এক ডজন দু'ডজন খাঁটি মানুষ হলে সারা ভারতের ভোল ফিরিয়ে দেওয়া যায়।

এই সূত্র ধরে আরও বলেছেন, ব্রাহ্মণত্বই আদর্শ। ব্রাহ্মণত্ব মানে ব্রহ্মজ্ঞত্ব। বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সবাইকেই ব্রহ্মজ্ঞ হতে হবে। তবে ব্রহ্মকে জানতে হবে নিজ-নিজ বৈশিষ্ট্যের উপরে দাঁড়িয়ে। বৈশিষ্ট্যকে বাদ দিয়ে সব একাকার করার কথা আমি বলি না। তা কার্যকরীও হয় না। রকমারি যেমন আছে, তেমনই থাকবে। নিজত্ব না হারিয়ে ব্রহ্মবিৎ হতে হবে।

অনেক সময়ে উন্নত বীজজ মানুষকেও খারাপ পরিবেশে পড়ে খারাপ হয়ে যেতে দেখা যায়। কিন্তু তার ভিতরটা একেবারে নষ্ট হয়ে যায় না। তাকে তালিম দিয়ে নিতে পারলে সে আবার আপন বৈশিষ্ট্যে ফুটে ওঠে। উদাহরণ দিলেন রত্নাকর দস্যুর। রত্নাকরের মধ্যেই ছিল বাল্মীকি মুনি। নারদ-গুরুর হাতে পড়ে দস্যু রত্নাকরের খোলস থেকে আত্মপ্রকাশ করে মহামুনি বাল্মীকি।

ভারত-ভাঙ্গা কাজের আর এক বছর বাকি। ঠাকুর সেদিন সকালে বড়াল বাংলোর বারান্দায় আসীন। বাতাসে মেদুরতা আছে, মাঝেমাঝেই বারিবিধৌত হাওয়া এসে সবাইকে আরাম দিয়ে যাচ্ছে। এই বৈঠকে ঠাকুর আবার সব কর্মীকে মনে করিয়ে দিলেন— 'দ্যাখো, কিছুই তো করা গেল না, আমি যা চেয়েছিলাম, তা হলো না। সবাই আমাকে ভুল বুঝলো। যা হোক, মন্দের মধ্য থেকেই ভালোটা সম্ভব করে তুলতে হবে। এ জন্যে, অল্পদিনের মধ্যেই অন্ততঃ দেড় লাখ মানুষকে ইষ্টে যুক্ত করে তোলো। ইষ্টনিষ্ঠ আরও দেড় লাখ মানুষ পেলে তার উপর দাঁড়িয়েই অনেক কিছু করা যাবে।'

এই দিনের বিকেলের বৈঠকটা দু'টো দিক দিয়ে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং স্মরণীয়।

সেই বৈকালিক বৈঠকে হাউজারম্যানের সাথে বললেন, 'আমি যদি বৃটিশ রাজনীতিবিদ হতাম, কখনোই বৃটিশ সরকারকে ভারত-ভাঙ্গার পরামর্শ দিতাম না। বরং বোঝাতাম, ভারতকে অখণ্ড রেখে স্বাধীনতা দিলেই বৃটিশ সরকার ও বৃটিশ জাতির লাভ বেশি। ভারতের কল্যাণ হলে বৃটিশেরও কল্যাণ হতে বাধ্য।'

দ্বিতীয় স্মরণীয় মনে রাখার মতো ঘটনা হলো, তাঁর সঙ্গে আব্দুল গণি নামক এক শিক্ষিত মুসলমান ভদ্রলোকের সাক্ষাৎকার।

আব্দুল গণি সাহেব অত্যন্ত ভদ্রলোক, ঠাকুরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল।

ঠাকুর গণি সাহেবকে কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলেন 'আপনাদের মধ্যে বর্ণ বিভাগ আছে নাকি? অর্থাৎ সংস্কার ভিত্তিক গোষ্ঠিবিভাগ?'

গণি সাহেব একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, আপনার কথার অর্থ বুঝলাম। আছে, আপনাদের ও-জিনিসটা আমাদের মধ্যেও আছে।'

বস্তুতঃ গোষ্ঠিগত রকমারিত্ব সর্বত্রই আছে। মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে এমন কি এক জাতীয় উদ্ভিদাদির মধ্যেও রকমফের বিদ্যমান। সব গাছের আমই এক আম নয়, সব ধানগাছেও এক ধান হয় না। সব কুকুরের বাচ্চা এক জাতের নয়, স্বভাব-চরিত্রে অনেক ফারাক থাকে।

এসব কথার পরে গণি সাহেব একটা খুব দামি কথা বললেন, সনাতন ধর্মে সদ্‌গুরু-সম্পর্কে যে ধারণা প্রচলিত আছে, তার সঙ্গে এই কথার তাৎপর্য অভিন্ন। তিনি বললেন, 'এই কথাই বলা চলে যে, ভগবান গুরুরূপে দেখা দেন। যে প্রকৃত গুরুকে দেখেছে, সে ঈশ্বরকে দেখেছে।'

এটা গুরুবাদীদেরই কথা। সৎসঙ্গেরও কথা। গণি সাহেব ভিন্ন মতাবলম্বী মানুষ হলেও, একখাত বুঝেছেন। তাঁর অনুভূতি-লব্ধ মতের এই স্বতঃপ্রকাশ সত্যই আস্বাদ্য।

আর শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি তাঁর বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধার যে নিদর্শন পরিব্যক্ত করে সে দিন তিনি বিদায় নিলেন, সেটি স্মরণীয়।

সকলের দিকে চেয়ে গণি সাহেব একান্ত কাকুতি করেই বললেন, দেখুন, আপনাদের কাছে আমার একটা বিনম্র প্রার্থনা আছে। 'শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখ থেকে যখন যে কথাই বেরোক না কেন, তা তৎক্ষণাৎ লিখে রাখবেন। এ জন্যে, চব্বিশ ঘন্টা তাঁর কাছে কেউ খাতা-কলম নিয়ে থাকবেন।'

'তিনি সদ্‌গুরু, তাই ঈশ্বরের প্রতীক। আমার বিশ্বাস তাঁর বাক্যই শাস্ত্র।'

গণিসাহেব মাঝে মাঝে ঠাকুরের কাছে আসেন— দু'দণ্ড বসেন। সেদিনের আলোচনায় তাঁর যা নেবার ছিল, তা নিলেন, কিন্তু যাবার সময়ে ধর্ম পিপাসু মানুষের জন্যে দিয়েও গেলেন অনেক কিছু।

প্রধানতঃ, অবতারবাদকেই সমর্থন করে নিজের প্রত্যয়দৃঢ় ভাষায় গণিসাহেব যে বক্তব্য সে দিন রাখলেন, তা সনাতন ধর্মেরই কথা।

মনীষিগণ বিশ্বাস করেন, সর্বপ্রথম গীতাতেই অবতারতত্ত্ব ব্যাপক এবং সুস্পষ্টভাবে প্রচারিত ও ব্যাখ্যাত হয়। গীতার জ্ঞানযোগাধ্যায়ের সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকযুগলে সর্বশক্তিমান পরমপুরুষের এই নরদেহ–ধারণের তত্ত্ব অত্যন্ত বাস্তব ভাবে স্পষ্ট বচন-কৌশলে বুদ্ধিমান মানুষের কাছে তুলে ধরা হয়। দুষ্টের বিনাশ, সাধুদের সুরক্ষা এবং তত্ত্বান্বেষী মানুষের হৃদয়ে জীবনবৃদ্ধির মূলতত্ত্ব অর্থাৎ ধর্মকে পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি সাধারণ মানুষের মতো দেহধারণ করে পিতার ঔরসে মাতৃগর্ভের মারফত ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। মনুষ্য পরিচয়ে অবস্থিত থেকে তিনি ঈশ্বরীয় তত্ত্ব প্রচার করেন। এই তাঁর অবতারতত্ত্ব। যে পরম-পুরুষের এই নরদেহ লীলায় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে, তারই ঈশ্বর লাভ হয়। সে মুক্তি লাভ করে। গীতার মতে, দেহান্তে তার আর পুনর্জন্ম হয় না। 'ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন।' (৪/৯)

ধর্মজ্ঞ গণি সাহেব রায় দিলেন, এঁর প্রতিটি বচনই শাস্ত্র। তাই, ঠাকুরের প্রত্যেকটি বচন সংগ্রহের জন্য তাঁর এই আকুলতা।

ধার্মিক হিন্দু এবং ধার্মিক মুসলমানে কোন প্রভেদ নেই। ঠাকুরের এই বাণীর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে আমরা সেদিন হ্লাদিত হলাম।

ইংরাজি ১৪ই আগস্ট, ১৯৪৭ বৃহস্পতিবার। ভারত বিভাগের ঠিক আগের দিন।

বহু প্রাচীন কাল থেকেই জন্মভূমিকে মাতৃরূপে বোধ করা সংস্কার রয়েছে ভারতবাসীদের মধ্যে। সেই হিসাবে এই ভারতবিভাজন হলো মাতৃদেহের বিখণ্ডীকরণ। অঙ্গচ্ছেদনের সব ব্যবস্থাই তৈরি, আগামী কাল ছিন্নাঙ্গ জননীকে অপারেশন-থিয়েটার থেকে অচৈতন্য অবস্থায় তার বিছানায় এনে শুইয়ে দেওয়া হবে। মায়ের কোন সন্তান কাঁদছে, কোন সন্তান-দল আনন্দে বোমাবাজি ফাটাচ্ছে।

এদিন সকালে, মায়ের এক মাতৃগত সন্তান অনুকূলচন্দ্র বড়াল বাংলোর বহির্মুখের আমতলায় উপবিষ্ট। সামনেই নির্জন রোহিণী রোড পড়ে আছে বিমর্ষ অসহায় এবং নির্জীব আচ্ছন্নতায়।

কথা প্রসঙ্গে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বললেন, 'কিছুই করা গেল না। আমরা যা করেছি, তা হলো প্রবৃত্তির সঙ্গে দরকষাকষি। তার যা ফল, তাই পেয়েছি।'

বললেন, 'এখনও একটা কাজ করে দেখতে পারো। আমাকে সলিড্ দেখে দেড় লাখ মানুষ দাও, যারা ইষ্টকে স্থান দেবে প্রবৃত্তির উপরে। এই ছিন্ন অংশটা নিয়েও তো কিছু করতে হবে। কোন রকমে আবার মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা তো করতেই হবে।'

বলিরাজার কাছে বামনদেব একটা পা রাখবার জন্যে জায়গা চেয়েছিলেন। তোমাদের কাছে আমিও তাই চাইছি। এই মানুষগুলোকেই আমি এক পা রাখার জায়গা বলে মনে করছি। ওদের নিয়ে আমি দেখতে চাই, এই সমূহ বিপদ থেকে আবার আমরা বেরিয়ে নতুন করে বাঁচা-বাড়ার জীবনে প্রবেশ করতে পারি কিনা।

বিপদের সঙ্গে আপোস জানেন না অনুকূলচন্দ্র। আবার বেঁচে ওঠার একটা সংকল্পের স্বপ্ন নিয়েই সেদিন কাটালেন তিনি। সেদিন তাঁর দেহ থেকেও বোধ হয় ঘাম ঝরছিল—রক্তাক্ত ঘাম।

॥ তিন ॥

ঠাকুর দেওঘরে আসার পর থেকে আনুষ্ঠানিক ভারত-বিভাজনের মধ্যবর্তী কালের মধ্যে বেশ কিছু বিদেশী তত্ত্বান্বেষীর আনাগোনা লক্ষ্য করা যায় তাঁর সান্নিধ্যে। যেমন, হাউজারম্যানের মা মাঝে মাঝেই আসতে থাকেন ছেলেকে এবং ছেলের গুরুকে দর্শন করতে। সব দেখে বুঝে মাও ছেলের গুরুকেই নিজের গুরুরূপে গ্রহণ করে আরও বেশি কাছের মানুষ হয়ে ওঠেন। ওদিকে যেমন যাতায়াত বাড়িয়ে দিয়েছে ক্যাপেল, তেমনি এসে জুটেছে আউটার ব্রিজ, এঞ্জেলি মিট্টাম প্রভৃতি। আউটার ব্রিজের মতো মিট্টামও আন্তরিকভাবেই ঠাকুরের প্রতি অনুরাগী— তাই, তাঁর সঙ্গ পিপাসু। এরা প্রশ্ন করে করে তাদের সব জিজ্ঞাসার উত্তর সংগ্রহ করে নেয়। মিট্টাম একদিন প্রশ্ন করেছিল, 'আপনার কথা থেকে বুঝেছি, গুরু ঈশ্বরবোদ্ধাপুরুষ, কিন্তু নিজে তো ঈশ্বর নন। তবে ঈশ্বরকে লাভ করা যাবে কী ভাবে?'

উত্তরে ঠাকুর বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, তাই তো—গুরু হলেন ঈশ্বরদ্রষ্টা মানুষ। তিনি ঈশ্বরের বার্তাবহ, তাঁর মাধ্যমেই ঈশ্বরে পৌঁছাতে হয়। যিশুর মতো গুরু একাধারে পথ ও গন্তব্যও। তিনিই সত্য, তাই তিনিই জীবন।'

'হ্যাঁ, যিশু বলেছিলেন', মিট্টামও স্বীকার করলো, 'এ কেমন কথা যে, তোমরা আমাকে দেখছো অথচ পরমপিতাকে দেখোনি! যে আমাকে দেখে, সে আমার পিতাকেও দেখে। আমি তাঁর কাছ থেকেই এসেছি।'

'হ্যাঁ, ঐ তো আদত কথা!' সহাস্যে ঠাকুর সমর্থন করেন যিশু–বাক্যকে।

বিদেশি ভক্তদের মধ্যে এঞ্জেলি মিট্টাম ছিল অত্যন্ত জ্ঞানী এবং কৃতবিদ্য। ভারতের বিভিন্ন মহাপুরুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্বন্ধেও তার পড়াশুনা ছিল। ঠাকুরকে প্রশ্ন করে করে সে অধীত সব জ্ঞানের মধ্যেকার জট খুলে নিতে চাইতো।

দেশবিভাগের অল্প পরবর্তী সময়ে একজন ইংরেজ মহিলাকেও দেখা গেল দেওঘর আশ্রমে। এর নাম মার্জারি সাইক্‌স্। এ মহিলাও গভীর বুদ্ধির অধিকারী। সবার মতো সাইক্‌স্-এরও উদ্দেশ্য হলো, সাক্ষাৎভাবে ঠাকুরের সামনে বসে নানাবিধ জটিল সামাজিক সমস্যার সমাধান সংগ্রহ করে নেওয়া। ঠাকুরের সঙ্গ করে এবং তাঁর মুখ থেকে স্নেহ, দরদ ও সহনুভূতিঝরা ভঙ্গিতে তার প্রশ্নোত্তরগুলি শুনে সাইক্‌স্ বলেছিল, 'আপনার কথা অপূর্ব, আপনার ব্যাখ্যা অতুলনীয়।'

দেওঘর মানে তো দেবঘর—অর্থাৎ, দেবগৃহ। কিন্তু নামার্থে দেবস্থান হলে কি হবে, দুষ্ট লোকেদেরও নজর থাকে, তারা অসাবধানতার সুযোগ নেয়। সোজা কথায় দেবস্থানেও চুরিচামারি হয়ে থাকে। ঠাকুর তাই ক্ষুদ্র সৎসঙ্গ পল্লীটায় রাত্রে পাহারা দেবার কথা বলেছেন। প্রধানতঃ রোহিণী রোড বরাবরই আশ্রমিকদের বাস। তাই, রোহিণী রোডে প্রধানতঃ নৈশপাহারার প্রতি সকলের নজর দিতে বলেছেন।

বলা বাহুল্য, হিমাইতপুর আশ্রমে থাকতেও সৎসঙ্গীরা রাত্রিকালীন প্রহরায় অভ্যস্ত ছিল। কাজেই, রাত্রে ডিউটি ভাগ করে টর্চ্ লাইট ও লাঠি হাতে নিয়ে টহল দেওয়া তাদের অভ্যাস আছে। এখানে এসেও ঠাকুর মাঝে মাঝে খোঁজ নেন, নৈশ পাহারার কাজ ঠিকমতো চলছে কিনা।

সবাইকে বার বার বলেন, সব কাজ নিজের গরজে করবে। মনে রাখবে, আশ্রমটা গোলামখানা নয়। এখানে কেউ কারও উপরে খবরদারি করে কাজ করতে বাধ্য করে না। এমন কি, আমিও কারও উপরে জবরদস্তি কিছু চাপিয়ে দিই না— বরং বসে বসে দেখি, কে কী করে, কিভাবে চলে।

তখন দেশ বিভাজনের কাজ হয়ে গেছে। ঠাকুর বিশেষভাবে ঋত্বিক্ সংগঠনের প্রতি নজর দিচ্ছেন। তাদের চলন-চরিত্র এবং কাজ-কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে দিচ্ছেন। একদিন বললেন, 'ঋত্বিকরা বাইরে গেলে যাজন করবে, দীক্ষা দেবে—মানুষ গড়বে আর আশ্রমে থাকার সময়ে দোকানে বসে গল্প করবে আর অলস হয়ে গোষ্ঠী–সুখ ভোগ করে দিন কাটিয়ে দেবে, তা কিন্তু নয়। ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে, এখানে থাকার সময়েও তাদের অনেক কিছু করার থাকে। সর্বদাই ইষ্টকাজে ব্যস্ত না থাকলে, কখন যে কোন বৃত্তির ঘূর্ণির ভিতর গিয়ে পড়বে, তার ঠিক নেই।'

'আর একটা বড় কথা হলো, মানুষের সামর্থ্যের কিন্তু শেষ নেই।' বললেন, 'যতই শান দেবে, ততই ধার বাড়বে। কাজ করতে করতে কাজ করার বুদ্ধি ও কাজ করার অভ্যাস যেন তাকে পেয়ে বসে। এ বড় মজার জিনিস। যে ফাঁকি দেয়, সে নিজেই ফাঁকে পড়ে—জীবনযুদ্ধে হেরে যায়।'

সেই জন্যে আমি বলি, 'বেগার খাটাও ভালো। চরিত্রটা গড়ে ওঠা তো সবচেয়ে বড় লাভ।'

যে ভক্ত কাজ চেয়ে নেয় এবং তার আগাগোড়া নিজের দায়িত্বে করে, সেই ভক্তই হলো সেরা কর্মী।

একদিন ঠাকুর তামাক খেতে চেয়েছেন। তাঁর অন্যতম সদা-সেবিকা সরোজিনী জোয়ারদার তামাক সাজতে গেলেন। তামাকু-সরঞ্জামের কাছে গিয়ে দেখলেন, টিকের থালায় টিকে নেই। তিনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে নিকটবর্তী একজনকে তাড়াতাড়ি গিয়ে টিকের মজুত-ভাণ্ডার থেকে টিকে এনে দিতে বললেন।

সরোজিনীমার অসহায় অবস্থা দেখে ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন, 'আমার ধাতটা কিন্তু আলাদা, যার উপরে যে ভার থাকবে, সে তার সবটুকু না করলে আমার ভালো লাগে না।'

প্রসঙ্গক্রমে তাঁর শ্রুতিলেখকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি হয়তো লিখছো, একজন কাগজ এনে দেবে, অন্য একজন কলম এনে দেবে, আর একজন বা কালি ভরে দেবে—এমন রকমটা ভালো না। লিখতে গেলে যা-যা করা লাগবে, তার সবটাই তুমি করবে।'

কথা শুনে জোয়ারদার-মা নিজেই উঠে গেলেন তামাক-সাজার টিকে আনতে।

দেশত্যাগ করে এখানে এসেও সমানতালে চলেছে তাঁর মানুষ তৈরির কাজ। আবার একটা মজার ব্যাপার হলো এই যে, কারও বয়স পেকে গেছে বলে তার তৈরি হয়ে ওঠার ব্যাপারটা উপেক্ষা করেন, তা কিন্তু নয়। কারণ, যতক্ষণ দেহ ও আত্মা একসঙ্গে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ তৈরি হতে হতেই চলতে থাকে। জীবন প্রবাহের মধ্যে কোন ছেদচিহ্ন নেই। ছেদ একবারই পড়ে।

ভারতভাগের পর মাত্র সপ্তাহখানেক কেটেছে। সৎসঙ্গী নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে দেওঘরে এসেছেন হিমাইতপুরের নিকটবর্তী গ্রামের এনায়েৎ বিশ্বাস এবং খবির উদ্দিন মিঞা। ঠাকুর তো দেশ থেকে চলে এলেন, এখন তিনি কেমন আছেন, কি ভাবছেন ইত্যাদি জানার আগ্রহই ছিল তাঁদের এদেশে আসার উদ্দেশ্য।

কথায় কথায় ঠাকুর তাঁদের কাছে বললেন, 'দ্যাখো, দেশবিভাগ সকলের পক্ষেই অভিশাপ—এতে হিন্দুরও ক্ষতি হলো, মুসলমানেরও ক্ষতি হলো। আমরা ভাবলাম, আমরা বুঝি পরস্পরের শত্রু। কিন্তু আসলে তো তা না। প্রত্যেক মহাপুরুষই প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সকল মানুষের প্রকৃত বন্ধু। তাঁরা সবাই একই বাণী বয়ে আনেন। আমরা এই আসল কথাটা ভুলে গিয়ে ধর্মের পথে না চলে আপন-আপন বৃত্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার পথে চলি। তার থেকেই যত দ্বন্দ্ব, যত বিভেদ-বুদ্ধি আর শত্রুতা-সাধনের ষড়যন্ত্র। তার যা ফল, এখন ভুগতেই হবে।'

বললেন, 'তোমরা আমাকে ভালবাস, আমার কথা মনে রেখেছো, তাই আমাকে দেখতে এসেছো। তোমরা দেশে ভালোভাবে থেকো, আশ্রমটার দিকে লক্ষ্য রেখো—এইটুকুই আমার বলার।'

ঠাকুর তাঁদের, আদরযত্ন করলেন এবং অন্তরের শুভেচ্ছা জানালেন। আর গ্রামের সকলের উদ্দেশ্যে তাঁর শুভকামনা পাঠালেন।

এই হলেন দ্রোহহীন অনুকূলচন্দ্র। তাঁর বিদ্রোহ শুধু জীবনবৃদ্ধির বিরোধী বুদ্ধির বিরুদ্ধে।

তিনি নিজে ভারতবর্ষীয় লোকত্রাতা পরম পুরুষদের জীবনীয় জীবন-বৃত্তান্ত কতবার যে একসুতোয় গেঁথে মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন, তার তো ঠিক-ঠিকানাই নেই, অভারতীয় জগদ্‌গুরুদের জীবন-চরিতও উদাহরণ দিয়েছেন কথায় কথায়। যিশু এবং মুহাম্মদ (সঃ) এর কথাও কম বলেননি মানুষের দরবারে। সবাই যে ঈশ্বরীয় দূত, একথা বলেছেন তাঁদের প্রকৃষ্ট প্রচারকের মতোই। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যকে একাকার করে ছাড়লেন তিনি।

আবার এযুগে যে রামকৃষ্ণ ঠাকুরকে নিয়ে মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত ছিল তাঁর যথার্থ মূল্যায়নের ব্যাপারে, তাঁর সম্বন্ধে ঠাকুর খোলা তলোয়ারের মতো চোখা ভাষায় ঘোষণা করলেন, রামকৃষ্ণ ঠাকুরকে মহামানব-টানব বললে তাঁকে ছোট করে বলা হয়। তিনি আগাপাছতলা ভাগবত পুরুষ—নররূপী ভগবান। যে কালে লোকে তাঁর সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার জন্যে নানাবিধ বিচার-বিবেচনায় ব্যস্ত, সেই সংকোচ এবং বাগ্‌বিতণ্ডার ঘোলাটে মুহূর্তে হিমাইতপুরের ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ঘোষণা করলেন—রামকৃষ্ণ মানবদেহে স্বয়ং পরাৎপর পুরুষ। লোকশিক্ষার কারণে তাঁর দেহ-ধারণ।

এঁর চেয়ে সমন্বয়বাদী মানুষ আর কেউ জন্মেছেন? এর চেয়ে সমদৃষ্টির কথা ভাবা যায়?

দেশবিভাগের পর মাত্র তিন মাস, তেইশ দিন কেটেছে। আর ঠাকুরের দেওঘর-আগমনের সেদিন হলো এক বছর, তিন মাস, ছ' দিন।

সময় সকালবেলা। শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল বাংলোর বারান্দায় উপবিষ্ট। ইউনাইটেড প্রেসের স্বনামখ্যাত সাংবাদিক বিধুভূষণ সেনগুপ্ত এসেছেন ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। সৎসঙ্গের আশ্রমবাসী প্রধান ব্যক্তিরা বিধুবাবুকে সঙ্গে করে এনেছেন ঠাকুরের কাছে। বিধুবাবু নামকরা সংবাদ সংস্থার দুঁদে সাংবাদিক। তাঁর সাক্ষাৎকার মানেই তো সুচতুর প্রশ্ন এবং তার জবাব-সংগ্রহ। তা-বড় তা-বড় নেতাকে প্রশ্নচাতুর্যে কাবু করে ফেলে কাঙ্ক্ষিত উত্তর বের করে নেওয়ায় এঁরা সিদ্ধহস্ত। তবে বিধুবাবু রাজনৈতিক নেতার কাছে আসেননি, এসেছেন সৎসঙ্গের প্রাণপুরুষ লোকগুরু ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের কাছে—সে খেয়াল তাঁর আছে। তিনি সবিনয়ে প্রণাম নিবেদন করে প্রদত্ত আসনে বসলেন। আশেপাশেই উপবেশন করলেন তাঁর পথ-প্রদর্শক সহাগত ঋত্বিগাচার্য কৃষ্ণপ্রসন্ন, সৎসঙ্গের প্রচারসচিব রাজেন মজুমদার, প্রজ্ঞাবান্ কর্মী কিরণ মুখোপাধ্যায়, চুনীলাল রায়চৌধুরী প্রভৃতি। মজুমদার মশাই ঠাকুরের কাছে বিধুবাবুর পরিচয় প্রদান করলেন। ঠাকুর খুশিমনে প্রতিনমস্কার করে তাঁকে অভ্যর্থিত করলেন।

এবার সাংবাদিক হিসেবে বিধুবাবু তাঁর কথা আরম্ভ করলেন। বললেন, আমার অপরাধ নেবেন না, অনেকের মতে তো পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে চলে আসা এক ধরণের কাপুরুষতা। বিশেষ করে আপনাদের মতো প্রজ্ঞাবান এবং সংগঠন কৌশলী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যদি দেশত্যাগী হয়ে চলে আসেন, তাহলে সাধারণ মানুষের মনোবল তো ভেঙ্গেই পড়বে।

ঠাকুর মন দিয়ে অভিযোগের কথা শুনলেন। উত্তরে দু'টি জিনিস তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন।

প্রথমতঃ বোঝাতে চাইলেন, তাঁর তেমন কোন জনবল ছিল না। আশ্রমে সামান্য সংখ্যক যে মানুষগুলি ছিল, তাদের নিয়েই তিনি প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা যে করেননি, তা নয়। সেবা দিয়েও স্থানীয় মানুষকে আপন করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু যারা সংস্কারের দিক দিয়েই বিপথগামী, তাদের আপন করা সম্ভব নয়। তাই, তিনি প্রায় বান্ধবহীনই ছিলেন। আর শক্তি সম্পন্ন বান্ধবশক্তি ছাড়া বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে একা আর অসহায় অবস্থায় শহীদ হবার মধ্যে তিনি কোন বীরত্বও খুঁজে পান না।

আরও বললেন, 'এই তো ক'দিন হলো দেশভাগ হয়েছে, এর মধ্যেই তিনি পাবনায় লোক পাঠিয়েছেন, সরেজমিনে পরিস্থিতি বুঝে আসার জন্যে। দেখা গেল, যা ছিল- তাই। বরং একদল লোক সব কিছুর দখল নিয়ে গোটা আশ্রমটাই আত্মসাৎ করতে চায়।'

'দেখুন, চেষ্টার কোন কসুর করিনি। আমার তো ওটা জন্মভূমি, আমার অন্তরের একটা স্বাভাবিক টান জন্মভূমির জন্যে আছেই। কিন্তু ধরে রাখতে পারলাম না। আমি যা বুঝেছিলাম, তা বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক দলের বড় বড় নেতাদেরও বলেছিলাম, কিন্তু কেউ তা মেনে নিতে পারলেন না। কাজেই, আমি আদর্শের দিক দিয়ে একাই হয়ে পড়লাম। এই হলো আমার কথা।'

'আর দেখুন, আমি কিন্তু আপনার হিসেব অনুসারে শরণার্থী নই। আমি এখানে এসেছি দেশভাগের প্রায় বছর দেড়েক আগে, ডাক্তারের পরামর্শে। আশ্রমের অন্যান্য লোকজনদের সেখানে রেখেই এসেছিলাম। চিরতরে দেশত্যাগের চিন্তা থাকলে কি আসার আগে সেখানে আমার মায়ের নামে একটা ডিগ্রি কলেজ স্থাপন করে আসতাম। যে দু-চার জন নিয়ত কর্মী না হলে চলে না, তারাই শুধু সঙ্গে এসেছিল।'

'দেখুন দাদা, আমি চিরদিনই মিলনবাদী। মিলনের মধ্যে আমাদের স্বার্থ। কাউকে বাদ দিয়ে কেউ বাঁচতে পারে না। সকলের সত্তা ও স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখাই আমাদের লক্ষ্য। এই কাজ করতে গেলে কোন কোন সম্প্রদায় বা কোন মানুষকে বাদ দেওয়া যায় না। এমন কি কোন দেশ, কোন দল বা কোন মতবাদকেই উপেক্ষা করা চলে না।'

বিধুবাবু এবার কথান্তরে চলে গেলেন। বললেন, 'আমাদের হিন্দু সমাজের মধ্যেও বৈষম্যই বেশি—দল বেঁধে মিলিত হয়ে চলার বুদ্ধি নেই'।

উত্তরে ঠাকুর বোঝাবার চেষ্টা করে বললেন, 'দেখুন, প্রত্যেক সত্তারই স্বস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এ বৈশিষ্ট্য কিন্তু বৈষম্য নয়। বৈশিষ্ট্যকে নিয়েই ঐক্যের চর্চা চলে আসছে ঋষিপুরুষদের আমল থেকে। আধুনিক যুগে মানুষ এই ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যকে ভেঙ্গে চুরমার করতে গিয়ে নিজেরা এক কিম্ভূতকিমাকার জীবে পরিণত হয়েছে। বৈশিষ্ট্য-পূরণী বুদ্ধি নিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক বিবাহসংস্কারের মধ্যেই রয়েছে অনাগত প্রজন্মের সুকৃতি। বিবাহে বর্ণবিচার তাই একটা অবশ্য পালনীয় সামাজিক দিক।' ইত্যাদি বিশ্লেষণাত্মক কথা বলে থামলেন ঠাকুর।

কথাকে আরও অন্য দিকে নিয়ে যেতে চাইলেন বুদ্ধিমান বরিষ্ঠ সাংবাদিক। বললেন, 'আপনি এত কিছু ভারবেন না, ওতে আপনার স্নায়ুর উপরে চাপ পড়বে, আপনার অসুস্থতা আরও বেড়ে যাবে। আপনার সুস্থ থাকার খুবই দরকার আছে'।

এই রকম শুভকামনা-বিনিময়ের পর সেদিনের সাংবাদিক-সাক্ষাৎকার সমাপ্ত হলো।

১৩৫৪ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসের প্রায় মাঝা-মাঝি। বেশ ঠাণ্ডার আবহাওয়া। বিকেলের দিকে একটু রোদ থাকতেই ঠাকুর বড়াল বাংলোর গেটের দিকে আমতলায় এসে একখানা আরাম-চেয়ারে বসেছেন। আশ্রমবাসী কিছু ভক্ত আছেন আশপাশে।

এক ভক্ত জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনিতো যুগ-পুরুষোত্তমকে ধরে চলতে বলেন, কিন্তু পুরুষোত্তম তো সব সময়ে থাকেন না— তাঁদেরও দেহের পতন হয়ে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়। তো, তখন মানুষ তাঁকে ধরবে কেমন করে?'

'পুরুষোত্তমকে ধরা মানে তুমি কী বোঝ?' উত্তরে নিজেই বললেন, 'পুরুষোত্তমকে ধরা মানে তাঁকে ইষ্ট বলে স্বীকার করে নিয়ে তাঁরই কোন ইষ্টপ্রাণ আচারবান্ ঋত্বিকের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে চলা। এই ভাবেই যুগপুরুষোত্তমকে ধরা হয়। আর সর্বাধুনিক পুরুষোত্তমকে ধরলে পুরাতন সকল পুরুষোত্তমের নির্দেশই পূরণ করা হয়। কারণ, এঁরা একই বার্তাবাহী। তাই সর্বাধুনিক পুরুষোত্তমই মানুষের স্বাভাবিক গুরু বা ইষ্ট।'

কোন পুরুষোত্তমের যুগ বলতে কী বুঝবো? তিনি যে সালের যে তারিখে আবির্ভূত হলেন সেই সালের সেই ক্ষণ থেকে তাঁর পুনরার্বিভাবের সাল-তারিখ পর্যন্ত তাঁর যুগ। সর্বাধুনিক পুরুষোত্তমের যুগ নির্ণীত হবে ৩০শে ভাদ্র ১২৯৫ বঙ্গাব্দ থেকে শুরু করে তার পরবর্তী নরদেহ ধারণের সাল-তারিখের ব্যাপ্তিকে নিয়ে।

এখন অনুকূলযুগ চলছে। অনুমান করা যায়, কয়েক হাজার বছর এই যুগই চলবে।

॥ চার ॥

তখন ১৩৫৪ সালের পৌষমাসের শেষ সপ্তাহ। কয়েক দিন মেঘলা থাকার পর সেদিন বেশ পরিচ্ছন্ন রোদ উঠেছে। সকাল বেলাটায় এই রোদ পোহানো সবার কাছেই বেশ আরামপ্রদ। ঠাকুর বড়াল বাংলোর বাইরে এসে তাঁর বসার জন্যে প্রস্তুত একটা তাঁবুর নিচে বিছানায় এসে বসলেন। রৌদ্রস্নাত খোলা জায়গায় অনেকেই এসে জড়ো হলো।

ঋত্বিকদের চলন-চরিত্র সম্বন্ধে কথা উঠলো। কেউ কেউ বললে, আপনি যখন সকলের চরিত্রই জানেন, তখন কেবল নির্দোষ চরিত্রের যোগ্য মানুষগুলিকে ঋত্বিকের পাঞ্জা দিলেই তো পারেন—অযোগ্য ঋত্বিকদের নিয়ে আপনার আর কোন সমস্যা থাকে না। কারও ক্ষতিও হয় না।

ঠাকুর বললেন, 'খুব ভালো কথা কইছো। চারিত্রিক যোগ্যতা বা বিশুদ্ধতা কারও কি তৈরি হয়ে থাকে? এ হলো নিত্য সাধ্য। এ হলো ইষ্টনির্দেশ মেনে নিজেকে ধীরে ধীরে গড়ে তোলার জিনিস। নিজেদের দিয়ে বোঝো না?'

একজন বললেন 'পাঞ্জা তো একটা সম্মানের জিনিস। সেই পূত মর্যাদার অপব্যবহার হতে পারে—সে তো আর এক ফ্যাসাদ!'

'দ্যাখো, আমি তা বুঝি। কিন্তু এমন মানুষ কমই আছে কিংবা হয়তো আদৌ নেই যার দ্বারা সুযোগের অপব্যবহারের সম্ভাবনা একে বারেই নেই।'

'আমি একটুখানি সদ্‌ভাবনার সন্ধান পেলেই তার উপরে ভর করে দাঁড়াবার চেষ্টা করি। না হলে তো ঠগ বাছতে গিয়ে গাঁ উজাড় হয়ে যাবিনি—লোক আর পাওয়া যাবি নানে। এই কথাডা মনে রাখবা যে, সকলে মহাপুরুষ হয়ে জন্মায় না।'

সেই বিকেলের দিকে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন শেরপুরের জমিদার রায়বাহাদুর সত্যেন চৌধুরী।

রায়বাহাদুর আসন গ্রহণ করার পর কুশল-বিনিময় শুরু হলো। তিনি কষ্ট স্বীকার করে দেখা করতে এসেছেন বলে ঠাকুর খুবই খুশি হয়ে তাঁর কৃতজ্ঞতা জানালেন।

সদ্যপ্রাপ্ত স্বাধীনতার উপরে নানা কথা হতে লাগলো। কথা প্রসঙ্গে চৌধুরীমশাই তাঁর মনের একটি মৌলিক প্রশ্নকে তুলে ধরলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'আমরা তো ফ্রিডম চেয়েছিলাম, কিন্তু যে ফ্রিডম পেলাম এটা কেমন হলো—আপনার কী মনে হয়?'

উত্তরে ঠাকুর বললেন, 'আমরা ফ্রিডমই চেয়েছিলাম কিন্তু যা পেলাম তা ফ্রিডম নয়, একে বলা যায় ফিউডম অর্থাৎ কিছু লোকের রাজ। যারা আত্মধান্ধা নিয়ে ঘুরছিলো, তাদেরই ধান্ধা মিটেছে মাত্র। সব মানুষ কি এই স্বাধীনতা চেয়েছিল—যার আবির্ভাবের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে ভিটেমাটি ছেড়ে ভিনদেশে উদ্বাস্তুরূপে গিয়ে নতুন করে মাটি খুঁজতে হলো, অ খুজতে হলো, এ তো সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রবঞ্চনার ফসল। এর চেয়ে ধোঁকাবাজি আর কী হতে পারে?'

বৃটিশের ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেনও ভাবলেন, ভারতের বড়-মাথাকে আলাদা করে দিয়ে এক কবন্ধ স্বাধীনতার উপহার দিয়ে যাবার এইটাই উপযুক্ত সময়। তিনি তাঁর সরকারকে সেই রকমই বোঝালেন। বোঝালেন, ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি খোঁড়া দেশ তৈরি করে রেখে যেতে পারলে ওরা তাদের কলোনির মতোই বশে থাকবে।

মুষ্টিমেয় পাকিস্তানপন্থীরা সময় বুঝে শুরু করলো দাঙ্গা। তারা জানে, সেই দাঙ্গার আগুনকে নিভাতে হলে তাতে জল ঢালতেই হবে। আর সেই জল হবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বীকৃতি। মতলবী মাউন্টব্যাটেন সেই জলই ঢাললেন। বেশি কথা না বাড়িয়ে স্বীকার করে নিলেন দুই জাতির অস্তিত্ব—দুই জাতিকে দিলেন একটি দেশের দুটি অংশ। এটাই ফিউডম– কতিপয়ের রাজ।

বললেন, 'যেভাবে স্বাধীনতা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, তার গোড়াতেই আছে আত্মদ্রোহিতা।'

একদিন কথা উঠলো, পুরুষোত্তম মানবদেহে এসে মানুষকে কতটা দেন? তাঁর সবজ্ঞান উজাড় করে দেন তো?

ঠাকুর উত্তরে বললেন, 'তাঁর সব জ্ঞান বলতে কী বোঝায়, সে-সম্বন্ধে তো আমাদের ধারণাই নেই। কাজেই ওটা কোন কথাই নয়। আর আসল কথা হচ্ছে, তিনি তো তাঁর জানাটাকে জাহির করতে চান না। মানুষ যেটুকু জানার জন্যে জিজ্ঞাসু হয়—অর্থাৎ যেটুকু দিলে মাথায় নিতে পারবে, তিনি সেইটুকুই দেন। যে-যুগে মানুষ যতটা গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত, সে-যুগে ততটাই দিয়ে যান তিনি। একে বলা যায়, যুগোপযোগী দান। সভ্যতা ও সংস্কৃতি এইভাবেই এগোয়। তবে একটা বড় কথা হলো, তাঁর কোন যুগের কোন কথাই পরস্পরবিরোধী নয়। তাঁর সর্বকালের সব কথা ও কর্ম একমুখী— এক তাৎপর্যবাহী।'

এক সময়ে ঠাকুর একটা খুব মজার কথা বললেন। ধরো, যাদব-নামক ব্যক্তি মাধব-নামক ব্যক্তির বাস্তব সাহায্যের উপরে দাঁড়িয়ে বেঁচেবর্তে আছে এবং উন্নতি করছে। এখন যাদব যদি মাধবের দয়ার কথার উল্লেখ পর্যন্ত না করে কেবল বলে, পরমপিতার দয়ায় এসব হয়েছে, তাহলে এটা হবে কিন্তু অকৃতজ্ঞতার একটা উদাহরণ। পরমপিতা কিন্তু এই রকম খোসামুদি চান না। যাদবের কথা এই রকম হওয়া উচিত– পরমপিতার ইচ্ছায় মাধবদার বাস্তব সহায়তায় আমি খুব ভালো আছি। মাধবদার মতো হৃদয়বান নিঃস্বার্থ মানুষ কমই দেখা যায়।

পরমপিতা এই সত্যোচ্চারণে খুশি হন।

আবার ঐ আসরেই কথা উঠলো, যুগ-কথার তাৎপর্য কী? এক-একটা যুগের পুরুষোত্তমের আচার ব্যবহার, লোক-চালনা এক-এক রকম হয়ে থাকে—সেটাই বা কেন?

ঠাকুর তদুত্তরে বললেন, দ্যাখো, মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এক-এক কালে এক-একটা ভাবের হাওয়া ওঠে। সেই হওয়ায় সবাই যোগ দেয়। সেই বোধবুদ্ধির রকমটাই সেই যুগের হাওয়া।

বললেন, 'আজকের যুগের হাওয়াটার কথাই ধরো। এখন মানুষ সব-কিছুর যুক্তি বিচার খোঁজে। আপ্তবাক্য হলেই মানুষ তা গ্রহণ করবে না। অর্থাৎ, বেদবিধান বলেই যে মানুষ নির্বিচারে কোন বিধান মানতে বাধ্য থাকবে, তা কিন্তু নয়। মানুষ এর পিছনে বিজ্ঞান সম্মত যুক্তি খুঁজবে।'

আরও বললেন, 'দ্যাখো না, আমি কী করি। আমি বিজ্ঞানের উপর দাঁড়িয়েই কথা বলি। যা গ্রহণ করবে, তাকে বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাই করেই গ্রহণ করো।'

'সত্য না হলে, তা গ্রহণীয় নয়। আর সত্যই বিজ্ঞান।' অথবা বলতে পারো, বিজ্ঞানসম্মত বলেই তা সত্য। আপ্তবাক্য তো বিজ্ঞানের গবেষণাগারের মোহর নিয়েই বেরিয়ে আসে। কিন্তু যুগের দাবি মতো তাকে আবার নতুন করে বিজ্ঞানের কষ্টি পাথরে বুঝিয়ে দিলেন বিজ্ঞানময় পরমপুরুষ।

এই সময়ে অর্থাৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের দেওঘর-অবস্থান কালে বেশ কয়েকজন নতুন বিদূষী মহিলা তাঁর কাছে এসে কিছুদিন করে থাকেন এবং তাঁদের নানাবিধ-জ্ঞান মার্গীয় প্রশ্ন উথাপন করে সেগুলির উত্তর সংগ্রহ করতেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন কুমারী শিমার, কুমারী মার্টিন, কুমারী অ্যালফ্রেক প্রভৃতি। কুমারী অ্যালফ্রেক হলেন নিউজিল্যান্ডের মেয়ে। আর হাউজারম্যানের মাকে তো আশ্রমবাসিনীই বলা চলে। ছেলের সঙ্গে তিনি নিয়মিত গুরুসঙ্গ করেন এবং আলোচনা-শ্রবণ ও প্রশ্নের মাধ্যমে নিজের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে চলেন। ছেলেও মায়ের এই ইষ্টমুখিনতা দেখে খুব খুশি।

হাউজারম্যানের বন্ধু স্পেনসর অনেকটা ভবঘুরে মানসিকতার মানুষ। সে মাঝে মাঝেই আশ্রম থেকে বেরিয়ে যায়, ভ্রমণ করতে। ভারতের নানা তীর্থক্ষেত্র নানা নগর উপনগর পরিভ্রমণ আবার হঠাৎ সে হাজির হয় গুরুসকাশে—বেশ কিছু দিন থাকে এক-নাগাড়ে। আবার একদিন হঠাৎই বেরিয়ে যায় ভারত দর্শনে। স্পেনসর গুরুগম্ভীর এবং ভাবুক প্রকৃতির। হয়তো হাফপ্যান্ট এবং হাওয়াই চটি পরেই বেরিয়ে গেল। তবে গুরু প্রদত্ত পবিত্র ঋত্বিকদণ্ড নিতে ভুলতো না। আর হাউজারম্যান তো অতিমাত্রায় দণ্ডচেতন ছিল। যখন ঠাকুরের নির্দেশে বা প্রয়োজন বোধে তাঁর সম্মতি সাপেক্ষে দেশে যেতো, তখনও সেখানে গিয়ে যে-কদিন থাকতো, সৎসঙ্গের নিয়ত ঋত্বিককর্মী হিসেবেই সেখানে থাকতো। পুরোমাত্রায় ইষ্টবাণী প্রচার করতো, দেশবাসীকে ইষ্টভাবনায় ভাবিত করে তুলতে যত্নশীল থাকতো। এক কথায়, যাজন নিয়েই তার স্বদেশবাস কাটতো।

এই সময়ের মধ্যেকার এক কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনা। হাউজারম্যানের বুদ্ধিমতী ইষ্টপ্রাণা মা একদিন জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা ঠাকুর, আপনি কি সবাইকে সমানভাবে ভালোবাসেন?'

ঠাকুর প্রশ্নের ধার বুঝে হেসে উত্তর দিলেন, 'আমি কেমন ভালোবাসি—জানেন? যার পক্ষে যেমন ভালোবাসা দরকার, আমি তাকে তেমন ভালোবাসা দিই। ব্যষ্টি হিসাবে এই ভালোবাসার প্রকাশ রকমারি হয়।'

মা কথাটার মানে ঠিক বুঝতে পারলেন না। তাকিয়ে রইলেন ঠাকুরের দিকে, একটু ব্যাখ্যার আশায়।

ঠাকুর বললেন, 'ধরেন, আপনার তিনটি সন্তান—সবাইকে সমান ভালোবাসেন। তাই বলে কি সবসময়ে সবাইকে একই পথ্য খাওয়াবেন। কারও যদি শারীরিক কারণে একটু অন্য রকম খাবার দরকার হয়, তবে সেটা উপেক্ষা করবেন?'

আবার ধরেন, 'একটা ছেলে একটু বেশি আদর চায় একটু তোয়াজ পেলে খুশি হয়। তাহলে সে কি তা পাবে না? আবার অন্যটি আপনার জন্যে কিছু করতে পারলে বর্তে যায়—সর্বদা সেই সুযোগ খোঁজে। তাকে কি আপনি সেই সুযোগ দেবেন না?'

কে জানে, হয়তো গুরুদেব তাঁর মাতৃপ্রাণ ছেলে হাউজারম্যানের দিকেই ইঙ্গিত করলেন।

যে ডাক্তার সব রুগীকেই ভালোবাসেন, তিনি কি সব রুগীর জন্যে একই ওষুধ দেন? না, যার জন্যে যা দরকার, তাই দেন?

এবার মা বুঝলেন, গুরুদেবের সমস্নেহটা কি রকম, তাঁর সমদৃষ্টির অর্থই বা কী।

এই কথার সুযোগ নিয়ে মা বললেন, 'আপনি তো সব মানুষকে কাছে পান না, সে ক্ষেত্রে তো সকলের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে না। তাহলে তাদের প্রতি প্রয়োজন মাফিক ভালোবাসা দেবেন কেমন করে? সে সব লোকের জন্যে তো একঢালা প্রেসক্রিপসনই এসে যাবে।'

'না, ঠিক তা নয়।' ঠাকুর বুঝাতে লাগলেন মাকে। 'ধরুন, আমেরিকায় হাউজারম্যান আছে, আপনি আছেন, আপনারা তো এই আদর্শটা চারিয়ে দিচ্ছেন। সেখানে আপনাদের মতো মানুষরাই তো আমার প্রতিনিধি। সেই জন্যেই তো আমি যোগ্য—ঋত্বিকের সংখ্যাবৃদ্ধির কথা এত করে কই।'

'আপনারা কী না পারেন? আপনারা ঢের পারেন, ঢের পারছেন, আরও অনেক পারবেন। পরমপিতা আপনাদের মতো মানুষদের সুস্থ সবল রাখুন—তাহলেও আমি সবার কাছে পৌঁছে যাবো।'

সময়টা মাঝ বয়েসী মাঘের আমেজী ঠাণ্ডা— ভালোই উপভোগ্য। সব দিক্ দিয়েই উপস্থিত সকলের মন ভরে গেল গুরুবাক্যের আশ্বাসে।

ঐ ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের মধ্য-মাঘেরই এক দিনের কথা। পুরনো ভক্ত ডাক্তার হরিপদ সাহার কী মনে হলো, হঠাৎ প্রশ্ন করলেন ঠাকুরকে, 'রামকৃষ্ণ ঠাকুর তো অনেক গুরুকরণ করেছিলেন, তাতে কি তিনি বহুনৈষ্ঠিক হলেন না?'

'এই তেশ মারিছে! আগে রামকেষ্ট ঠাকুরকে বোঝ। তিনি বহুমুখী হবেন কোন্ দুঃখে? সেই পুকুরের চার ঘাটের কথা শোননি। শুধু চার ঘাট কেন, আরও অনেক ঘাটই করা যায়। যেখান দিয়েই নামো, ঐ একই জলে ডুব দিয়ে শীতল হতে পরবে।'

বললেন, 'রামকৃষ্ণদেব বহুকে বহু হিসেবে দেখেননি। তিনি এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, সবগুরু সব মত ও সব পথ মূলতঃ এক এবং অভিন্ন। এটা বোঝাতে গিয়েই বাহ্যতঃ ঐ নানাগুরু করেছেন। তাঁকে তো মানুষ চিনলো না। তাঁর আবার কর্ম কী? তাঁর কর্ম, সবই তো লোকশিক্ষার জন্যে।'

তিনি আপাদমস্তক পরমপুরুষ। তাঁকে মহামানব বললে পুরোটা বলা হয় না।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র নতুন করে শ্রীরামকৃষ্ণকে তুলে ধরেছেন মানুষের সামনে। যুগভাষ্যকার অনুকূলচন্দ্রের মুখে শুনে নাও রামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে তাঁর সর্বাধুনিক ভাষ্য— শুনে রাখো তাঁর সুস্পষ্ট মূল্যায়নের বাণী।

যদি বলো তাঁর যন্ত্রণাদায়ক গলরোগে মৃত্যুর কথা, তো শোনো। এতটুকু কাতরোক্তি না করে নির্বিকার চিত্তে দুঃসহ যন্ত্রণা মেনে নিয়ে পঞ্চভূতের দেহ ত্যাগ করলেন তিনি। যুগে-যুগে পুরুষোত্তমগণ এই ভাবে নিঃশব্দে মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করে পৃথিবী থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। জ্যোতির্ময় পরাৎপর পুরুষের এই এক অভিন্ন প্রকৃতি। মৃত্যুবরণকালে কারও প্রতি কোন অভিযোগ নেই, বেদনা ভোগের কোন লক্ষণ নেই। প্রকৃতির বিরুদ্ধেও কোন ক্ষোভ নেই।

পুরুষোত্তম চরিত্রের এই এক একান্ত স্বতন্ত্র মাপকাঠি।

॥ পাঁচ ॥

১৯৪৮ সাল চলছে। এত দিনে বড়াল বাংলোকে কেন্দ্র করে দেওঘরে সৎসঙ্গ আশ্রম বলে একটা নতুন অস্তিত্ব গজিয়ে উঠেছে। বড়াল বাংলোর চত্বরে পাকা বিল্ডিংএর প্রায় সামনাসামনি একটা গোলাকার স্থায়ী তাসু তৈরি হয়েছে, টিনের ছাউনি দিয়ে। ঠাকুর প্রায়ই সেখানে এসে বসেন। এর নাম হয়ে গিয়েছে গোলঘর। এর সব্বদিকই খোলা, মাঝখানে ঠাকুরের শয়ন বা উপবেশন করার মতো বড়শড়ো তক্তপোশে শুভ্রশুচি—পরিচিত বিছানা।

সেটা ৪৮ সালের শীতকাল। ঠাকুর ঐ গোলঘরে বসে আছেন, বিস্তৃত বিছানায়। আশেপাশে বসে আছেন ভক্তগণ। তাঁদের মধ্যে আছেন ঋত্বিগাচার্য কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, প্রকাশ বসু, রে আর্চার হাউজারম্যান, তাঁর মা প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ।

হাউজারম্যানের মা উপস্থিত আছেন লক্ষ্য করে ঠাকুর আপন মনেই বলতে থাকলেন, একজন খৃষ্টান সবার আগে যিশুকে ভালোবাসবে, আর সেই ভালোবাসার মাধ্যমে সে অন্য সব প্রেরিতপুরুষকে ভালোবাসবে। একজন হিন্দুর উচিত শ্রীকৃষ্ণকে বা যে প্রেরিতকে সে অনুসরণ করে তাঁকে আগে ভালোবাসা। তাঁর মাধ্যমে সে অন্যান্য যাবতীয় প্রেরিতকে ভালোবেসে ফেলবে। কোন প্রেরিতকে বোঝা মানে, তিনি যেমন ছিলেন, সেই ভাবে তাঁকে বোঝা—তাঁর মর্ম চিহ্নিত করা। কোন খৃষ্টান যদি বলে, যিশুকে নয়, আমি মা মেরিকে ভালোবাসি, তাহলে সে মা মেরিকে ভালোবাসে কিনা তাতেই সন্দেহ আছে।

আবার বললেন, কেউ যদি তার নিজধর্মমতের প্রবক্তাকে ঠিকঠিক ভালোবাসে, তাহলে অন্যান্য প্রেরিত পুরুষের প্রতিও তার ভালোবাসা গজাতে বাধ্য। তা না হলে বুঝতে হবে, ঐ ভালেবাসার মধ্যে প্রবৃত্তির খাদ আছে।

এই প্রসঙ্গে আবার যোগ করলেন, অনেক সৎলোক শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যাকারীদের পাল্লায় পড়ে বিভ্রান্ত হয়ে থাকে। এর জের টেনে বললেন, শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা পরিবেষণ করার মতো পাপ খুব কম আছে।

তাই, শাস্ত্র বা ধর্ম গ্রন্থের টীকাটীপ্পনী বা সেই গ্রন্থের কথকের ব্যাখ্যার উপরে নির্ভর না করে মূল শাস্ত্রটি নিজের বুদ্ধিতে বুঝতে চেষ্টা করা বরং ভালো।

একবার নিমাই পণ্ডিতকে এক ভাগবতপাঠক প্রশ্ন করেছিলেন, 'কি বাবা, যা বলছি, তা সব বুঝতে পারছো তো?'

উত্তরে নিমাই বলেছিলেন, 'আজ্ঞে না, আপনার টীপ্পনী আর ব্যাখ্যা ঠিক ধরতে পারছি না, কিন্তু আপনি যখন গ্রন্থের মূল অংশ পড়ছেন, তখন বুঝতে কোন অসুবিধাই হচ্ছে না।'

নিমাইয়ের কাছে মূলগ্রন্থই স্বপ্রতিষ্ঠ, কথকের ব্যাখ্যাই যত গোলমালের কারণ। কারণ তার মধ্যে রয়েছে ব্যাখ্যাতার আপন প্রবৃত্তির মিশেল।

খানিকক্ষণ পরে ঠাকুর রে আর্চারের মাকে বাললেন, আপনি তো প্রোটেষ্ট্যান্ট, তো আপনি কি ক্যাথলিকদের ভালোবাসেন?

রে-জননী উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, ওদের আমি ভালোবাসি। ওদের একটা নিয়ম আমার খুব ভালো লাগে। ওরা সপ্তাহের একটা নির্দিষ্ট দিনে ওদের ধর্মযাজকের কাছে কৃতপাপের কথা স্বীকার করে এবং ঈশ্বরের কাছে দীনতা সহকারে ক্ষমাভিক্ষা চায়। এই স্বীকারোক্তি এবং নিজের দৈন্য জ্ঞাপন আমার খুব ভালো লাগে।

রে-জননীর কথায় ঠাকুর চট করে তাঁর তরুণ বয়সের এক ঘটনার স্মৃতি ফিরে পেয়ে সে-সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলতে লাগলেন।

বললেন, 'মা, আমার ছোটবেলায় একবার ঐ দশা হয়েছিল। আমি ভাবতাম, আমি সর্বশক্তিমান পরমপিতার সন্তান— আমি শুদ্ধবুদ্ধ, নিষ্পাপ, আমারও শক্তি অসীম। আমি জ্যোতির জাতক, আমি নির্ভয়, নিষ্কলঙ্ক ইত্যাদি।'

এই রকম মনোবলে এবং আত্মপ্রসাদের অনুভূতির কালে একদিন দীনতার ভজনকারী এক বৈষ্ণব সাধু আমাকে উপদেশ দিলে, না গো, ঐ ভাবে নিজেকে নিষ্কলুষ এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সন্তান বলে ভাবতে নেই– ওতে অহঙ্কার আসে, পতন ঘটে। বরং বলবে, হে গোবিন্দ, আমি নরাধম, ঘোর পাপিষ্ঠ। আমি বিষ্ঠাতুল্য ঘৃণ্য এবং হীন। তুমি নিজ গুণে আমাকে উদ্ধার না করলে আমার চরম নরক ছাড়া গতি নেই।

এই বৈষ্ণবীয় উপদেশ শুনে আমি তাই করতে লাগলাম। আমি পদ্মার তীর ধরে হাঁটি আর নিজে মহাপাপী, নরাধম এবং ক্ষমারও অযোগ্য বলে ভাবি।

রে-জননী ঠাকুরের নিজ-জীবনের এই কাহিনী নিবিষ্ট চিত্তে শুনে চলেছেন।

শেষকালে কী হলো জানেন? ঠাকুর বিবৃতি দিয়ে চলেছেন।

'আমার ভিতরটা শেষ হয়ে যেতে লাগলো, আমি ফুরিয়ে যেতে বসলাম। আমি যেন চোর, লোকের ঘৃণা কুড়ানোরই যোগ্য।'

'সপ্তা দুই ধরে এই রকম রিহার্সেল দেবার পর একদিন সূর্যাস্তলগ্নে পদ্মার ধারে ঘুরছি, আগে এই রকম সময়ে রক্তলাল সূর্যের দিকে তাকালে এক অপূর্ব আনন্দে ও সৌন্দর্য-বোধে হৃদয় মন ভরে উঠতো, সেদিন কী হলো জানেন?'

'আমি ভিতরে ভিতরে সেঁধিয়ে যেতে লাগলাম। অপূর্ব মনোরম দৃশ্যে হৃদয়ে কোথায় আনন্দ হবে, তা না আমি ভীত হয়ে শেষ হয়ে যেতে বসলাম। মনে হলো, আমি এখনই হার্ট-ফেলিওরে মারা যাবো। নিরুপায় হয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, পরমপিতা, আমি ভুল করেছি, আমাকে মাফ করো—আমি পাপী-তাপী নই, নরাধম নই- আমি সর্বশক্তিমান তোমারই সন্তান আমি পবিত্র, আমি পবিত্র, আমি পবিত্র—আমি অমৃত লোকের অধিকারী, নিষ্কলুষ, বীর্যবান। শরণাগত হয়ে এই রকম বলতে বলতে নিজেকে ফিরে পেলাম—বেঁচে গেলাম।'

বললেন, 'তাই ঠেকে শিখে আমার ধারণা হয়েছে—পাপের কথা বেশি বলা ভালো না। আমি পাপী, আমি নিকৃষ্ট, আমি দুরাশয়—এই রকম চিন্তা করার মধ্যে নিস্তার নেই। বরং ভাবতে হবে, আমরা পরমপিতার সন্তান, আমরা অজর, আমরা অমর। এই স্বতঃ-অনুজ্ঞাই আমাদের শক্তি দিতে পারে—তাঁর পথে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে।'

নিজেকে শয়তানের প্রজা ভাবতে নেই। পরমপিতার সন্তান হিসেবে পরমপিতার কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হবে।

সদ্‌বোধক, অস্তিবোধক, বৃদ্ধিচেতন মনন-সাধনার দরকার আছে অধ্যাত্মজীবনের স্ফুরণের জন্যে। নেতিচিন্তা মরণের পথই দেখিয়ে দেয়।

রে-জননী নতুন এক বিজ্ঞানসম্মত বিধানের সন্ধান পেলেন। সেটা হলো, বদ্ধধারণার বিজ্ঞানসম্মত অননুমোদন।

আলোচনা সভায় কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন—সঙ্গ না করলে কি কারও প্রতি শ্রদ্ধাজাগ্রত হয়?

সাক্ষাৎ ইষ্টগুরুর উত্তর—'শুনে হয়। আবার, বই পড়েও হয়। তবে, যার মুখ থেকে শোনা হচ্ছে, সেই লোক যদি প্রেম-পরায়ণ হয়, তবে খুব ভালো ফল হয়। যিনি কাহিনী শোনাবেন, তিনি প্রেমপরায়ণ হলে অর্থাৎ যাঁর সম্বন্ধে বলছেন, তাঁর প্রতি প্রেমবদ্ধ হয়ে থাকেন, তাহলে শ্রোতার মনেও সেই প্রেমানুরাগের ছাপ পড়বেই পড়বে। আর সেই কথক যদি তার বক্তব্যের সঙ্গে নিজের চালচলন ও আচরণের সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলে, তাহলে শোনার ফল হয় অমোঘ।'

তাই যোগ করে দিলেন, 'প্রকৃত বিশ্বাসী মানুষ তার বিশ্বাসের জোরে অন্যের মনে বিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে পারে।'

মোদ্দা কথা এইটা।

সদ্‌গুরু স্বদেহে বিদ্যমান না থাকলেও এই ভাবেই তাঁর প্রতি মানুষের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা জাগ্রত হতে পারে।

আর, বই পড়াও তো বইয়ের অভিলক্ষ্য ব্যক্তির চরিত্র প্রবাহের সঙ্গ করা। এখানে বইয়ের লেখক হলেন বক্তা। তাঁর ইষ্ট-প্রেম এবং ইষ্ট-প্রতিষ্ঠার নেশা ও প্রয়াস তাঁর লিখন শৈলীর ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হবেই। সফল জীবনীকারের জীবনীগ্রন্থ জীবন্ত হয়ে কথা কইতে থাকে পাঠকের সামনে, কথকের আসনে বসে। এমন জীবনী ও জীবনীকারকে পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়।

এই রকম জীবনীগ্রন্থ বাণিজ্যিক সাহিত্য নয়। এ ভাগবত সাহিত্য। আর ভাগবতকার মানেই ভগবদ্‌ভক্ত— ঈশ্বর প্রেমী।

এমন একখানি গ্রন্থও চিরজীবন্ত, তার লেখকও মৃত্যুঞ্জয়ী।

কথা বলতে বলতে একদিন ঠাকুর বললেন, 'আমি নিজেও অনেক সময় সঙ্কোচে পড়ে যাই—যে-কথাটা খুব জোর দিয়ে বলা উচিৎ, তা আর বলা হয় না। ভদ্রতা রক্ষা করতে গিয়ে মানুষকে বাঁচার রাস্তায় চালাতে পারি না।'

'সে আবার কেমন?' ভক্তদের জিজ্ঞাসা।

'এই দেশবন্ধুর কথাই ধরো না কেন। তাঁর অনুরাগী ভক্তরা রোগমুক্তির জন্যে তাঁকে দার্জিলিং নিয়ে গিয়ে রাখার জন্যে সব ঠিক করে ফেলেছে। তাদের ধারণা, ওখানকার স্বাস্থ্যকর জলবায়ুতে যক্ষ্মারোগের উপশম হবে—তিনি আবার সেরে উঠবেন। আমার ধারণা ছিল, অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্যে গুরুসান্নিধ্যে গুরুগৃহে বাসই সর্বোত্তম ব্যবস্থা। দাশদার রাজনৈতিক চেলাদের দৃঢ়সংকল্পের জন্যে আমার প্রস্তাবটা মৃদুভাষায় বলেই নিবৃত্ত হতে হলো। যতটুকু চাপ দিয়ে তা করা সম্ভব হলেও হতে পারতো, তা আর সম্ভব হলো না। হতাশ হয়ে রশি ছেড়ে দিতে হলো।'

'আবার মুক্তাগাছার জমিদার যতীন আচার্যির কথা ধরো। সেই রাত্রে তার পিছনে যম ঘুরছিল। আমি সব দেখতে পাচ্ছি, সব বুঝতে পারছি, কিন্তু তাকে হাজার রকমে বুঝিয়েও নিবৃত্ত করতে পারলাম না। এক এক সময়ে ইচ্ছে হচ্ছিল, তার মোটর গাড়ি বিকল করে দিয়ে তাকে আটকিয়ে রাখি। কিন্তু সব কি করা যায়? যেখানে বাঁচার প্রতি মানুষের এত অনিচ্ছা, সেখানে বোধ হয় এমনি ভাবেই হাতের থেকে হ্যান্ডেল কেড়ে নেয়—কিছুই করতে পারি না, অসহায় হয়ে পড়ি।'

বললেন, 'আমার অসহায় অবস্থা তোমরা বুঝবে না।'

মরণকে বেইজ্জৎ করতে তিনি পারেন— তাকে তার থাবা গুটিয়ে নিতে বাধ্য করার কৌশল তিনি জানেন, কিন্তু মানুষ তাঁকে সে কায়দা খাটাবার সুযোগ দেয় না। এই কথাটাই পরিষ্কার প্রকাশ করলেন জীবনসাধক ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র।

হিমাইতপুর থাকার কালে কতবার প্রকাশ করেছেন এই কষ্টকর অসহায় অবস্থার কথা। দেওঘরে এসেও সে ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের পীড়া সমানভাবে যন্ত্রণা দিয়ে চলেছে এখনও। মানুষের জন্যেই মানুষের-ভগবানের চোখের জল শুকনো হয় না।

॥ ছয় ॥

নোয়াখালি জেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামের ছেলে প্রভাত মজুমদার। ১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লেগেছিল নোয়াখালি জেলায়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলতে বোঝায় সমান সমান দু'পক্ষের হননমুখী লড়াই। এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তা নয়। আসলে এটা দাঙ্গাই নয়। এক পক্ষকে মার দিচ্ছে আর একপক্ষ। দুর্বল অসংগঠিত হিন্দুরা মার খাচ্ছে সংখ্যাগুরু ধর্মদ্বেষী মুসলমানদের হাতে। এ কথার অর্থ এই নয় যে, সব মুসলমানই ধর্মদ্বেষী আর সব হিন্দুরা সব মুসলমানের হাতে মার খাচ্ছে। ঘটনা ঘটেছিল এই রকম যে, সাধারণ হিন্দুরা পাইকারি হারে হিংসার শিকার হয়েছিল সেই সব মুসলমানদের হাতে যারা পরধর্মদ্বেষকে নিজের ধর্মের অঙ্গ বলে বুঝে নিয়েছিল। কী দুর্ভাগ্য এই মানবজাতির।

যে কথা হচ্ছিল। প্রভাত মজুমদার শিকার হয়েছিলেন এই ধর্মদ্বেষী ভ্রাতৃমারণের। ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে এসে সেই ইষ্টপ্রাণ-শিষ্য গল্প করে বলছিলেন, কেমন ভাবে তিনি গুরুর দয়ায় অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে ফিরে আসতে পেরেছেন শ্রীগুরুর শ্রীচরণপ্রান্তে।

কথা হচ্ছে জীবন রক্ষার প্রায় দু'বছর পরে দেওঘরে বড়াল বাংলোয় বসে। শুনে ঠাকুর বললেন, দ্যাখো প্রভাত, ইষ্টপ্রাণতার জোরে এই রকমই হয়। শুনেছি, বাইবেলেও প্রভুপ্রেমের এই দৈব শক্তির কথা বলা আছে। সেখানেও এই নামের অস্তিত্বেরও উল্লেখ আছে। আর বলা আছে, এই নামের আওতায় যারা আসবে, তারা নামমাহাত্ম্যের জোরে সকল আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা পাবে। আমরা একেই জানি পরমপিতার দয়া বলে।

গল্পের মাঝে প্রভাত মজুমদার স্বীকার করলেন, সেই মারণাঘাতের একেবারে মুখোমুখি হয়ে মৃত্যুর শীতল সান্নিধ্যের মধ্যেও দেখতে পেয়েছিলেন করুণাময় ইষ্টদেবের সহাস্য শ্রীমুখখানি এবং তাঁর সম্প্রসারিত বরাভয়-হস্তের ছত্রচ্ছায়া। সেই মুহূর্তের স্মৃতি ভোলবার নয়।

স্মিতবদনে সব শুনলেন ঠাকুর। বললেন, এই রকমই হয়। ঐটাই পরমপিতার দয়া— তাঁর স্নেহল রূপের আভাস।

নোয়াখালি কিলিং ছিল ক্যালকাটা কিলিং এরই সহোদর ভাই। ঘটনার বিশদ বিবরণ শুনে ঠাকুর বললেন, এ তো দেখছি, ভক্ত প্রহ্লাদের চেয়েও কঠিন পরীক্ষায় পাস করে আইছে। দয়ালের দয়ায় এই রকমই হয়।

একটা দরকারি কথার জবাব পাওয়া গেল একদিন দেওঘরে বসে। স্বস্তিসেবক বাহিনীর সেই কর্মকর্তা শরৎ-চন্দ্র কর্মকার রামকানালিতে সৎসঙ্গের কলোনি করার উদ্দেশ্যে মাথাপিছু ২৫০ টাকা করে অনুদান ভিক্ষার ব্যাপারে গুরুদেবকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'নন্-সৎসঙ্গীদের কাছ থেকে এই টাকা নেওয়া যাবে তো?'

ঠাকুর উত্তরে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, তা নেওয়া যাবে—সকলের কাছ থেকেই নেওয়া যাবে। তবে, তুমি ঐ যে নন্-সৎসঙ্গী বললে, ঐ বলাটা ঠিক হলো না। বলতে পারতে নন্-ইনিশিয়েটেড অর্থাৎ— এখনও দীক্ষা হয়নি, এমন। সৎসঙ্গী নয় কে? 'সৎ' অর্থাৎ জীবনবৃদ্ধির অনুরাগী যারা— সৎ মানুষের সঙ্গ যারা করে, তারা তো সকলেই সৎসঙ্গী। তুমি দীক্ষিত এবং অদীক্ষিত— এই ভাবে উল্লেখ করতে পারো।'

মানুষের মনে একটা প্রশ্ন ছিল, সেটা উঠে গেল।

বাইবেলে পাওয়া যায়, এক সময়ে যোহন বলেছিলেন, আদিতে বাক্য ছিলেন, বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন—বাক্যই ঈশ্বর ছিলেন (এই বাক্ই আদি নাদ) এর থেকেই যাবতীয় সৃষ্টি।

দেওঘরে বসে এই কথাটি ঠাকুর আর একবার বললেন। বললেন তাঁর মতো করে। বললেন, 'শব্দই আচরণের মধ্য দিয়ে জীবন হয়ে ফুটে উঠলো— রক্ত এবং মাংসের রূপ গ্রহণ করলো। সুতরাং, বলা যায়, বাক্য ও আচরণই মানুষের জীবন ও অস্তিত্বরূপে ফুটে উঠেছে।'

ব্যাখ্যাসূত্রে যোগ করলেন, 'মানুষ যে আজ মানুষ হয়ে উঠেছে, তার পিছনেও আছে আদি বাকের অজস্র আচরণ অর্থাৎ আচলন—মানে সম্যক চলনের অশেষ–বিধ রকম-ফের।'

পরম বাক্ বা ধ্বনির এই ঘোলা-ঘাঁটার নামই বিবর্তন। জীব হোক বা বস্তু হোক—আদিধ্বনির এই আত্ম-বর্তনের নিরন্তরতার ফলেই তাদের উদ্ভব সম্ভব হয়েছে।

একে আদি-চৈতন্যের বিস্ফোরণও বলা যায়।

আদি চৈতন্যই পরম প্রাণ। তিনি আছেনই। তবে আদি-কালের সেই আত্মানুভূতি বা অস্মিতার মধ্যে ছিল একটা অসন্তোষ। এ হলো একাকীত্বের অসন্তোষ। আমার আত্মপ্রকাশন-লীলার কোন সহভোক্তা নেই—এই অভাববোধ থেকেই জাত হলো এক অব্যক্ত যাতনা। সেই যাতনা থেকে জাগ্রত হলো পরা-চৈতন্যশক্তির বুকে নবতর বেদনার আর এক বিঘূর্ণন—আকর্ষণ এবং বিতাড়ন। নানাবিধ মাপের চৈতন্য পরমাণু ও পরপরমাণুদের চাপাচাপি এবং বিচ্ছুরণ—অর্থাৎ আকর্ষণ এবং বিতাড়নের মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে গেল সঙ্গীহীন অস্মিতার বুকে আত্ম-বিভাজনের এক মহোৎসব।

এই হলো আদিবাক্ বা আদি-নাদের আচরণ। একের বেদনা থেকেই অনেকের সত্তার নকশা। একে বলা যায় জগদ্ব্যাপী এক রমরমা আত্মরমণের রভসোল্লাস।

একবার আগ্রা সৎসঙ্গের এক সৎসঙ্গী এসেছেন ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে। হুজুর মহারাজের আদরের কন্যা সুশীলা-মা অর্থাৎ মনোমোহিনী দেবীর জ্যেষ্ঠ সন্তান তথা প্রথম পুত্র বাংলা সৎসঙ্গের প্রাণ-পুরুষ ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের নাম শুনছেন অনেক দিন থেকেই, এবার দেখা পাওয়ার সুযোগ পেয়ে কলকাতা থেকে চলে এসেছেন দেওঘরে। ভদ্রলোক য়ুনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক-এর কলকাতাস্থিত আঞ্চলিক অফিসের একজন পদস্থ কর্মকর্তা। তিনি এসে বিনীত প্রণাম নিবেদন করে তাঁর পরিচয় দান করলেন। তিনি আগ্রার সৎসঙ্গী শুনে ঠাকুর অতিশয় আদরসহকারে তাঁকে গ্রহণ করে সেখানকার সৎসঙ্গের খবরাদি শুনলেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত কুশল বার্তা জানতে চাইলেন অতি স্নেহের আপনজন হিসাবে।

কথা প্রসঙ্গে ঠাকুর বললেন, 'আমার এই ভাবনা চিন্তাগুলি যদি আপনি শোনেন এবং আপনার গুরু-ভাবনার দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু মত প্রকাশ করেন, তো খুব ভালো লাগবে।' এই বলে অনুলেখক প্রফুল্ল দাস-মশাইকে ইংরেজি বাণী থেকে কিছু পড়ে শোনাতে বললেন। দাসমশাইকে বলে দিলেন, 'ওঁকে শুনিয়ে ওঁকে দিয়ে ঠিক করিয়ে নাও।'

এই কথা শুনে ভদ্রলোক বললেন, 'সন্ত-পুরুষের বাণী চিরকালই ঠিক থাকে— তাকে আর ঠিক করতে হয় না। আমাদের কাজ হলো আপনাদের মতো গুরুমুখ-প্রাপ্ত সেই উপদেশ গুলি মেনে চলা।'

সেদিন সন্ধ্যায় ঠাকুরের সামনেই উক্ত পশ্চিমদেশীয় সৎসঙ্গী ভদ্রলোককে নিয়ে সৎসঙ্গ করা হলো। তাতে সুরেশ মুখোপাধ্যায়, হরিদাস ভট্টাচার্য ইত্যাদি কয়েকজন আগ্রা সৎসঙ্গের বাঙালি শিষ্যও উপস্থিত ছিলেন।

প্রথমে আহ্বানী দিয়ে তৎপর যথারীতি বিনতিগীতি সমাপনান্তে আচমনিক অভিভাবন এবং পুরুষোত্তমবন্দনা ইত্যাদি সহ প্রথামত সৎসঙ্গে'র মন্ত্রোচ্চারণ-অংশ সমাপ্ত হলো। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর লিখিত সত্যানুসরণ থেকে পাঠ হলো। হিন্দী পুস্তক থেকেও কিছু পাঠ করা হলো। অনুষ্ঠান-চলাকালে রমেশ চক্রবর্তী হঠাৎ করে উচ্চৈঃস্বরে ঠাকুরের প্রণামমন্ত্র পাঠ করতে লাগলেন। তাতে করে ঠাকুর মহা অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন।

পরে এই নিয়ে বললেন, যে-আসরে সন্ত সদ্‌গুরুদের বাণী নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, হুজুর মহারাজের উপদেশ নিয়ে চর্চা চলছে, সেখানে হঠাৎ করে আমার প্রশস্তি নিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগলে—সাধারণ বোধটুকু পর্যন্ত লোপ পেয়েছে। তাও আবার একজন ঐ-দেশীয় গুরু ভাইয়ের সামনে। মনে রাখবে, কখনও এরকম কর্ম করবে না। আমাকে এ-ভাবে অপমান করার অধিকার তোমাদের দেওয়া হয়নি। কী মজা দ্যাখো, হুজুর মহারাজের বই পড়া হচ্ছে, তার মধ্যে আমারই সামনে 'সত্যানুসরণ' পাঠ করা শুরু করে দিলো! আবার আমারই সামনে পুরুষোত্তমবন্দনা পাঠ আরম্ভ হলো। আমাকে আমার সতীর্থদের সামনে আর কী রকমভাবে ছোট করা চলতো? তোমাদের এটাও জানা নেই, ঐ পুরুষোত্তমবন্দনা কেষ্টদার আগ্রহাতিশয্যে আমি কেমন করে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। ওর পিছনে আমার কত অমত এবং কত অস্বস্তি। আমার সামনে কাউকে যাজন করাও আমি সহ্য করতে পারি না। তোমরা যেরকম ভাবে সৎসঙ্গ করো, তাও আমার সামনে করা ঠিক না।

জেনে রাখো ঐ প্রশংসায় আমি খুশি হই না। আমাকে যদি প্রশংসা করতেই হয়, সেটা করবে তোমাদের কাজের ভিতর দিয়ে, তোমাদের চরিত্রের ভিতর দিয়ে, তোমাদের অর্জিত সৌজন্যের ভিতর দিয়ে। তোমরা প্রশংসনীয় কাজ করলে এবং তার মধ্য দিয়ে যদি তোমরা প্রশংসিত হও, একমাত্র তখনই আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করি। তোমরা জনকল্যাণের কাজ নিয়ে লোকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ো, হাজার মানুষের হাজার মুখে তোমাদের প্রশংসা রটতে থাকুক, দেখবে,

তখন আমার কী আনন্দ! আমার তোয়াজে আমি খুশি হই না—বিরক্ত হই, নিজেকে খুব ছোট মনে করি। এই সব মনে রেখে চলবে।

প্রখ্যাত আইনজ্ঞ এবং নিষ্ঠাবান্ হিন্দুসংগঠক শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মশাই ইদানীং ঠাকুরের ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁর ব্যক্তিসান্নিধ্যের প্রতিও আসক্ত হয়েছেন। কিছুকাল থেকে তিনি হার্টের অসুখে ভুগছেন। ঠাকুরের সান্নিধ্যে আশ্রমে কিছু কাল কাটিয়ে যাবার ইচ্ছে হয়েছে তাঁর। সস্ত্রীকই থাকবেন। সেই মর্মে তিনি সুশীল বসুর কাছে মনোভাব ব্যক্ত করায়, বসুমশাই সেই খবর পাঠিয়েছেন ঠাকুরের কাছে। সেই চিঠি এসেছে আশ্রমে। তদনুসারে আশ্রমের চৌহদ্দিতে রঙ্গনভিলায় নির্মলবাবুর অবস্থানের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য, তিনি তাহলে সহজেই বড়াল-বাংলোয় এসে ঠাকুরের কাছে বসতে পারবেন আবার ঠাকুরও প্রয়োজন হলেই তার ঘরে গিয়ে তাঁর খোঁজখবর নিতে পারেন।

দেশসেবক নির্মলবাবু সকলের কাছে এন. সি. চ্যাটার্জি নামেই পরিচিত ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় মেধাবী ছাত্র হিসেবে তিনি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন। পড়াশুনো করতে বিলেত যাবার সময়ে তিনি যখন স্যার আশুতোষকে প্রণাম করতে যান, তখন বাংলার বাঘ তাঁকে এই বলে আশীর্বাদ করেছিলেন, বিলেত যাচ্ছো পড়তে—খুব ভালো কথা, কিন্তু তোমাকে আমার মুখ রাখতে হবে। তোমার পরীক্ষায় ফার্স্ট হতে হবে।

নির্মলচন্দ্রেরও বিশ্বাস ছিল, ওটা এমন কিছু নয়–ফার্স্ট তিনি হতেই পারবেন।

কিন্তু পরীক্ষার মাঝখানে নির্মলচন্দ্র মারাত্মক রকম অসুস্থ হয়ে পড়েন। এক রকম বাহ্যিক জ্ঞানহারা অবস্থায় তিনি পরীক্ষার বাকি বিষয়গুলি লিখেছিলেন। কিন্তু দেখা গেল, তাতেও তিনি প্রথম স্থানাধিকারী হয়েছেন।

সেই এন.সি. চ্যাটার্জি এসে থাকতে চান শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে— দেওঘর আশ্রমে।

॥ সাত ॥

বর্ণাশ্রম সম্পর্কে কথা উঠেছে। ঠাকুর বললেন, শিক্ষিত সমাজের মধ্য থেকেই একদল লোক বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছে। হরিজন–সম্প্রদায়ের দেব-মন্দিরে প্রবেশের অধিকার নিয়ে বেজায় সোরগোল তুলেছে তারা। শুধু তাই নয়, উচ্চবর্ণকর্তৃক তাদের হাতের-প্রস্তুত অন্ন-ব্যঞ্জন-গ্রহণের একটা সামাজিক আন্দোলনও গড়ে উঠছে দিকে দিকে। ধারণাটা হচ্ছে, তাদের হাতের অন্ন ভোজন করলেই তাদের সমাধিকার নাকি স্বীকৃত হবে এবং তারা উচ্চবর্ণের লোকের সমস্তরে উঠে আসবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, কুষ্টিয়া শহরেও এই সামাজিক গণ্ডিভাঙ্গার আন্দোলন চালু হয়েছিল। একবার আয়োজন হলো, শহরের মধ্যস্থলে বিখ্যাত গোপীনাথ-অঙ্গনে হরিজন সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা মন্দিরে সমবেত হবে এবং তাদের প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জনাদি উচ্চবর্ণের নামীদামী ভব্য ব্যক্তিরা পঙ্‌ক্তিবদ্ধ হয়ে বসে তা ভোজন করবেন। আমার পিতাও এই আয়োজনের একজন কর্মকর্তা ছিলেন এবং আমাদের পরিবারের পুরুষ সদস্যগণ সবাই শ্রীগোপীনাথের নাটমন্দিরে পঙ্‌ক্তিবদ্ধ হয়ে বসে হরিজন সম্প্রদায় কর্তৃক পরিবেশিত সেই অন্নব্যঞ্জন গ্রহণ করি।

জাতপাত ভাঙার এই আন্দোলন-সম্পর্কে ঠাকুর বললেন, আন্দোলনটা হরিজনদের মন্দিরে ঢোকানো বা তাদের হাতের অন্নজলগ্রহণের ব্যাপার না হয়ে তাদের সদাচারী ও সমুন্নত করে তোলার জন্য হওয়া উচিত ছিল। আরও বললেন, আমি তো জানি, সদাচারী শূদ্রের মন্দিরে প্রবেশে কোন বাধা থাকতে পারে না। আমি বিশ্বাস করি, সমাজে শূদ্রেরও একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। তারা এই চলমান সমাজের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ। তারা মোটেই ফেলনা নয়। আমার ভয় প্রতিলোমজদের নিয়ে। প্রতিলোমজ যে বর্ণসাংকর্যেই হোক, সে সমাজের, জাতির এবং রাষ্ট্রের ভয়াবহ শত্রু। একজন প্রতিলোমজ যে কী ভাবে ব্যাপক সর্বনাশ করতে পারে, তা চিন্তা করলেও গা শিউরে ওঠে।

তিনি আরও বললেন, আর্যদের বর্ণাশ্রম ভিত্তিক সমাজে কেউ বেকার থাকতো না। সকলেই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যানুযায়ী কর্মে রত থেকে জীবিকার্জন করতো। কেউ কারও জীবিকা হরণ করতো না। সে সুযোগই ছিল না। বর্ণগুলির মধ্যে ছিল পারস্পরিক সহযোগিতা এবং আন্তরিক সৌহার্দ্য। আর এই প্রীতি-পরিবেশে সমগ্র সমাজ তথা জাতিটাকে ধরে রাখতো একজন ব্রহ্মদর্শী ঋষির প্রতি অনুগত্য। তিনিই জাতির গুরু বলে স্বীকৃত হতেন। আর সমাজের যাতে পতন না হয়, সেই উদ্দেশ্যে প্রতিলোম বিবাহকে ঘটতে দেওয়াই হতো না— প্রতিলোম বিবাহের সম্ভাবনাই প্রতিরোধ করা হতো। বলা চলে, সেই রকম বিধ্বংসী চিন্তাধারাই কারও মগজে আসতো না। বরং অনুলোমক্রমে অসবর্ণ বিবাহ ঘটিয়ে বৈজ্ঞানিকভাবেই মনুষ্য সমাজের আভ্যন্তরীণ উন্নতি ঘটানো হতো, সমাজক্ষেত্রে এই রকম কড়া বিধান মানুষের মস্তিষ্কে গ্রথিত হয়েই থাকতো। তাই, সমাজ ছিল অত নিটোল এবং ক্রমোন্নতিশীল।

আজ হয়েছে তার, উলটো। আজকাল বড়কে ছোট করে সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হচ্ছে। ছোটকে তার বৈশিষ্ট্যানুযায়ী বড় করে তোলার মধ্যেই যে সাম্যের বীজ লুকিয়ে আছে, সেটা আর কেউ বুঝতে চায় না। অনুলোমক্রমে অসবর্ণ-বিবাহের মাধ্যমেই যে মনুষ্যজাতির স্তরোন্নয়ন ঘটে এসেছে প্রত্যেকটি ঋষিযুগে, সে-চিন্তাই মাথা থেকে মুছে যেতে বসেছে। আজকের শ্লোগান হয়েছে, কোদাল মেরে সব সমান করো—কেউ বড় হয়ো না, ঘাসের উচ্চতায় বেঁচে থেকে সবাই সমান হয়ে যাও।

১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষপ্রান্ত। শীত তখন প্রায় অবসান হতে চলেছে। প্রকৃতিতে আভাসিত হচ্ছে একটা পালাবদলের আয়োজন। এমনি এক সকালে ঠাকুর বড়াল বাংলোর আমতলায় বসে আছেন একখানা ইজি চেয়ারে। চতুর্দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে প্রকৃতি রাজ্যের সাজবদল নিরীক্ষণ করছেন। অন্য কিছু ভক্তের সঙ্গে পাঞ্জাবের বেয়াস সৎসঙ্গ থেকে আগত এক সৎসঙ্গীও আছেন। তাঁর পদবী ভাণ্ডারী। আগত ভাণ্ডারী মশাইকে ঠাকুর সম্মান দিয়ে কাছে একটি বেঞ্চিতে বসিয়েছেন। কথাপ্রসঙ্গে বেয়াসের ভাণ্ডারী মশাই বললেন, তাঁর গুরুদেবের শরীর ভালো নেই। কিন্তু অসুবিধার কথা হচ্ছে, তিনি ওষুধপত্র খেতে চান না। ওষুধ খাওয়ার কথা বললে বলেন, পরমপিতার দয়ায় সেরে যাবে—যা-কিছু ঘটে তাঁর ইচ্ছাতেই ঘটে।

ঠাকুর বললেন, তা তো বটেই। তাঁর ইচ্ছার বাইরে কিছুই হয় না। তবে, সবকিছুই ঘটে আমাদের কর্মের ফল হিসেবে। আমরা ভালো কাজ করে ভালো ফল পাই, মন্দ কাজ করে মন্দ ফল পাই। এই নিয়ম ধরেই ভালো-মন্দ আসে আমাদের জীবনে। যারা তাঁর পথ ধরে যতখানি অগ্রসর হয়, তারা ততখানি তাঁর আশীর্বাদ পাওয়ার অধিকারী হয়। আসলে, তিনি সবার পক্ষেই একরকম। যে তাঁর আশীর্বাদ যতটা কুড়িয়ে নিতে পারে, সে ততটাই মঙ্গলের অধিকারী হয়। নিজের দিক থেকে তিনি ভালো লোকের পক্ষেও যা, খারাপ লোকের পক্ষেও তা'ই। তাঁর বিচারে কোন পক্ষপাত নেই। তাঁর কাছ থেকে বিধান সংগ্রহ করো, সেই মতো কর্ম করো এবং তদনুপাতিক ফল লাভ করে ধন্য হও। তিনি আমাদের ভালোবাসা দিয়েই চলেছেন—সমানভাবে, সকলের ক্ষেত্রেই। আমরা যত গভীর ভাবে তাঁকে ভালোবাসবো, তত তাঁর কথামতো চলতে পারবো এবং তার সুফলপ্রাপ্ত হয়ে জীবন ধন্য করতে পারবো। এইটাই হচ্ছে সাফল্যের মরকোচ অর্থাৎ চাবিকাঠি।

কথাপ্রসঙ্গে আরও বললেন, দুর্ভাগ্যক্রমে দেশতো ভাগ হয়ে গেল। যা ক্ষতি হবার তা তো হয়েই গেল। বহু ছিন্নমূল পরিবার এখন এদিকে এসে বেঁচেবর্তে থাকতে চায়। তাদের সকলের দিকে আমাদের লক্ষ্য থাকা চাই। সকলে মিলেমিশে যাতে আবার একটা সহমর্মিতাপূর্ণ সামাজিক পরিকাঠামো গড়ে তুলতে পারে, সেদিকে আমাদের নজর রাখা লাগে। এই ব্যাপারে অন্তর দিয়ে সাহায্য করাও সৎসঙ্গের কর্তব্য। একজন সৎসঙ্গী মনে প্রাণে আর একজন সৎসঙ্গীর পাশে দাঁড়ালেই এই অভাব-অনটনের মধ্যেও তা সম্ভব। সপ্রেম সেবা দিয়ে জনগণের কাছ থেকেও সেই সহমর্মিতা লাভ করা যায়।

কথাপ্রসঙ্গে নামধ্যানের প্রসঙ্গ উঠলো।

ঠাকুর বললেন, ঐ নামই হলো চরাচর বিশ্বের প্রতিটি সত্তার মূল ভিত্তি। নামকে জানা মানেই আত্মজ্ঞান লাভ করা। নামই পরমব্রহ্ম। নামকে জানাই ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া। আত্মজ্ঞ হওয়াও তাই। বললেন, পুরুষোত্তমই নামের প্রতীক পুরুষ। তিনিই পরমপিতা। তিনি যখন করুণাপরবশ হয়ে লোকত্রাণের জন্যে নরদেহ নিয়ে আসেন, তখন তাঁকে দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে অনুসরণ করে চললে অন্তরে সহজেই নাম জাগ্রত হয়। তখন আত্মার গতি দয়ালধামের দিকে অবাধ হয়, স্বাভাবিকভাবেই। তাই চাই নামী-পুরুষ—যুগপুরুষোত্তমকে। তিনিই পরমপিতার ব্যক্তরূপ—বিশ্বনাথ। যে-ব্যক্তি অনুরাগবশতঃ তাঁর প্রতি যতখানি আত্মসমর্পিত, সে-ব্যক্তি জনগণের কাছে ততখানি আদরণীয়, ততখানি অনুরাগ ও অনুসরণের যোগ্য।

বললেন, 'মানুষের একমাত্র প্রাপ্তব্য হলেন ঈশ্বর। ঈশ্বর লাভের জন্যই মানুষের দেহধারণ। আর যুগ-পুরুষোত্তমই হলেন রক্তমাংসসংকুল আমান ঈশ্বর।'

নাম ও নামীর সঙ্গে প্রতিটি সত্তার সম্বন্ধ নিত্য ও অবিচ্ছেদ্য।

বলে দিলেন, 'মনে রেখো, যাঁর সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ নিত্য নয় এবং যিনি চরম-ধামের মালিক নন, তাঁর ধ্যানে মানুষ নিত্য ও চরমধামে উপনীত হতে পারে না। ধ্যেয় ব্যক্তি যদি নামের প্রমূর্ত প্রতীক না হন, তবে শেষ-গন্তব্য নামধামে যাওয়া যায় না।'

একদিন স্বস্ত্যর্ঘ্যঋত্বিক ভারত পরিব্রাজক সুশীল বসু-মশাইয়ের কাছ থেকে আগ্রার সৎসঙ্গ সম্পর্কে তথ্যাদি শ্রবণ করে মন্তব্য করলেন, 'সবই ঠিক আছে, কিন্তু পূর্বতন অবতার বা লোকত্রাতাদের সম্বন্ধে ওঁদের যে ধারণা বলে শুনছি, সেই

ধারণা পোষণ করা, সঙ্গত নয়—আমার সঙ্গে মেলে না। আর্যকৃষ্টির মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা আছে। প্রথম কথা, ঋষিপারম্পর্য অস্বীকার করা যায় না। এই পারম্পর্য বা পরস্পর-পরিপূরকতা না মানলে সেই ধারাবাহিকতাকে আর মানা যায় না। আর্যকৃষ্টির এই একটা—বড় ব্যাপার— বড় বৈশিষ্ট্য।

ঠাকুর এই প্রসঙ্গে তাঁর নিজস্ব শেষ কথাটা এইভাবে প্রকাশ করে বললেন, 'নামী পুরুষই সকল যুগে সকল মুক্তিকামী মানুষের একমাত্র ধ্যেয় এবং সেই দেহধারী নামাত্মক যুগপুরুষকে ইষ্টরূপে গ্রহণ করে সর্বমনপ্রাণে তাঁর ইচ্ছাকে পূরণ করে চলাই জীবনের সকল ক্ষেত্রে সর্বাত্মক সাফল্য লাভ এবং পরিশেষে পরমধামে পৌঁছানোর একমাত্র পথ। আর্যকৃষ্টি এ ছাড়া অন্য কোন রাস্তাকে স্বীকৃতি দেয়নি।'

একদিন ভক্তদের লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমরা হলে মানুষ চরানোর রাখাল। মানুষকে ভালোবেসে আপন বৈশিষ্ট্যে জাগ্রত করে সেই ধাম-অভিমুখী করে তোলো।'

যীশু বলেছিলেন, 'তোমরা এখন মাছ ধরা জেলে, আমি এসেছি তোমাদের মানুষ-ধরা জেলেতে রূপান্তরিত করতে। মানুষকে দীক্ষিত করে করে পরমপিতার চরণমুখী করে তোলাই হবে তোমাদের কাজ।'

ঠাকুর বলে চললেন, 'দেশভাগ হয়ে যে ক্ষতি হবার তা তো হয়েই গেল। এখনও যেটুকু জমি পায়ের নিচে পাওয়া গেছে, তার উপরে দাঁড়িয়ে বান্ধববন্ধনে সকলকে কাছে টেনে একাত্ম হয়ে চলতে চেষ্টা করো। এছাড়া আর বাঁচার রাস্তা নেই। সকলের কানে শুধু ভাষণ না দিয়ে সবাইকে পরমপিতার রস্তায় এককাট্টা করে তোলো।'

'মনে রেখো, রেষারেষি মানেই শক্তিক্ষয়। আমরা অজ্ঞতার বশে অনেক শক্তিক্ষয় করেছি। আর নয়, এবার ইষ্টের পতাকাতলে সকলে সমবেত হও, ভালোবাসা আর পারম্পরিকতায় সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে ইষ্টপথে চ'লে দেশ ও জাতির বলবর্ধন করাই হোক আমাদের ব্রত। তবে এর মধ্যেই কিছুটা সাফল্য অর্জন করতে পারবো।'

বললেন, 'শাশ্বত আদর্শ ও নীতিকে বিসর্জন দিয়ে একটা গোঁজামিলের মিল সৃষ্টি করায় কোন সুফল আসে না। প্যাক্ট বা চুক্তি করে শান্তি আনা যায় না। শান্তি ও সংহতি আসে এক আদর্শে ঐক্যবদ্ধ হয়ে চলার পথে। অন্য রাস্তা নেই।'

মুক্তিসংগ্রামী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকেও এই কথা বুঝিয়ে ছিলেন নানাভাবে। কিন্তু দেশবন্ধু যে পথে অনেকদূর এগিয়ে ছিলেন, সেই জোড়া-তালির রাস্তা ছেড়ে অভিন্ন ইষ্টপুরুষ-পরিপূরণের রাস্তায় সবাইকে নিয়ে চলার আর সময় পেলেন না। তাঁর উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হলো না।

নিজের, দেশের এবং দশের উন্নতি করতে হলে সবার আগে চাই ঐ ইষ্টপুরুষে কেন্দ্রায়িত হয়ে চলা এবং পরিবেশকেও সেই পথে আকর্ষণ করা।

কথাপ্রসঙ্গে একদিন দেশসেবক নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বললেন, 'ভারতের উপরে বিপদ আসতে পারে। এ ব্যাপারে সজাগ থাকা লাগে। আমি যা-যা কইছি, সে-সব তো হুবহু ঘটে গেল। তাই মনে হয়, এখন যা-যা কই, সে-সবও ঘটতে পারে। আমি যেমন দেখতে পাই, তেমনই তো বলি। তাই, মনে হয়, আগামী দিনের চেহারা যেমন দেখতে পাচ্ছি, তার মোকাবিলার জন্যে এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হয়। বিপদ এসে গেলে আর বিশেষ কিছু করার থাকে না।'

॥ আট ॥

আশ্রমে এসেছেন এন.সি. চ্যাটার্জী অর্থাৎ নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-মশাই। তাঁকে যত্ন করে বসানো হয়েছে। তিনখানা বেঞ্চ পাশাপাশি রেখে তার উপরে একটা বিছানামতো পাতা হয়েছে। ঠাকুরের অনুরোধে তিনি সেখানেই উপবেশন করেছেন।

ঠাকুর কথায় কথায় চট্টোপাধ্যায়মশাইকে বললেন, 'জাতির যে অবক্ষয় ঘটেছে এবং যা ঘটে চলেছে, তার একমাত্র দাওয়াই হলো প্রজনন-পরিশুদ্ধি। সুবিবাহই সুপ্রজননের প্রথম সোপান। ঘরে ঘরে ভালো সন্তানের জন্ম হলে তবেই তো একটা মজবুত ধর্মনিষ্ঠ জাতি পেতে পারেন। সেই জন্যেই আমি এত করে সুবিবাহ এবং সুপ্রজননের উপরে জোর দিই। বিবাহ এবং প্রজনন একটা বিধিনির্ভর বৈজ্ঞানিক ব্যাপার— এর মধ্যে গলদ ঢুকলে ফল ভয়াবহ হতে বাধ্য। অবৈজ্ঞানিক প্রতিলোমবিবাহের ফলেই আজ দেশে রাষ্ট্রদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক জাতকের জন্ম হয়ে চলেছে। ভালো এবং সব দিক দিয়ে সুস্থ মানুষের জন্মই আজকাল কম হচ্ছে। তাই পরস্পরের ভিতরকার শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতি কমে-কমে কোথায় এসে ঠেকেছে, তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। ছাত্র এবং শিক্ষকের মধ্যেকার সম্পর্কটার দিকেই একটু তাকিয়ে দেখুন না—আগেকার সে-দিন কি আছে?'

বিজ্ঞানমতে মঙ্গলকর বিবাহ-প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন, প্রকৃতি-জগতে অনুলোম যৌন সম্পর্কটা কিন্তু স্বাভাবিক। মানুষরা নিজেরা বুদ্ধি করে তার উল্টো কাজটা করে বসে। জীবন-ধারার পক্ষে সেটা বিপরীত—স্বাভাবিক মোটেই নয়। কারণ, প্রকৃতি চায় আমাদের বাঁচা ও বাড়ার অন্তর আকুতিকে সহায়তা করতে। জৈব এবং অযৌগ উভয়বিধ প্রকৃতি জগতেই কিন্তু তাই তদ্বিরোধী যৌন মিলন লক্ষ্য করা যায় না। মানুষ তো বুদ্ধিধর জীব, সে কুবুদ্ধির কবলে পড়ে সেই নিয়ম ভঙ্গ করে সংসারে, সমাজে এবং রাষ্ট্রের মধ্যে বিদ্রোহী সন্তানের সৃষ্টি করে। পতন এবং ধ্বংসটা আসে এই ভাবে।

আশ্রমে থাকাকালে একদিন কথাপ্রসঙ্গে চট্টোপাধ্যায় মশাই বললেন, 'স্বাধীনতা-সম্বন্ধে আপনার কথা আমার খুব ভালো লাগে। কিন্তু সাধারণ মানুষ বোঝে উলটো।'

ঠাকুর তার জবাবে বললেন, 'স্বাধীনতা কথাটাই তো কেমন গোলমেলে গোছের। স্বাধীনতার মানে যদি অন্য-নিরপেক্ষতা হয়, তবে সে তো মহা অবাস্তবতার ব্যাপার। অন্যের উপর নির্ভর না ক'রে মানুষের বাঁচার রাস্তা কোথায়? প্রাণী-জগতের সবাই সমাজবদ্ধ হয়েই বাস করে। মানুষ সব থেকে বেশি সমাজবদ্ধ জীব। তার জীবন অর্থাৎ বাঁচাটাই যৌথ প্রচেষ্টা ও সহযোগিতার ফল। এই প্রয়াস ও সহযোগিতা আরও আন্তরিক এবং ব্যাপক হলে মানব-জীবনের সামগ্রিক বৃদ্ধি অবাধ হয়ে ওঠে। তার নীট ফল হলো মনুষ্যজাতির উদ্বর্ধন।'

চ্যাটার্জীমশাইয়ের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে হিন্দুত্বের কথা উঠলো। ঠাকুর বললেন, 'হিন্দুদের অত্যন্ত প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্য দিয়ে জীবন কাটাতে হয়েছে। অস্তিত্বকে বজায় রাখার জন্যে তাদের অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। এই সংগ্রামের ধারাকে বজায় রাখার জন্যে তাদের একজন নেতা বা পরিচালককে খুঁজতে হয়েছে। এই থেকে তারা একজন গুরুকে মেনে চলার সংস্কার লাভ করেছে। এইভাবে আর্য-হিন্দুদের মধ্যে ঋষিকে ধরে চলার অভ্যাস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই, দেখতে পাওয়া যায়, আর্য-হিন্দুদের রক্তধারার মধ্যেই নেতা বা গুরুর প্রতি আনুগত্য, অসৎনিরোধী সংগ্রামের মানসিকতা সত্তার সঙ্গে একেবারে গাঁথা হয়ে আছে।'

আরও বলেছেন, 'সাধনার ভিতর দিয়ে যে-কোন বর্ণের মানুষই এক জীবনেই ব্রাহ্মণ হতে পারে অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পারে।'

'তবে, বর্ণ হিসেবে বিপ্রত্বে উন্নীত হতে গেলে কোন বর্ণের পাঁচ পুরুষ, কোন বর্ণের সাত পুরুষ আবার কোন বর্ণের বা নিচ্ছেদ ভাবে পরপর চৌদ্দ পুরুষ ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করতে হয়। এটা ব্রাহ্মণত্ব অর্জন এবং নির্ভঙ্গ ভাবে বংশধারার মধ্যে তা ধরে রাখার ব্যাপার। তখন সেই বংশের লোকেরা হয় 'অধিকারী বামুন'। এই ভাবে এটা বংশানুক্রমে অর্জন করে স্থায়ী করে নিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে সাধনা করে চললে একটা জাতির সকল বর্ণের মানুষই একদিন বংশগতভাবে ব্রাহ্মণ হয়ে উঠে জাতি-পরিচয়ে 'বিপ্র' হয়ে উঠতে পারে। জ্ঞানোন্মেষ ও বংশগত উন্নয়নের পদ্ধতিই হলো এই। সবই ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যের উপরে দাঁড়িয়ে করতে হয়। ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য তাই সবার আগে বিচার্য। এক দাঁড়িতে এক বাটখারায় সব মানুষকে মাপা যায় না। যার বৈশিষ্ট্যে যে-রাস্তা সহজ হয়, তাকে সেই রাস্তাতেই চালাতে হয়। সামাজিকভাবে এবং জাতিগতভাবে এই ভাবেই মানুষ বেড়ে-বেড়ে স্থায়ীভাবে ব্রাহ্মণত্বের লাইনে থেকে বিপ্রজাতিতে পরিণত হয়। সবটাই ধারাবাহিকভাবে অনুশীলন এবং বংশানুক্রমিক ভাবে ধরে রাখার ব্যাপার।

কথাপ্রসঙ্গে আরও যোগ করে বলেছেন– 'প্রকৃত বামুনরাই হলেন সমাজের স্বাভাবিক প্রতিনিধি। প্রকৃত বামুনের ধাতই হলো, সকল বৈশিষ্ট্যের সকল লোকেরই বৈশিষ্ট্যকে সম্মান দেওয়া ও তার বিবর্ধনের পথে সহায়তা করা। আর তিনি নিজের কোন স্বার্থপূরণের জন্য এটা করেন না। জনস্বার্থই তাঁর স্বার্থ। এটা তাঁর ব্রাহ্মণসুলভ ধাতের স্বভাব।'

একজনের কথার উত্তরে ঠাকুর বলেছেন, শুধু সমজ্ঞান লাভই যথেষ্ট নয়। সকল মানুষ তো সমান নয়। এক-একজন মানুষের বৈশিষ্ট্যই তো এক-একরকম। জগৎটাই যে বহু ব্যক্তিত্বের বহু কিছু প্রাকৃতিক বস্তুর অসম গঠন এবং আচার নিয়ে গড়া, সেটা আগে বুঝে নিতে হবে। উন্নতিটা যার-যার বৈশিষ্ট্যের পথে আসবে। সমদৃষ্টি এবং সমাচরণ বলে কোন কথা হয় না। কোন মানুষকে বড় করতে হলে, তার শির-দাঁড়ার উপরে দাঁড় করিয়েই তাকে বড় করতে হবে।

তাই, ঠাকুর ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যপালী পূরণ মানসিকতার উপরে বড় জোর দিয়েছেন। তা না করে সবকিছুকে নিয়ে খিঁচুড়ি করে ফেলে সে খিচুঁড়িতে মানুষ গোষ্ঠীর উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। অথচ, এই প্রবণতাই আজ দেশ এবং রাষ্ট্রনায়কদের মানসিকতাকে পেয়ে বসেছে।

অনেক মানুষের ধারণা, সব মানুষকে এক ধরণের করতে হবে, নইলে ঐক্য হবে না—সাম্য আসবে না।

ঠাকুরের মন্তব্য— বৈচিত্র্য থাকবেই। সংসারের কোন দু'টি বস্তুই এক নয়। একটু রসিকতার ঢঙেই বলেছেন, সবাই যদি এক রকম হয়ে যেতো, তাহলে তো কেউ কাউকেই চিনতেই পারতো না।

সব কথা শুনে 'চট্টোপাধ্যায়মশাই বলতে বাধ্য হলেন, 'যেখানে বর্ণাশ্রমধর্ম অটুট ছিল, সেখানে হিন্দুরা বিজাতীয় প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে খুব কমই।' বিজ্ঞানভিত্তিক অনুলোম বিবাহ ও তার ফলে যে সুপ্রজনন, তাই সমাজকে ক্রমোন্নত করে একটা পরিশুদ্ধ জাতিতে পরিণত করে। আর্য হিন্দুজাতির এই ছিল গোড়ার কথা। এ জন্য তারা সর্বদাই একজন জাতীয় ইষ্টগুরুকে স্বীকৃতি দিয়ে এসেছে। হিন্দুদের এই সুপ্রজনন–বুদ্ধি এবং বৈশিষ্ট্যভিত্তিক বর্ণগত উন্নয়ন-পরিকল্পনাই তাদের জাতি হিসেবে উন্নত এবং বিশিষ্ট হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে।

একদিন ঠাকুর বড়াল বাংলোর হাতায় জামতলায় এসে চেয়ারে বসেছেন। সময় তখন অপরাহ্ন। প্রকৃতির চতুর্দিক তাকিয়ে দেখে দেখে তার বহুরৈখিক লাবণ্য আস্বাদন করছেন। নিকটে থেকে কিছু আশ্রমবাসী ভক্ত এবং বহিরাগত দর্শনার্থী সেই দৃশ্য উপভোগ করছেন। এমন সময়ে ঠাকুর হঠাৎ নিজের মনেই বলে উঠলেন, 'মানুষ সাধারণত মনে করে, যে ভালো-ভালো কথা বলতে পারে এবং বেশ উপর-পালিশ, সে-ই বুঝি জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান। কিন্তু তার ঐ বলা এবং চলার মধ্যে মিল আছে কি না, তাই দেখে তার মূল্যায়ন করতে হবে। ও সব বাহির পালিশের কোন দাম নেই।'

একদিন গলরোগের নামকরা চিকিৎসক ডঃ এস, কে, নাগচৌধুরী ঠাকুরের কাছে এসেছেন। তাঁর দেওঘরের উপকণ্ঠে নিরিবিলি অঞ্চলে অস্থায়ী ভাবে বসবাসের বাড়ি আছে। মাঝেমধ্যে সেইখানে থাকেন। অনেক বিশিষ্ট মানুষই এই রকম দেওঘরের উপকণ্ঠে নিজস্ব বাড়ি করেছেন—জনবহুল কলকাতা শহর থেকে একটু সরে এসে পবিত্র জলবাতাসের জায়গায় কিছুদিন থেকে একটু চাঙ্গা হয়ে ওঠার উদ্দেশ্য। এঁরাও এক ধরণের নিয়মিত চেঞ্জার। এঁদের মধ্যে অনেকেই নিরিবিলি রোহিণী রোডের ধারে বড়াল বাংলোয় এসে ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন— নানারকম কূটতত্ত্ব ও সন্দেহের নিরসন ঘটানোর জন্যে কাছে বসে আলোচনা করেন। ঠাকুরেরও এই সব বুদ্ধিমান জিজ্ঞাসুদের প্রশ্নের উত্তর দিতে ভালোই লাগে। তাঁর আগমন তো মানুষের প্রশ্ন নিরসনের জন্যই। চলার পক্ষে সকল কপাট খোলার জন্য সঠিক চাবিকাঠি মানুষের হাতে তুলে দেবার জন্যই তো তাঁর মর্ত্যাবতরণ।

॥ নয় ॥

কুষ্টিয়া থেকে সদাকর্মী ননীগোপাল সরকার এসেছেন দেওঘর-আশ্রমে। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন হিমাইতপুরের তোয়েব হোসেনকে।

ঠাকুর তোয়েব ও ননী সরকারকে আদর করে বসালেন, বসিয়ে ননী সরকারকে বললেন, 'তুমি তো পুরণো মানুষ, দেখো—তোয়েবের যেন কোন অসুবিধে না হয়।'

ওদের বসিয়েই বললেন, 'মানুষের ঈশ্বর একজনই। প্রেরিত মানেই ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তাঁদের সকলের কথাই এক। এক উদ্দেশ্যেই ওঁরা আসেন। ধর্মপ্রাণ মানুষ যে-সম্প্রদায়ভুক্তই হোক না কেন, তারা ঈশ্বর এবং তাঁর প্রেরিত পুরুষদের অনুমোদিত পথে চলে।'

আরও বললেন, 'হিন্দু যদি প্রকৃত হিন্দু হয় এবং মুসলমান যদি প্রকৃত মুসলমান হয়, তবে তাদের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে না। ধর্মপ্রাণ হিন্দু এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের চলার পথ একটাই। সে পথ ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষদের প্রদর্শিত পথ।'

'দুজন প্রেরিত পুরুষের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। তাঁরা পরস্পরের স্বার্থকে পূরণ করে চলেন। তিনি যে-মতাবলম্বীর প্রতিনিধিই হোন না কেন।'

আরও একটি বিপ্লবাত্মক কথা বললেন এই প্রসঙ্গে। বললেন, 'আমি হিন্দু নাম নিয়ে হিন্দু পরিচয়েই ইসলামের বিধিগুলি যদি পালন করে চলি, তাতে কি কারও আপত্তি থাকতে পারে? কোন কোন তরফ থেকে হয়তো বলা হবে, আমি কেন মোল্লার কাছে কলমা পড়ে মুসলমান হচ্ছি না— কেন আরবী ভাষায় ঈশ্বরের স্তুতিপাঠ করছি না? আমি ভারত ভূমির একজন হিন্দু-সন্তান থেকেই পিতা-পিতামহের পরিচয় বজায় রেখে এবং ভারতীয় ভাষায় কেন আল্লাতালার অর্থাৎ ঈশ্বরের স্তুতি করতে পারবো না? আল্লাকে ও তাঁর নবী অর্থাৎ প্রেরিতকে মানলে আমার জাত ত্যাগ করতে হবে কেন? আমার গোত্র বংশ সব ভুলে নতুন নাম ও পদবী নিয়ে নতুনভাবে পরিচিত হতে হবে কেন? খোদাতালা এবং তাঁর পয়গম্বরদের মানতে চাইলে আমার অনুকূল চক্রবর্তী নাম পরিত্যাগ করে অন্য নাম নিতে হবে কেন?'

আর সকল মতের সমতা স্বীকার করে নিলে সব মতাবলম্বীরা যদি কোন ব্যক্তিকে নিয়ে নিজের দলে ঢুকিয়ে নিবার জন্যে টানাটানি করে, তবে লোকটার অবস্থা হবে কেমন? তাকে তো আর অখণ্ড রাখাই যাবে না, টুকরো টুকরো করে এক এক অংশ এক এক মতের মধ্যে ফেলতে হবে। সব অবাস্তব কথা।

'পরম পুরুষের পথে চলতে গিয়ে আমি হিন্দু থাকতে পারবো না কেন? আমার পিতৃপুরুষের পরিচয় খোয়াতে হবে কেন?'

আরও বললেন, 'আমার এই সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ ইত্যাদি সকল মতাবলম্বীরই প্রতিষ্ঠান। এখানে এসে তারা নিজ নিজ ধর্মমতে অবিচল থেকেই তাদের মধ্যেকার ঐক্যটা বুঝতে শিখবে এবং বাঁচা ও বাড়ার একটা পথই সংঘবদ্ধভাবে মেনে চলবে। তাতেই তো সকল মতবিরোধ ঘুচবে এবং মানুষ ঐক্যের পথ খুঁজে পাবে।'

এক ভক্ত জিজ্ঞেস করলেন, 'খৃষ্টানদের মধ্যেও কি আদিনাম বা বীজনাম-সাধনার কথা আছে?'

'হ্যাঁ- খুবই ছিল। বাইবেলেই আছে–আদিতে বাক্ ছিলেন, বাক্ ঈশ্বরের কাছে ছিলেন এবং ঐ বাক্ই হলেন ঈশ্বর।' তাই ঈশ্বর-সাধনা করতে গেলে আদিধ্বনি বা বীজনামের কথা এসে পড়ে।

আবার বলা আছে, নাম ও নামী এক। পশ্চিম ভারতের সৎসঙ্গ দরবার থেকে সৎসঙ্গের প্রখ্যাত দ্বিতীয়গুরু শ্রীশ্রীহুজুরমহারাজ তাঁর বহু পরিচিত বাণীগ্রন্থে পরিষ্কার জানিয়েছেন— আদি নাম এবং পরমপুরুষ মূলতঃ অভিন্ন। ভক্তিবাদ প্রসঙ্গে বলেছেন, পরমপুরুষকে বাদ দিয়ে কিন্তু নাম-সাধনা করা যায় না। ধর্মাচরণের পথে প্রথম কথাই হলো, আদিপুরুষে বিশ্বাস স্থাপন করে আদি ধ্বনির ভজন করা। ভক্তি-মার্গ বাদ দিয়ে যন্ত্রের মতো নামোচ্চারণ করে চললে মুক্তি আসতে পারে না। আর মুক্তি কথার মানেই করেছেন পরমধামে শেষ গতি হওয়া। পরমপুরুষকে তাঁরা বলেছেন– পরমপিতা। নামধামে আদিধ্বনি ও পরমপিতার উপস্থিতি সম্পর্কে হুজুর মহারাজের চিত্রকল্প বর্ণনাটি কেমন মনোরম। বলেছেন, সেই পরমধামে স্বর্ণসিংহাসনে উপবিষ্ট পরমপিতা— তাঁর চরণযুগল থেকে বিনিসৃত হচ্ছে আদিধ্বনি— এই চিত্রের মধ্য দিয়ে বুঝে দেখা দরকার, নামরূপী নামীকে কত উচ্চস্থানে স্থাপিত করা হয়। ঐ নামরূপী আকার বিশিষ্ট পরমপিতাকে ভালোবেসে নামধামে গত হওয়ার প্রয়াসের কথা বলা হয়েছে সন্ত-নীতিতে। আগে সর্ববীজাত্মক নামস্রষ্টা পরমপিতার প্রতি ভক্তি ও প্রেমের চর্চা করে তাঁর সাকার নরবিগ্রহের স্মরণ নিয়ে গুরুগত হয়ে সাধন-ভজন করলে তবে ফলোদয়ের আশা করা যায়।

একবারে খড়্গ'র মতো ধারালো সোজা কথা। ভক্তি এবং গুরুবাদকে বাদ দিয়ে আদি ধ্বনির সাধন করে কোনই ফল লাভ করা যায় না। সন্তমত তাই মূলতঃ গুরুভক্তি ও গুরু-করুণার কথাই প্রচার করেছে। সকল মতের ধর্মচর্চার মূল কথা এইটাই। নরদেহধারী জীবন্ত নামরূপী ইষ্টপুরুষকে গ্রহণ করো— তাকে ভালোবেসে তাঁর আদেশপালনে তৎপর হও—নাম তোমার কাছে আপনিই ধরা দেবেন এবং তুমি দয়ালধামের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবে।

॥ দশ ॥

একদিন নির্মল চট্টোপাধ্যায়মশাই কথাচ্ছলে বললেন, বিলেত যাবার সময় স্যার আশুতোষকে যখন প্রণাম করতে যাই, তখন তিনি আমাকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, 'দ্যাখো, বিলেত গিয়ে আমার নাম রাখা চাই। পরীক্ষায় তোমাকে ফার্স্ট হতে হবে। আমারও বিশ্বাস ছিল, সব পরীক্ষায় ফার্স্ট হতে পারবোই। কিন্তু পরীক্ষার সময়ে আমি বেশ ভালো রকম অসুস্থ হয়ে পড়লাম। একটা পেপারে পরীক্ষা দিতে সে আমি প্রায় অচৈতন্যই হয়ে গেলাম। সেই অবস্থাতেই লিখে চললাম। মজার কথা ঐ অর্ধচেতন দশায় লিখেও ঐ বিষয়ে আমি সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিলাম। আবার পরীক্ষার ফল বেরোবার আগেই পরীক্ষার ফল সম্বন্ধে আগাম সব বুঝতে পেরেছিলাম। এটাই বা হলো কেমন করে?

উত্তরে ঠাকুর বললেন, 'বৃত্তি বলে একটা প্রকৃতিগত ব্যাপার আছে। এই শরীরটা ঐ বৃত্তিকেই বহন করে। আবার, এই শরীরের কোষ সমূহেরও একটি অতি সূক্ষ্ম অবস্থা আছে। মৃত্যুর পরেও সেই অতিসূক্ষ্ম কোষগুলি অবিকৃতই থাকে। সেই কোষসমন্বিত দেহকে বলে চিন্ময় দেহ বা ভাব দেহ। বৃত্তিগুলি সেখানেও ঘুমন্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। আর সেই সমস্ত নিয়েই মানুষ পর জন্মের দেহ ধারণ করে। তাই মানুষ পরবর্তী দেহলাভ করে পূর্বেকার সংস্কারবশেই কাজ করে থাকে।'

বলেছেন, 'মৃত্যুর সময়ে প্রথমে গভীর অন্ধকার তারপরে চোখধাঁধানো আলো। তারপর শোনা যায় প্রচণ্ড ঢংঢং আওয়াজ। ঐ শব্দের ধাক্কাতেই স্মৃতিধারা ছিন্ন হয়ে যায়। এক ইষ্টের উপরে অতিগভীর টান থাকলে স্মৃতিধারা অবিচ্ছিন্নই থাকে। এই বাস্তব জীবনেও যে পরিস্থিতির প্রতিকূল আঘাতসমূহকে যে বেশি সয়ে নিয়ে ইষ্টপথে চলতে পারে, তার স্মৃতি-চেতনা লাভের সম্ভাবনাও তত বেশি থাকে।'

কথাপ্রসঙ্গে চট্টোপাধ্যায়মশাই বললেন, 'আমার মনে হয়, দ্বৈতকে বাদ দিয়ে অদ্বৈতে পৌঁছানো মুশকিল।'

ঠাকুর বললেন, 'খুব ঠিক কথা। রামকৃষ্ণদেবও তাই বলতেন। দ্বৈতবাদে ভক্তিরস আছে। ওতে প্রেম ও গুরুভক্তির চর্চা হয়। আর তা না হলে জীবন তো শুকনো কাঠ। আমার কিছুদিন একবার ঐ দশা হয়েছিল, আমি তো শুকিয়ে শুকিয়ে রসহীন আনন্দহীন হয়ে মরতে বসেছিলাম। আবার নিজেকে সবচেয়ে হীন ও দীন মনে করে চললেও প্রাণধারা শুকিয়ে যেতে বসে। সেও অতি ভয়ংকর। গুরু-প্রেম ও গুরু-সেবার পথেই সাম্য রক্ষিত হয়— আর সেটাই স্বাভাবিক জীবন। তার মধ্যে রস এবং আনন্দ দুইই আছে।'

বললেন, 'সব সময় ভাবতে হয়— আমি তোমার সন্তান, আমি অজর অমর, আমি তোমার চৈতন্যে সদাচেতন। তাহলেইত শক্তিতে সতেজ থাকা যায়।'

কথাপ্রসঙ্গে উদ্দীপ্ত হয়ে জোরের সঙ্গে বলে উঠলেন। 'ভক্তের জীবনই আলাদা' সে গুরু ছাড়া কিছু বোঝে না, কিছু চায় না। গুরুই তার জীবনে কীল অর্থাৎ ধারকদণ্ড। আর এইখানেই ভক্তিমার্গের সব রস। ভক্ত তাই রসিক পুরুষ— প্রেমিক পুরুষ। সব মানুষ তার আপন। দুনিয়াটা তার কাছে রসময় আনন্দের উৎস।'

'যে নিজে শুকনো, দুনিয়াটাও তার কাছে শুকনো।'

গুরুগত ভক্তের কাছে বিশ্বটাই গুরুমূর্তি। তাই সে বিশ্বের সেবক— সে বিশ্ব-প্রেমী।

জানবে, প্রেম ভক্তিরই জাতক। ভক্তি না থাকলে প্রেম অসম্ভব। আর প্রেমহীনতাই মৃত্যুর নামান্তর। সে জীবন শুকনো। তার অন্তরে ভাব নেই, নয়নে দীপ্তি নেই। চেতনার বোধশক্তি নিষ্প্রভ, অনুভূতি মৃতপ্রায়। সে অন্ধ।

শোন দীনবন্ধু-দাদার গল্প।

এক গরিব বিধবার একমাত্র বালক-পুত্র। বালকটি পাঠশালার ছাত্র। বাড়ি থেকে পাঠশালা বেশখানিকটা দূর। কিছুটা পথ গিয়ে খানিকটা বনজঙ্গলও পার হতে হয়। ছোট ছেলে, রাস্তায় তার একা যেতে ভয় করে। যে গ্রাম থেকে সে স্কুলে যায়, সেখান থেকে তার আর কোন সঙ্গী নেই। এ পল্লীর এক কোণে তার মায়ের বাস। সেখান থেকে স্কুলে যাবার আর কেউ নেই। একা স্কুলে যেতে তার

একটু ভয়ভয়ই করে। সে একদিন মাকে বলেই ফেল্লে, মা, সব সময় তো রাস্তায় লোক পাই না, তাই নির্জন রাস্তায় একলা হয়ে গেলে কেমন ভয়ভয় করে। তার ভয়ের কারণ শুনে মা বললে, 'বাছা, যখন ভয়ভয় করবে, তখন এক কাজ কোরো। তখন দীনবন্ধুদাদাকে ডেকো। দীনবন্ধুদাদা না! সব মানুষের বিপদকালে তার কাছে এসে সাহায্য করেন। তিনিও তোমাকে সঙ্গে করে বনের পথটা পার করে দেবেন। তিনি খুব দয়ালু।'

ছেলে বললে, 'সেই দীনবন্ধুদাদা কোথায় থাকে?'

'দীনবন্ধুদাদা আশপাশেই থাকেন, ডাকলেই তিনি শুনতে পান আর কাছে এসে মানুষকে সাহায্য করেন— এইটাই আমার জানা। তুমি ভয় বোধ করলেই তাঁকে ডাকবে, তিনি এসে তোমাকে জঙ্গল পার করে দেবেন। বাছা, তোমার কোন ভয় নেই।'

ছেলে শুনে খুশি হলো। জঙ্গলের কাছে এসে সঙ্গীহীন হয়ে পড়লেই সে দীনবন্ধুদাদাকে ডাকে। অমনি দীনবন্ধুদাদাও এসে বলেন, 'ভাই, তোমার ভয় করছে? এসো আমার সঙ্গে। তোমার কিছু ভয় নেই— আমি তোমাকে জঙ্গলের পথ পার করে দিচ্ছি।'

এই ভাবে বালকের স্কুলে যাতায়াত চলে। বাড়ি থেকে স্কুলে যাবার পথে বা স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে সঙ্গীহীন হয়ে পড়লে সে দীনবন্ধুকে দাদা বলে ডাকে, অমনি দীনবন্ধুদাদাও আবির্ভূত হয়ে তাকে চলার পথে সঙ্গ দিয়ে সাহায্য করেন।

এইভাবে বালকের লেখাপড়া চলে।

একদিন এক ঘটনা ঘটলো। মাস্টার মশাইয়ের বুড়ো বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। গুরু মশাইয়ের এবার পিতৃশ্রাদ্ধ করতে হবে। তাঁর তো পয়সাকড়ি নেই, বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের সাহায্যই তাঁর সম্বল। তারা বাড়ি থেকে যা আনবে, তাই তাঁর ভরসা। তাই দিয়ে গুরুমশাইয়ের পিতৃশ্রাদ্ধের পারলৌকিক ক্রিয়া এবং গ্রামবাসীদের ভোজনব্যবস্থা। তাই, যথাসময়ে গুরুমশাই তাঁর বাচ্চা ছাত্রছাত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন পিতৃশ্রাদ্ধে কে কী দিতে পারবে।

বিধবার এই ছেলেটিকেও শুধোলেন, তুই কী দিতে পারবি? বাড়ি থেকে জেনে এসে ছেলেটি বললে, মাষ্টারমশাই, ভোজের দিনে যা দই লাগবে সেটা আমি দেবো। মায়ের ভরসা ঐ দীনবন্ধুদাদা। মা জানেন, যা করার দীনবন্ধুদাদাই

করবেন। দীনবন্ধুকে ছেলেটি সব ব্যাপার বললে। শুনে দীনবন্ধুদাদা বললেন, ঠিক আছে, তুমি দইই দিও— আমি তোমাকে দই এর যোগান দেবো। কিন্তু ওমা, এ কী! কাজের দিনে দীনবন্ধুদাদা একটা ছোট ভাঁড়ে কিছুটা দই এনে ছেলেটির হাতে দিয়ে বললেন, 'এই যে তোমার মাস্টারমশাইয়ের পিতৃশ্রাদ্ধের দই! ছেলেটিও সেই দই নিয়ে মাস্টারমশাইয়ের গৃহে হাজির। সেখানে তো বহুলোক লাইনে বসেছে শ্রাদ্ধের ভোজ খেতে। তখনও দই আসেনি দেখে মাস্টারমশাই তো খুব ভাবনায় পড়েছেন। যাই হোক ছেলেটি দীনবন্ধুদাদার দই নিয়ে মাস্টারমশাইয়ের সামনে এসে দাঁড়ালো। মাস্টারমশাই তো এমনি বিরক্ত হয়ে ছিলেন, এবার দইয়ের পরিমাণ দেখে একটু ক্রোধ প্রকাশ করে বলেই ফেললেন, এই দই ক'জনের হবে রে?

ছাত্রটি বলল, 'মাষ্টার মশাই, এ দই আমার দীনবন্ধুদাদা দিয়েছেন— এই দইয়ে বহু লোকের খাওয়া হবে। বিস্মিত মাস্টারমশাই হতাশ মনে সেই দই লোকের পাতে দিতে লাগলেন। প্রথম জনের পাতে সবটাই দিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় জনের পাতের কাছে গিয়ে ইতস্তত করতেই ছাত্রটি বলে উঠলে, 'মাস্টারমশাই দিতে থাকুন, দই তো ভাঁড় ভর্তি।' অবাক্ মাস্টারমশাই সব লোকের পাতে প্রচুর পরিমাণে দই পরিবেশন করেও ভাঁড়ের দই শেষ করতে পারলেন না। বিস্ময়ে মুখের কথা হারিয়ে ছাত্রকে বললেন, 'বাছা, তোর দীনবন্ধুদাদা কেমন রে! এ দই তো কিছুতেই শেষ করতে পারলাম না। সে মানুষ নয় রে! চল আমি তাকে দেখবো!'

ছাত্রের সঙ্গে মাস্টার মশাই এসে দাঁড়ালেন সে বনের ধারে। দাঁড়িয়ে বললেন, 'ডাক তোর দীনবন্ধুদাদাকে, দেখি সে কেমন গয়লা।'

ছাত্রটি ডাক দিলে, 'দীনবন্ধুদাদা, তুমি এসো, দেখা দাও!'

অমনি দীনবন্ধুদাদা জঙ্গলের রাস্তায় এসে দর্শন দিলেন।

ছাত্রটি বললে, 'মাস্টারমশাই, এই যে, ইনিই দীনবন্ধুদাদা— এঁকে দেখুন।'

'কই রে, তোর দীনবন্ধুদাদা কই?'

'এই তো, আপনার সামনে দাঁড়িয়ে। দেখতে পাচ্ছেন না?'

'নারে, আমি কিছুই দেখছি না।' দীনাতিদীন বিধবার পুত্রের নিত্যদেখা দীনবন্ধুদাদাকে শিক্ষিত মাস্টারমশাই নানাভাবে চোখ রগড়িয়েও দেখতে পেলেন না।

জীবনে ইষ্ট চাই, হৃদয়ে ভক্তি চাই। তবেই অন্তরে বোধ আসে, নয়ন দর্শনক্ষম হয়। নতুবা, সমস্তই রসহীন মরুভূমি। অভক্ত দীনবন্ধুর দয়া বুঝতে পারে না। সে অবোধ— অন্ধ।

॥ এগারো ॥

সেদিন হলো ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের ৮ই চৈত্র রবিবার। দুপুরের আহারান্তে ঠাকুর বড়াল বাংলোর একটি ঘরে শুয়ে বিশ্রাম করছেন। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়েননি, চারদিকে নারী-পুরুষ সঙ্গলোভী লোকজন উপবিষ্ট। এটা-সেটা ঘর-গৃহস্থালির কথাবার্তার পর বর্তমান পুরুষোত্তমের প্রচার-কৌশল সম্পর্কে বললেন, বর্তমানের বার্তা জনসমাজে পৌঁছে দিতে পূর্বতনদের বাগ্‌ব্যবহারের কথাও পরিবেশন করতে হয়। কারণ, একই দ্রষ্টা-পুরুষই যুগে-যুগে আবির্ভূত হয়ে এক বার্তাই তো উপহার দিয়ে থাকেন। পূর্ববর্তীদের কার্যকলাপ ও কথাবার্তাকে বাদ দিয়ে বর্তমান দ্রষ্টা-পুরুষের কথা বলা যায় না— তা করতে গেলে কাজও ভালো হয় না। ধরো, এ-যুগের দ্রষ্টা-পুরুষের সম্বন্ধে তুমি মানুষকে বোঝাতে চাও— তাঁকে সুষ্ঠুভাবে পরিবেশন করতে চাও। তোমাকে তা হলে—তাঁর পূর্ববর্তী মহাপুরুষগণের জীবন-চরিত থেকে তথ্য পরিবেশন করে সমরসের পরিবেশ সৃষ্টি করতেই হবে। যে রকম মানুষের প্রচার করতে চাও, সেই রকম আর একটি পূর্ববর্তী মানুষের বাগাচরণের উল্লেখ করতে হয়। এতে তোমার বর্তমান প্রচার্য মহাপুরুষের কথা পরিবেশন করার পশ্চাদভূমি তৈরি হয়। এই ভাবে ইষ্ট-পরিবেশনের জমি তৈরি করতে হয়। তুল্য পুরুষদের কথা বাদ দিয়ে খাপছাড়া ভাবে খপ্ করে তোমার ইষ্টদেবের কথা বলতে গেলে মানুষ সে-কথায় আগ্রহান্বিত হয় না। সমান সমান উদাহরণ দিতে হয়।

আবার যার ধারণায় যে-ভাবে বললে বোঝা সহজ হয়, তাকে সেই ভাবে বোঝাতে হয়। সেই জন্যে সমান-সমান অন্য মহাপুরুষদের জীবনচরিত থেকে সাহায্য নিতে হয়। যেমন ধরো, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট, হজরত মহম্মদ (দাঃ), চৈতন্যদেব, শ্রীরামকৃষ্ণ— এঁদের জীবন ও বাণীর মধ্যে একটা মিল বা একতানতা আছে। ঐ সব থেকে আলোচনা করতে হয়। তবে, বর্তমান মহাপুরুষকে মানুষ সহজে ধরতে পারে। তুলনামূলক আলোচনা যাজনের পক্ষে কত সহায়ক, সেই কথাই বলতে চেয়েছেন ঠাকুর। তিনিতো নিজে তাঁর অব্যবহিত পূর্ববর্তী লোকগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে হামেশাই বলতেন। তাঁকে

বলেছেন— স্বয়ং ভগবান। এই ভাবে পূর্ববর্তীর প্রতিষ্ঠা করতেন মনপ্রাণ দিয়ে। তাতে মানুষ বর্তমান সম্বন্ধে অর্থাৎ তাঁর সম্বন্ধে বুঝে ওঠার পথ পেতো। কোন মহাপুরুষ সম্বন্ধে মানুষকে বোঝাতে হলে তাঁর সমতুল্য অন্যান্য মহাপুরুষদের কথা বললে, তাঁর কথা পরিবেশন সহজ হয়।

খবরের কাগজে পাকিস্তানের স্রষ্টা কায়েদে আজম জিন্নার একটি বিবৃতি বেরিয়েছে। তাতে বলা হয়েছে— 'আমরা এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের জান-মাল ভারতের চেয়ে বেশি নিরাপত্তা পাবে।....'

খবর শুনে ঠাকুর একটু হেসে বললেন, 'শুনতে তো বেশ ভালোই লাগছে, কিন্তু সেখানকার রাজ-কর্মচারীদের এ কথা মনে থাকলেই ভালো।'

একদিন কথা উঠলো বাঁচার সার্থকতা নিয়ে। এক ভক্ত প্রশ্ন করেছেন, পৃথিবীতে এত লোক, আমার মতো একজন সামান্য লোকের বাঁচায় লাভ কী? আমি থাকলেও যা, না থাকলেও তাই— পৃথিবী একরকমই থাকবে।

ঠাকুর বললেন, 'বাঁচাটা হলো প্রিয়পরমের জন্যে— প্রিয়পরমের স্বার্থে। বাঁচাটা যখন কারও জন্যে হয়, তখন তা অর্থান্বিত। বাঁচাটা তখন নিরর্থক নয়।'

আরও বললেন, 'বাঁচা তো প্রিয়তমের জন্যে, তাঁর কাজের জন্যে। ভালোবাসাই মানুষকে বাঁচতে বলে— ভালোবাসাই মৃত্যুর মুখ থেকে কেড়ে এনে মানুষকে আরও করে বাঁচতে শেখায়। বেঁচে থেকে ইষ্টকর্ম করাই আসল বেঁচে থাকা। যিনি জীবন দিয়েছেন, জীবনটা তাঁর কর্মে উৎসর্গ করার মধ্যেই তার সার্থকতা। এ ছাড়া অন্য অর্থে জীবনযাত্রা করা মানে পরমায়ুর অপব্যয় করা।'

'প্রায় সব মহাপুরুষের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তাঁদের জীবন যেন বিষাদময়।' কথা তুললেন ঋত্বিগাচার্য কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য।

'দেখুন, মহাপুরুষরা তো নিজেদের প্রতি নির্মম। তাঁরা তো অন্য সকলের জন্যে নিজেকে বিলিয়ে দিতেই আসেন— নিজের দিকে চাইবার সময় নেই, মানসিকতাও নেই। আর, শিষ্যরা তাঁর দিকে প্রাণঢালা প্রেম এবং সেবাযত্ন না দিতে পারলে— তাঁর ইচ্ছাপূরণে সর্বসাধ্য নিয়োগ করতে না পারলে তিনি অতৃপ্তই থেকে যান। তাঁদের মনের বিষাদ জন্মায় এই ভাবেই। তা দূর হয় একমাত্র শিষ্যগণের সর্বাত্মক গুরুপ্রাণতায়। শিষ্যদের মধ্যে গুরু প্রেমের অভাব হলে তিনি তো তাদের মানুষ করে তোলার সুযোগ পান না। সেটাই তো তাঁদের

দুঃখ। গুরুকে জান-মাল কোরবানি দিয়ে শিষ্যরা যদি অনুসরণ করতে পারে, তবেই তাঁর আনন্দ হয়— অন্তরটা সাফল্যের অনুভূতিতে ডগমগ করে ওঠে। নচেৎ, অবতার মহাপুরুষরা কখনো নিজের দিকে তাকান না। তাঁরা দিতে এসেছেন, দিয়েই চলে যান।'

এই কথাবার্তা মিটলে এক শিষ্য তার অভাব-অভিযোগের কথা জানিয়ে তা থেকে মুক্তির আবেদন জানালো।

উত্তরে ঠাকুর বললেন, 'আরে বাবা, পয়সা কি পয়সা দেয়? পয়সা দেয় মানুষ। বাঁচার জন্যে যা-যা লাগে তা মানুষই দিয়ে থাকে। তাই পয়সা উপার্জনের জন্যে দৌড়াদৌড়ি না করে মানুষ উপার্জনের চেষ্টা করা লাগে। মানুষকে ভালোবেসে মানুষকে সেবা দিয়ে তুষ্ট করে তাকে আপন করে নাও। দেখবে, সেও তোমার অভাব মেটাতে তোমাকে পুষ্ট ও তুষ্ট করতে উদ্যমী হয়ে উঠবে।

একদিনের ভক্ত সমাবেশে উপস্থিত আছেন হিন্দু মহাসভার প্রবক্তা নির্মল চট্টোপাধ্যায় মশাই। তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, 'দাদা, মানুষকে জাগাতে হবে। পত্রিকা চালিয়ে, বই লিখে, সাংস্কৃতিক কাজ কর্ম করে মানুষের মধ্যে ইষ্টের কথা প্রচার করা চাই। আপনারা যা সত্য বলে বুঝেছেন, তা মানুষের মধ্যে চারিয়ে দিতে হবে। সত্যকে গুপ্তধন করে রাখলে হবে না, তা সকলের মধ্যে বিলিয়ে দিতে হবে। সবাইকে আদর্শের দিকে আকর্ষণ করতে হবে। দেশের ভিতরে এইভাবে নতুন জীবনধারার স্রোত বইয়ে দিতে হবে। দেখবেন, তবেই একটা নতুন জাতি জেগে উঠবে। সমস্যার সমাধান, তখনই হবে। সংগঠন বলতে আমি তো এই বুঝি।'

'তাই, মোদ্দা কথা হলো, যেমন শ্রদ্ধা করার মতো মানুষ চাই, তেমনি অন্য দিকে আবার সেই শ্রদ্ধেয় মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের ব্যবস্থাও চাই। শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠে তাঁর ইচ্ছাপূরণে যদি মানুষ কর্মতৎপর হয়ে ওঠে, তবেই একটা জাতি বড় হয়। আবার ব্যষ্টির সমুত্থানও ঘটে এই পদ্ধতিতেই। অন্য রাস্তায় ব্যষ্টি বা সমষ্টির কিছুই হওয়ার সম্ভাবনা নেই।'

গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় ঠাকুরের একজন বিশিষ্ট শিষ্য। তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবার জন্যে আর এক ভক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বড় ইচ্ছা। মুখুর্জ্জেমশাই সেকথা ঠাকুরকে জানালেন। শুনে ঠাকুর বললেন, 'ঋত্বিকদের

বিয়ের ব্যাপারে আমার তো একটা কথা বলাই আছে— তাদের ঋত্বিকী পূরণ হলে তবেই করা ঠিক। এই ধরুন, গুরুদাসের কথাই— গুরুদাস যদি ঋত্বিকীর লক্ষ্য পূরণ না করে আপনার মেয়েকে বিয়ে করে, তবে আপনার ভার কমবে ঠিকই, কিন্তু গুরুদাস ভারাক্রান্ত হবে।'

তার সঙ্গে যোগ করলেন আর একটা কথা। বললেন, 'দেখুন, ঋত্বিকতার কাজ ছেড়ে যেন মেয়ের বিয়ের খোঁজ করতে যাবেন না।— ঋত্বিকতার কাজ বজায় রেখে তার ফাঁকে ফাঁকে বিয়ের সম্বন্ধ দেখবেন। প্রাথমিক কর্তব্য বাদ দিয়ে কোন কর্তব্যই সারতে যাবেন না। তাতে মার খাবে দু'টোই।'

একদিন কথাপ্রসঙ্গে বললেন, 'লাখ-দেড়েক লোককে দীক্ষিত করে তোলা লাগে। দীক্ষিতের ও ক্রিয়াপরায়ণ লোকের সংখ্যা না বাড়াতে পারলে জাতির ও দেশের দুর্দশা মোচন করা যাবে না। এ ব্যাপারে আর কালক্ষেপের সুযোগ নেই। এই মুহূর্ত থেকেই সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে।'

প্রশ্ন করা হলো, এটা কি আমরা পেরে উঠবো?

উত্তরে বললেন, 'চেষ্টা করতে থাকলে পুরোটাই তোমরা করতে পারো। পরমপিতা ক্ষমতা দিয়েই রেখেছেন, তোমরা গুরুনাম নিয়ে লেগে পড়লেই, দেখবে, সফলকাম হয়েছো। এটা আমার দেখা আছে।'

॥ বারো ॥

সেদিন ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের প্রথম দিক। তখন প্রচণ্ড গ্রীষ্ম-মরশুমের প্রারম্ভিক কাল। দেওঘরে গ্রীষ্মের উষ্ণতা একটু বেশিই। ঠাকুর শীত কাতুরে মানুষ, আবার গ্রীষ্মের দাবদাহেও ক্লিষ্ট হয়ে পড়েন। যত তাপ বাড়তে থাকে, চতুর্দিকে উষ্ণ বায়ু-জনিত ঘূর্ণিঝড়-জাতীয় বাত্যাবিক্ষোভ বাড়তে থাকে। ধুলো আর শুকনো ঝরা পাতার আবর্ত পথ-চলতি মানুষের ক্লেশের কারণ হতে থাকে। গ্রাম-বাংলার চলতি ভাষায় একে বলে ঝাঁএল। ঝাঁএলের যন্ত্রণা পথিককে বেশ বিড়ম্বনা দেয়। বায়ু যত তপ্ত হতে থাকে, ঝাঁএলের উৎপাত তত বাড়তে থাকে।

এই রকম এক চৈত্রের শেষাংশে এক সকালে ঠাকুর বসে আছেন বাড়ল বাংলোর বারান্দায়। বসে চারিদিককার ব্যথিত প্রকৃতি জগৎকে প্রত্যক্ষ করছেন। ক্লিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশও তাঁর মনে বিষাদ সৃষ্টি করে, তিনি প্রকৃতির ক্লেশও নিজের স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে উপলব্ধি করে ক্লিষ্ট হয়ে পড়েন। প্রকৃতি-জগতের সুখদুঃখও

তাঁর বোধজগতে পরিবর্তন আনে। প্রকৃতির সকল আলোড়নই তাঁর অনুভূতিতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। কারণ, তাঁর অন্তর্দেশ বহির্জগতের সঙ্গে একাত্ম। আবার তিনি প্রাকৃত জগতের এই নির্মম উত্তালতাকে প্রকৃতির বিধান বলে মেনে নিয়ে তার ক্রিয়ার বৈচিত্র্যকে উপভোগও করে থাকেন। সে দিনকার ঝাঁএল তাড়িত এই প্রাকৃতিক মত্ততার দিনেও তিনি বেশ শান্তচিত্তে বাইরের এই বাত্যা-বিক্ষোভকে মেনে নিয়ে সব-কিছুকে উপভোগ করছেন। বিক্ষুব্ধ বহির্জগৎও তাঁর ক্লেশের কারণ হচ্ছে না, তিনি বরং তার বিধানবশ্যতা দেখে খুশিই হচ্ছেন— ভাবটা এই রকম। প্রকৃতির যে উন্মাদনা আমাদের কাছে উদ্বেজনার কারণ, তাই মনে হয় তাঁর চিত্তকে হ্লাদিত করে তুলছে। সবাই বিধান মেনে চলছে— এই ভাবনা তাঁকে উল্লসিত করছে। হ্লাদিত ঠাকুরকে ঘিরে বেশ-কিছু ভক্ত তাঁর এই সাম্যের মানসিকতাকে উপলব্ধি করে আনন্দিত হচ্ছে।

কথাপ্রসঙ্গে সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের কথা উঠলো। ঋত্বিগাচার্য কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য বললেন, মহাকবি কালিদাসের কাব্যগ্রন্থগুলি রীতিমতো আর্য-ভারতের ঋষি-কথিত জীবনবৃদ্ধির ভাবধারাকেই পরিবেশন করেছে।

কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যগ্রন্থ তো সুবিবাহ এবং সুপ্রজননের দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্যেই লিখিত। কুমারসম্ভব বৈজ্ঞানিক সুবিবাহ পদ্ধতির এক কাব্যিক দলিল।

এ-সব ঠাকুরের জানা। তাই, তিনি বললেন, ওঁদের কাব্যসৃষ্টি শুভপ্রসূ। জনগণের মধ্যে সামাজিক কল্যাণবুদ্ধির প্রচার ঘটানোর জন্যেই ওঁদের লেখনী ধারণ। কারণ, সাহিত্য সমাজের বাইরে নয়, সাহিত্য সমাজের জন্যই। সাহিত্য তো সু-এর প্রসবিনী।

কেউ কেউ বলেন, সাহিত্য কোন তত্ত্বের প্রচার করে না— সাহিত্য আনন্দদায়ক এক রসসৃষ্টি মাত্র। তাঁরা বলেন, সাহিত্য শুধুমাত্র একটি কলা। আর কলার সৃষ্টি কলার রম্যতা ভোগের জন্যই। কোন-কিছু উদ্দেশ্য নিয়ে কলাকার কলা সৃষ্টি করেন না।

ঠাকুর এই ধারণার বশবর্তী নন। তিনি বলেন, সমাজের কাছে মঙ্গলকর না হলে কোন কলাই কলা নয়। মানুষের সকল অবদানই মানুষের জন্যে।

কথাপ্রসঙ্গে সংস্কৃত ভাষাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথাও এসে পড়লো। সংস্কৃত ভাষা না শিখলে এবং সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার পড়ে বুঝতে না পারলে আর্য ভারতের জীবনবৃদ্ধিকর ভাবরাজি সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না।

ঠাকুর এই চিন্তার সমর্থনে আরও বললেন, সংস্কৃত বেশ ভালো করে শেখা লাগে। পরস্পরের কথাবার্তাও সংস্কৃত ভাষায় হওয়া চাই। তবেই কাজের কাজটি হবে।

একদিন স্বস্ত্যর্ঘ্য ঋত্বিক, সুশীল বসু মশাইয়ের সঙ্গে কথা হচ্ছে। নিঃশেষে আত্মবলিদান সম্পর্কে কথা তুলছেন বসু মশাই।

সেই প্রসঙ্গে ঠাকুর বললেন, 'দেখুন সুশীলদা, আপনার সত্তার সৃষ্টিকর্তা কিন্তু আপনি নন। তাই, আপনি আপনার জীবনের মালিক নন। বাহাদুরি দেখাবার জন্যে অথবা শহীদ হয়ে অমরত্ব অর্জনে এই জীবন খরচ করার অধিকার কারও নেই। বরং আপন সত্তাকে উদ্বর্ধনের পথে এমন যত্নে পরিচর্যা দিয়ে সুস্থ ও সবল রাখতে হবে যাতে এই দেহ ও মন দিয়ে অন্যকে সেবাযত্নে তুষ্ট ও পুষ্ট করে তাদের ক্রমবর্ধনশীল জীবনের পথে পরিচালিত করা যায়। এইটাই বিধির বিধি।

এক সময়ে ব্রজেন চট্টোপাধ্যায় মশাই কথা বলতে বলতে 'নন-সৎসঙ্গী' শব্দটা ব্যবহার করলেন। 'নন-সৎসঙ্গী' কথার দ্বারা সৎসঙ্গে সমাগত নন, এমন ব্যক্তিকেই বোঝানো হয়েছে। এই প্রচলিত শব্দটায় ঠাকুর আপত্তি জানালেন। বললেন, 'ঐ শব্দটা ঠিক নয়। সৎসঙ্গ মানে তো অস্তি ও বৃদ্ধির পথে চলার সঙ্গ। কোন মানুষ কি নিজের অস্তি ও বৃদ্ধির শত্রু? না, সবাই বাঁচা-বাড়ার পথে চলতে চায় আপন গরজে। সেই হিসাবে সৎসঙ্গ বিরোধীও নয় ননসৎসঙ্গীও নয়— জীবনের পথ ধরে সবাই চলতে চায়। কখনো কখনো হয়তো প্রতিকূল চাপে সেই পথে তার চলা হয়ে ওঠে না, কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে প্রত্যেক মানুষই জীবন পথের পথিক— অর্থাৎ সৎসঙ্গী।

একবার দিনলিপিকার প্রফুল্লকুমার দাস–মশাই জিজ্ঞেস করলেন, 'ঠাকুর, আপনি যা বলেন, তা আমরা করতে চাই— চেষ্টাও সাধ্যমতো করি, কিন্তু যে দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করলে আপনি খুশি হতে পারেন বা আপনার কাজের সুবিধা হয়, ততখানি গতি ও সুন্দরতাসহ তা সম্পন্ন করতে পারি না— কিছু-না-কিছু খাকতি থেকেই যায়। আপনার ঠিক মনের মতো কর্মী আর হয়ে ওঠা হয় না।'

উত্তরে ঠাকুর বললেন, হ্যাঁ, ঐ রকম কথা বাইবেলেও আছে। বলেছে, 'তোমার কাজ করতে তো অন্তরাত্মা রাজি, কিন্তু দেহ দুর্বল— সে পেরে ওঠে না।' 'আমার তাই মনে হয়। তবে মনপ্রাণ নিয়ে লেগে থাকলে কাম কিছু হয়ই। ইষ্টনিষ্ঠায় অনড় হয়ে লেগে থাকাটাই সাফল্যের আসল চাবিকাঠি।'

একবার নির্মলবাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আজকাল অধিকাংশ মানুষই ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্কটি ধরে উঠতে পারে না। তাই, তারা ধর্ম ছাড়াই রাজনীতি করেথাকে।'

ঠাকুর বললেন, 'সেই সব রাজনীতিবিদরা ধর্মের সঠিক মানেই বোঝে না। ধর্মের তত্ত্বটা না বুঝলে ধর্ম থেকে দূরে থাকার ঐ মানসিকতা আসবেই। আমার চোখে তো এমন কোন বিষয়বস্তু পড়েই না যা মানুষের পক্ষে জীবনীয় অথচ ধর্মের মধ্যে পড়ে না। আমি তো দেখি ধর্মসম্মত সব ব্যবস্থাই ব্যষ্টি মানুষ ও সমষ্টিগত মানুষের পক্ষে অতি আবশ্যিক এবং বিশেষ কল্যাণকর।'

আরও বলেছেন, 'ধর্ম মানেটা কী? ধর্ম মানে— তেমন বলা, তেমন করা, তেমন ভাবা, যাতে পরিবেশকে নিয়ে সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকতে পারি এবং বেড়ে উঠতে পারি। ধর্ম-শব্দের মধ্যে শুধু ধরে থাকার কথাই নেই— বেড়ে ওঠার কথাও আছে। এটা তো ঠিক যে, শুধু থাকাটা অনেকটাই অবান্তর। কারণ, অস্তিত্ব স্থবির হতেই পারে না। বেঁচে থাকার ভিতরে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা আছেই। মৃত হয়ে বেঁচে থাকা যায় না। মানুষের 'মমি' আর জীবন্ত মানুষটা এক নয়।'

॥ তের ॥

ঠাকুর বড়াল বাংলোর প্রাঙ্গণে আমতলার নিচে ইজি চেয়ারে বসে আছেন। কাছে কিছু সংখ্যক ভক্ত উপস্থিত থেকে তাঁর প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখছেন, কিছু ভক্ত তাঁর মধুময় তনুরূপ অঙ্গভঙ্গি ও বচনবৈশিষ্ট্য উপভোগ করছে। তাঁর উপস্থিতিটা মানুষের কাছে নিত্যরম্য এবং নিত্য ভোগ্য।

কথা প্রসঙ্গে তাঁর প্রদত্ত একটা ইংরাজি বাণীর কথা উঠলো। কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য-মশাই তাঁর ইংরাজি ভাষার বাণীগুলির রমণীয়তা, গভীরতা এবং সাবলীলতার কথা উল্লেখ করে সেগুলির বিরাট বৈশিষ্ট্যের কথা ব্যক্ত করলেন।

শুনে ঠাকুর বললেন, 'আমি কি ইংরাজি জানি? পরমপিতা কওয়ান, তাই কই। ওর উপর আমার কন্ট্রোলও নেই। তাঁর ইচ্ছায় ওগুলি বেরিয়ে আসে— এই মাত্র।'

ঠাকুরের মন্তব্যটি পুরোপুরিই সত্য। ইংরাজি ভাষায় তেমন কিছু দক্ষতা নেই— থাকার কথাও নয়। কিন্তু যখন প্রেরণা আসে যে ইংরাজি মুখ থেকে নিঃসৃত হয়, তা কোন উচ্চশিক্ষিত ইংরেজ-নন্দনের মুখেও আসা সম্ভব নয়। বিস্ময়ের বিষয় এইটাই। সবটাই ইনস্‌পিরেশন বা প্রেরণা। এই ভাব ও

তদুপযোগী ইংরাজি স্বতঃই তাঁর বদন থেকে নিঃসৃত হয়েছে। এর মধ্যে যাদু নেই। সমস্ত প্রক্রিয়াটাই–তাঁর ভাবাবেগ প্রকাশের অন্তঃপ্রেরণার ফসল।

একদিন অধ্যাপক শরৎ হালদার-মশাই জিজ্ঞেস করলেন, 'চাতুর্বর্ণ্যাং ময়া সৃষ্টং, গুণকর্ম বিভাগশঃ' বলে যে কথা আছে, তার ঐ 'গুণ' শব্দের অর্থ কী?

উত্তরে ঠাকুর বললেন, 'এই গুণ হলো সহজাত সংস্কার থেকে উদ্ভূত কর্মপ্রবাহ এবং অভ্যাস। অনুশীলনের মধ্য দিয়ে গুণগুলি আবার আরও গুণিত হয়ে ওঠে— অর্থাৎ, বর্ধিত হতে থাকে।'

বললেন, 'আবার দেখা যায়, যার সহজাত ঝোঁক যে রকম, সে কিন্তু তার সমান অথবা প্রায় সমান ঝোঁকওয়ালা মানুষের সঙ্গ পেতে ভালোবাসে। তাই, সমান অথবা প্রায়-সমান সহজ সংস্কারে মানুষেরা গুচ্ছ বেঁধে থাকতে ভালোবাসে— গেঁজেলে গেঁজেলে ভাব হওয়ার মতো। এই ভাবে একই বর্ণের মানুষেরা এককাট্টা হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যেকার সৌহার্দ্য এবং সম্প্রীতি সেই বর্ণধৃত মানুষগুলিকে আরও ঘনিষ্ঠ এবং গুচ্ছায়িত করে তোলে।'

এখন সব বর্ণগুচ্ছের সাধারণ উপাস্য বা অনুসরণীয় যদি এক হন, তাহলে সামগ্রিকভাবে জাতি বা রাষ্ট্রও ঐক্যশক্তিতে বলবান হয়ে সব দিক্ দিয়ে বিশিষ্ট হয়ে উঠতে পারে।

এই বর্ণজ গুণ কিন্তু রক্ষিত এবং অক্ষত থাকতে পারে বৈজ্ঞানিক বিবাহ-সংস্কার এবং সুপ্রজননের দ্বারা। ঠিকঠিক বিয়ে এবং তার ফলে সুসন্তানের আবির্ভাব— এই হলো একটি জাতির জীবন রসায়ন। অবৈজ্ঞানিক যৌন মিলন দেশকে দেশদ্রোহীদের নারকীয় লীলাস্থলে পরিণত করে। তখন রাষ্ট্র চালকগণ চোখে অন্ধকার দেখেন— দেশ উচ্ছন্নে যায়। যে সন্ত্রাসবাদীরা আজ গোটা বিশ্বের শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের ভয়ের কারণ, তাদেরও আবির্ভাব ঐ অবৈজ্ঞানিক বিবাহ বা যৌন সম্পর্কের ফল। আর্য মনীষিগণ কর্তৃক প্রচারিত বৈজ্ঞানিক সুবিবাহ যত দিন বিশ্বের মনুষ্যসমাজ কর্তৃক মিলিতভাবে স্বীকৃত এবং অনুসৃত না হচ্ছে, ততদিন অর্জিত সভ্যতার অস্তিত্ব-রক্ষার এবং মানবজাতির নিরাপত্তারক্ষার কোন ব্যবস্থাই কার্যকর হতে পারে না। বিবিধ নামের বিবিধ সুরক্ষা-বাহিনী গঠন করেও কিছুই করা যাবে না। সন্ত্রাসবাদকে রুখতে সন্ত্রাসবাদীর জন্মকেই আটকিয়ে দিতে হবে। আইন করে, বিবাহে স্বেচ্ছাচার বন্ধ করতে হবে— প্রতিটি বিবাহে আর্য সমাজবিধান অনুসৃত হচ্ছে কিনা, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে তবে সরকারী

অনুমতি দেবার নিয়ম চালু করতে হবে। অনুমতি বিহীন বিবাহ ঘটতে দেওয়া হবে না। তবেই দেশে সুসন্তানের আবির্ভাব সম্ভব হবে এবং কমান্ডোবাহিনী ছাড়াই শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষিত হতে পারবে। দুষ্কৃতি-দমনের উপরে পুলিশ-বাহিনী গঠন নয়, দুষ্কৃতিদের জন্মই বন্ধ করে দিতে হবে। সে উদ্দেশ্যে দাম্পত্য-সম্পর্ককেই নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। একমাত্র ঋষি–অনুশাসনকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিয়ে তদনুপাতিক আইন প্রণয়ন করে কঠোর হস্তে তা বলবৎ করতে হবে। এ ছাড়া সন্ত্রাসবাদীর জন্মকে নিয়ন্ত্রিত করা যাবে না এবং বিশ্ববাসীদের উদ্বেগেরও নিরসন করা সম্ভব হবে না।

এক সময়ে কথা উঠলো— পরমপিতার ইচ্ছা ছাড়া তো কিছুই হয় না, তবে পৃথিবীতে এত সব বিপত্তি ঘটে কার ইচ্ছায়? এ সবই কি পরমপিতার ইচ্ছায়?

'পরমপিতার ইচ্ছা হলো মঙ্গলময়। মঙ্গলপ্রাপ্তির নিয়ম মেনে মানুষ মঙ্গলের অধিকারী হোক, এইটাই পরমপিতার ইচ্ছা। তাঁর আদেশ এবং নির্দেশ না মানলে মানুষ সেই মঙ্গল থেকে বঞ্চিত হয়। পরমপিতা যখন নরাকারে ধরায় আসেন মানুষের কল্যাণ-সাধনের উদ্দেশ্যে, তখন মানুষের কর্তব্য হলো সর্বান্তঃকরণে তাঁর অনুসরণ করা। তাঁর প্রতি আনুগত্য নিয়ে মানুষ তাঁর কথামতো চললে তাঁর কাঙ্ক্ষিত মঙ্গলের অধিকারী হয়ই হয়। মঙ্গলময় পরমপিতার ইচ্ছায় এই প্রকারেই মানুষের কল্যাণ হয়ে থাকে। অন্য উপায় নেই।'

একদিন শ্রেয়ঃশ্রদ্ধা সম্বন্ধে কথা উঠলো। ঠাকুর বললেন, 'শ্রেয়ের প্রতি শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে মানুষ কখনো বড় হতে পারে না। এই ভাবে যে বড় হয়েছে, তাকেও মান্যতা দিতে হয়। যে তাকে মান্যতা দেয়, সেও বড় হয়ে ওঠে।'

একদিন স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে ঠাকুর বলতে লাগলেন, 'দীক্ষিতের সংখ্যা দ্রুত বাড়ানো দরকার। দীক্ষা নিয়ে মানুষ যদি ইষ্টী-চলনে চলে— বিধিমাফিক যদি যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী প্রভৃতি এতগুলি পালন করে চলে, তবে শুধু তারই মঙ্গল হয়, তাই নয়। তার পরিবেশে যারা বাস করে তাদেরও মঙ্গল হয়।'

একদিন 'সভ্যতা' সম্পর্কে বলতে গিয়েও ঐ ধরণের কথাই বললেন। বললেন, প্রকৃত সভ্যতার অধিকারী যারা, তাদের পরিবেশে যে-সব অন্য লোকজন বাস করে, তাদের চাল-চলনে ঐ সভ্য মানুষদের প্রভাব প্রতিফলিত হতে থাকে। এই প্রকারে সভ্যতার বিস্তার ঘটে। আর্য-সংস্পর্শে এসে অন্যেরাও

আর্য হয়ে উঠেছিল। তবে, এসব ব্যাপারেই বৈজ্ঞানিক সুবিবাহ রীতির প্রতি মান্যতা থাকতেই হবে। বিয়ের ব্যাপারে গোঁজামিল বা গোলমাল থাকলেই কিন্তু সব শুভ-মতলবই ভেস্তে যায়।

একদিন কথায় কথায় বললেন, 'শ্রীকৃষ্ণ নিজে অবিপ্র হলেও ব্রাহ্মণদের প্রতি কখনো অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন নি— ব্রাহ্মণরা ভুলবশতঃ তাঁর প্রতি রুষ্ট ব্যবহার করলেও।' পরমপুরুষের এই স্বভাব। কৃষ্টির প্রতি আনুগত্য এবং তা রক্ষার তাগিদ তাঁদের কোন আঘাতেই ভেঙ্গে পড়ে না।

তখন গরম কাল। একদিন বিকেলে দারোয়া নদীর উন্মুক্ত চরায় ইজি চেয়ারে বসে আছেন ঠাকুর।

ভক্তবৃন্দ তাঁর নিকটে তাঁর অমৃতমাখা সান্নিধ্য উপভোগ করছে। তাঁর কাছে বসে থাকাটাই ভক্তগণের কাছে এক পরমানন্দের ব্যাপার। তাঁর দেহলাবণ্য, তাঁর অঙ্গচালন, তাঁর বাগ্‌বিস্তার এবং সর্বোপরি সব কিছুর মিলনে তাঁর অবস্থান ভূমিতে যে স্বর্গীয় অতি–আকর্ষণীয় রম্যতার শুভাবির্ভাব ঘটে, তার আকর্ষণে ভক্তবৃন্দ আকৃষ্ট হয়ে আর নড়তে চায় না। এটাই নিত্যকার চিত্র।

এই সময়ে একটি মা এসে নিবেদন করলে, 'বাবা, আমার ছেলেটা দিন দিন ভারি বেয়াড়া এবং দুরন্ত হয়ে উঠছে— হাজার শাসন করলেও কিছু ফল হয় না, বোঝালেও কথা শোনে না— ওকে নিয়ে কী যে করি, ভেবে পাইনে।'

মা'টির দুঃখের কথা শুনে তিনি বললেন, 'তবে শোনো আমার কথা। ছাওয়ালকে শাসন করার আগে শাসন করা লাগে নিজেকে। তার মানে হচ্ছে, তুমি নিজে যে-সব নীতি-নিয়ম মানো না, তা ছাওয়ালকে শেখাতে গেলেও শিখবে না— মেনে নিতে পারবে না। আগে তোমার চালে-চলনে, কথায়-ব্যবহারে, আচারে-নিষ্ঠায় এমনতর হওয়া লাগে যাতে তোমার প্রতি ওর সহজেই একটা শ্রদ্ধা জাগে এবং তোমার কথা শুনে ও মেনে আনন্দ পায়। এ ছাড়া আর তো উপায় দেখি না। তুমি তো ওর স্বভাবিক গুরুজন। তুমি তোমার গুরুজনদের মেনে এই শিক্ষার দৃষ্টান্ত দেখাও! নিজে নিজে করো না, সেই শিক্ষার কথা বললি কি কাম হয়? বিধাতার নিয়মই এমন। যা নিজে করি না, সেই বিষয়ে মান্‌সেক উপদেশ দিলি সে নিবি ক্যা? তোমার কর্মের দ্বারা তাকে শেখাও! এ-সব কথা যে কতবার তোমাদের কইছি।'

'যাও, যা ক'লেম, তাই করো!' এই বলে বিদায় দিলেন তাকে।

একদিন গল্পচ্ছলে বললেন, 'মানুষের জীবনের সব চাইতে সম্পদ্ হলো— ইষ্টের উপর অকাট্য টান। তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে মানুষ তাঁর পথে চলা শেখে এবং নিজের জীবন তাঁর মনের মতো করে গড়ে তোলার তাগিদ বোধ করে। এইভাবে তার জীবনের ভোল বদলায়।'

ঐ গ্রীষ্মেরই অন্য একদিন। ঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় তক্তপোষে সাদা বিছানায় উপবিষ্ট। ভক্তগণ শান্তচিত্তে উপবিষ্ট হয়ে তাঁর বচনসুধা পান করছে।

এক ভক্তের কলমটা হারিয়ে গিয়েছে— খুব অসুবিধায় পড়েছেন। অন্য এক ভক্তের মুখে জানা গেল, এক অফিস-কর্মী রাস্তায় একটা কলম পেয়ে রেখে দিয়েছেন এবং সবার কাছে তা বলছেন। অতএব ইনি অফিসে গিয়ে সন্ধান করতে পারেন।

এই ঘটনা শুনে ঠাকুর বললেন, সর্বদা সচেতন থাকতে হয়। ভেবে-ভেবে নিজের ত্রুটিগুলো মেরামত করে নিতে হয়। সাবধান থাকলে এরকম তো ঘটার কথা নয়। এখন থেকে এমনটা আর না ঘটে।

॥ চৌদ্দ ॥

একদিন কথাচ্ছলে ভক্তগণকে বললেন, 'দ্যাখো, ঋষি-আনুগত্য ও বর্ণাশ্রম ঠিক থাকলে সমাজের সংহতিও ঠিক থাকে, আধ্যাত্মিক এবং বৈষয়িক উভয় প্রকার উদ্বর্ধনই অব্যাহত থাকে। বর্ণাশ্রম-ধর্মকে ভেঙ্গে ফেললেই সমূহ বিপদ। ভালো মানুষের আবির্ভাবই তো সঠিক বিবাহ এবং বিজ্ঞানসম্মত প্রজননের উপরে নির্ভরশীল। জনন-জগতে বিশৃঙ্খলা ঘটলেই তো উত্তম সন্তানের আবির্ভাব স্থগিত হয়ে যায়। তখন যে-সব সন্তানের আবির্ভাব ঘটে, তাদের কাজই হয় মনুষ্যজাতির গোড়ায় কুড়ুল চালানো। সুপ্রজননের উদ্দেশ্যে ঋষি-চালিত সমাজে যে বিবাহবিধান প্রচলিত ছিল, তার বৈজ্ঞানিক নাম ছিল— অনুলোম বিবাহ। অসবর্ণ বিবাহ আজকাল ফসল-জগতে এই প্রক্রিয়াতে উন্নততর ফসল ফলানো সম্ভব হয়েছে। গবাদি প্রাণীর ক্ষেত্রেও এই প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে উন্নততর দুগ্ধ সম্ভাবনার গাভীর জন্মকে সম্ভব করে তোলা হয়েছে।'

এই আলোচনা চলা-কালে আমেরিকার ছেলে হাউজারম্যান বললে, 'আমাদের দেশেও কিন্তু অনুলোম অসবর্ণের বিবাহনীতিকে প্রকারান্তরে সমর্থন করা আছে। ওখানে একটি ছেলে তার থেকে নিচু ঘরের কোন মেয়েকে বিয়ে করলে সে সমাজে নিন্দিত হয় না, কিন্তু তার উল্টোটা করলে সমাজে সে নিন্দিত হয়ে থাকে।'

ঠাকুর এই খবর শুনে খুশি হয়ে বললেন, 'আসল জিনিসের আদর সব দেশেই আছে। ভালো সন্তান লাভের আর তো কোন উপায় নেই।'

এক ভক্ত একদিন বললেন, 'আমরা আপনাকে পেয়ে ধর্মের পথ ধরে এগিয়ে চলেছি। অন্যান্য মানুষের চেয়ে আমরা তাই অর্থ, মান, যশ, ক্ষমতা সকল ক্ষেত্রেই সব রকম ভাবে বড় হয়ে উঠবো— তাই তো?'

শুনে ঠাকুর গালভরা হাসি নিয়ে বললেন, 'তোমরা তো অন্যদের চেয়ে বড় আছোই। তোমরা পরমপিতার বিশেষ অনুগ্রহ পেয়েছো। কিন্তু তোমাদেরও আরও করণীয় ছিল। পরমপিতার দয়ায় তোমরা পেয়েছো অনেক, কিন্তু নিজের চেষ্টায় যে চরিত্র গড়ে তোলা লাগতো, তা গড়ে তোলার কোন চেষ্টা করছো না। ফলে, নিজের দাঁড়া শক্ত হচ্ছে না। তাঁর অঢেল দয়া পাচ্ছোই, কিন্তু তা ধারণ ও বহন করে নতুনতর হয়ে জন্ম নিয়ে সমাজকে কিছু দিতে পারছো না।'

আরও বললেন, 'গণসেবার কথায় মুখে খই ফোটে, কিন্তু কারও তেষ্টার ফলে এক গ্লাস জলও বয়ে এনে তার মুখের সামনে ধরতে পারো না। এ এক ধরণের কপটতা বা ভণ্ডামি।'

বললেন, 'আমিতো বলেই দিয়েছি— করো এবং পাও। এই করে পাওয়ার নামই কৃপা। নতুবা কৃপা মানে অদ্ভুত কোন যাদু নয়। নিজের কোন স্বার্থকে আমল না দিয়ে ইষ্টের স্বার্থকে মূর্ত্ত করে তোলার জন্যে আপ্রাণ হয়ে লেগে থাকো, দেখবে তোমার সত্তার রক্ষণ ও বৃদ্ধির জন্যে যা যা দরকার তা অপ্রাপ্য থাকবে না।'

এক ভক্তের তরফ থেকে আবার প্রশ্ন হলো, 'যা করার, তা তো তিনিই করিয়ে নেবেন।'

'পরমপিতা তোমাকে অনেক ক্ষমতা দিয়েছেন, আবার তার সঙ্গে করা-না-করার স্বাধীনতাও দিয়েছেন— তাঁর পথে চলে যেমন সর্বক্ষম হয়ে ওঠার স্বাধীনতা দিয়েছেন, তেমনি আবার কিছু-না করে অপদার্থ হয়ে থাকার বা গোল্লাই যাবার স্বাধীনতাও দিয়েছেন। তোমাকে করে করে হতে হবে এবং হওয়ার ভিতর দিয়ে পেতে হবে। তুমি তোমার বাবার থেকে এসেছো, তাই বলে বাবা খেলে কিন্তু তোমার পেট ভরে না। তাই, ফাঁকিবাজি ছেড়ে প্রাণ ভরে তাঁকে চাও এবং তাঁর জন্যে করে করে তাঁর হও। এই ধরা এবং করার মধ্য দিয়েই বুঝতে পারবে, তোমার শত অপরাধ সত্ত্বেও পদে পদে তিনি তোমাকে আগলে রেখেছেন। মুরগীছানার মা যেমন করে ছানাদের পাখার ছাতার নিচে রেখে তাদের আপদ বিপদ থেকে রক্ষা করে, পরমপিতাও তেমনি সর্বদাই তোমার প্রহরায় আছেন। সেই ইষ্টরূপী পরমপিতাকে ধরে চলাই তোমার সাধনা।'

একজনের প্রশ্ন 'ইষ্টকে ঠিকভাবে ধরা যায় কি করে?'

'বারে বা, বউকে ঠিক করে ধরো কি করে? ছেলেকে ঠিক করে ধরো কি করে? ইষ্টকে ঠিক করে ধরার বেলায় যত প্রশ্ন। ভেবে দ্যাখো, ধরার রাস্তা তোমার জানাই আছে।'

আরও বলে দিলেন, 'আমরা তাঁর প্রীতির জন্যে যত বেশি করি, ততই তিনি আমাদের অন্তরে গাঁথা হয়ে যান। তখন দেখতে পাবে, তিনি কেমন প্রতিটি মুহূর্তের জন্য আমাদের পাশে-পাশে রয়েছেন।'

এক ভক্ত বললেন, 'বুঝছি তো, কিন্তু ঠিক কায়দা পাই না।'

রসিকবর রসে-চোবানো কথায় সেই ক্ষোভের জবাব দিলেন। বললেন, 'একটা মেয়ে মানুষ বাগাবার ইচ্ছে হলে তো খুব কায়দা পাও— কোন অসুবিধা গায়ে লাগে না, সব কষ্ট হাসিমুখে সহ্য করো।'

প্রশ্নকর্তা পুনরায় বললেন, 'চেষ্টা করেও পারা যাচ্ছে না।'

ঠাকুর সে-কথায় আমলই দিলেন না, তেজস্বিতার সঙ্গে বলে চললেন, ' ও সব অজুহাত দেখাস্ না। চেষ্টা করেও পারছি না— ওসব হলো না করার কথা। না করার পক্ষে ওকালতি— আমি ওসব শুনতে চাই না। শালা, মেয়েমানুষ বাগাতে কত খাটনি লাগে, ভেবে দ্যাখ্ তো! ইট পাটকেলের মধ্য দিয়ে হয়তো মাঝরাতে দৌড় মারতে হলো। সে-কামে কত ফন্দি, কত কায়দা করা লাগে। সেই পছন্দের মেয়ে মানুষটার মুখে এক ফালি হাসি ফোটাবার জন্যে কত সাধনা করতি হয়। প্রাণে টান আসলি ঐ রকমটাই হয়। মেয়ে মানুষটা বেহাতি হলে বুক ফেটে যায়। তো, ইষ্টের বেলায় ঐ টান আসে না ক্যা?'

চতুর প্রশ্নকর্তার পুনরায় জিজ্ঞাসা— তা হলে আমাদেরও কি সব বেহাতি হয়ে যাচ্ছে?

'উত্তর তোমার কাছেই মজুত আছে। বাইবেলে বলাই আছে, যে নিজের দোষত্রুটিগুলি খুঁজে দেখে নিজের উন্নয়নের জন্যে সেগুলির নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, সে অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন এবং বিজ্ঞ।'

'ভেবে দ্যাখো, সকল যুগে একই কথা বলা আছে। না-করার পক্ষে যুক্তি না দেখিয়ে কেমন করে ইষ্ট নির্দেশে চলা যায়, সেই ফিকিরে থাকো, দেখো রাস্তা পেয়েই যাবে— রাস্তার মালিক রাস্তা করেই রেখেছেন— তিনি নিজের হাতে সেই রাস্তার কাঁটা সরিয়ে রেখেছেন।'

এই ছেলেটিও ঐ ধারণার বশবর্তী হয়ে জেহাদে যেতে চায়। সেই মতলবে সে নবী করিম (দঃ) এর কাছে এসেছে অনুমতি চাইতে। বিনয় প্রকাশ করে সে বললে, 'হজরত, আমি ধর্মযুদ্ধে যেতে চাই, তাই আপনার অনুমতি প্রার্থনা করতে এসেছি।'

তার মনোবাসনার কথা শুনে নবী করিম (দঃ) বললেন, 'তোমার বাড়িতে মা আছে?'

উত্তরে যুবকটি বললেন, 'জি হ্যাঁ, বাড়িতে আমার মা আছে।'

'তবে যাও, বাড়ি ফিরে গিয়ে ঐ মায়ের পদসেবা করো। বেহেশত আছে ঐ মায়ের পায়ের তলায়।' সিধা উত্তর ইসলাম প্রবর্তক হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর।

এমন তীরের মতো সোজা ভাষায় আর কারও মুখে মাতৃ-মাহাত্ম্যের কথা শোনা যায়নি। সমগ্র মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এমন মাতৃবন্দনা আর কোথাও শ্রুত হয়নি।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র নিজের মায়ের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, 'আমার মা চলে যাওয়াতে আমার মনে হলো, আমার পায়ের তলার মাটি হারিয়ে ফেললাম— আমি একবারে নিরালম্ব হয়ে গেলাম।'

সব শেয়ালের এক রা। মায়ের সম্বন্ধে নবী করিম (দঃ) এবং ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ধারণা একই প্রকার।

'এই নূর নবী করিম (দঃ)ই শেষ নবী।' ইসলামের বাণী।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বলেছেন, 'একেবারে খাঁটি কথা।'

মানে হলো, তিনি পরিপূর্ণ পরমপুরুষ। তাঁর উপরে আর নেই। তাঁর অবদান কোন খণ্ডকালের জন্যে নয়— তাঁর ব্যবহারিক চিন্তাধারা এবং আধ্যাত্মিক অবদান ছিল সর্বকালের মানুষের জন্য পালনীয়। কারণ, মানব-সভ্যতার মৌলিক ধ্যানধারণা কোন এক কালের উপযোগী হয়ে নেমে আসে না। যুগপুরুষগণ এক এক কালে অবতীর্ণ হয়ে সেই-সেই কালের কুসংস্কার এবং অগ্রসৃতির পথে প্রধান-প্রধান বাধাগুলির নিরসন তো করেনই, পরন্তু জীবন ও বর্ধনের পক্ষে স্বীকার্য মৌলিক সর্বকালীন করণীয় কর্মগুলির নিদর্শন সৃষ্টি করে যান। কাজেই, তিনি যখনই আসেন, কালোপযোগী পূর্ণতা নিয়েই আসেন। তাই, সর্বযুগেই তিনি শেষ অর্থাৎ পূর্ণ নবী করিম (দঃ)।'

একবার ঋত্বিগাচার্য কথা তুললেন, 'জীবজগতের মধ্যে মনে হয়' মানুষই তো শ্রেষ্ঠ। মানুষের মতো কথা বলার শক্তি, স্মৃতিশক্তি, অনুধাবনের শক্তি, তার আবিষ্কারের ক্ষমতা— এমন তো অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে দেখা যায় না।'

উত্তরে ঠাকুর বললেন, 'তা ঠাওর পাই না। একটা পিঁপড়ের বোধশক্তি আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। কাজেই সেই বোধের দিক দিয়ে পিঁপড়ে বড় না আমরা বড়, তা কি হলফ করে বলা যায়? তুলনামূলক ভাবে বললে কোন কূল-কিনারা পাওয়া যায় না। কাকে যে ছোট বলবো আর কাকে যে বড় বলবো— তার ঠাওর পাওয়া যায় না। শুনা যায়, কাক পাখি নাকি তার ভাষায় আমাদের অনেক আগামী সংবাদ দিয়ে যায়, কিন্তু আমরা কি তার রবের মানে বুঝি? তাই, তার সঙ্গে আমাদের কোন যোগাযোগই হয় না। এ ক্ষেত্রে কী বলবো— আমরা কি খুব এগিয়ে?'

ঋত্বিগাচার্য বললেন, 'আমরা মানুষেরটাও বুঝি— আবার অন্যেরটাও কিছু কিছু বুঝি— এইটাই আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব।'

'একে বলে আত্মপ্রসাদ। এর থেকে ঠিক বিচারে আসা যায় না।' উত্তর দিলেন ঠাকুর।

'পাখি পাখা মেলে আকাশে ওড়ে, তাই দেখে মানুষ এরোপ্লেন বানালো। এটা কি কম কথা?' মন্তব্য করলেন ঋত্বিগাচার্য।

'উড়োজাহাজ মানুষ বানিয়েছে তার প্রয়োজনে। কিন্তু পাখির পাখা ও পাখার ব্যবহারিক গুণ তার নিজস্ব। এটা তার জন্মগত শ্রেষ্ঠত্ব।' বললেন ঠাকুর।

'মানুষ অন্য দিক দিয়েও বড়।' ঋত্বিগাচার্য তর্ক চালিয়ে গেলেন। বললেন, 'মানুষের মধ্যেই তো যিশু খৃষ্টের মতো মনুষ্য-পরিত্রাতা এসেছেন।'

'আমার মনে হয়, অন্য প্রাণীর মধ্যেও তাদের উদ্ধাতা আসেন। তিনি তাদের উন্নততর বাঁচার কৌশল শেখান। পরমপিতার চিন্তাধারা থেকে কেউ বাদ যায়নি।' উত্তর দিলেন ঠাকুর।

এক ভদ্রলোক একবার দেওঘরে বড়াল বাংলোয় ঠাকুরের সঙ্গে এসে বললেন, 'দেশছাড়া হয়ে দেখছি, কোথাও কারও কাছ থেকে তেমন সহযোগিতা পাওয়া যায় না। সহানুভূতিসম্পন্ন মানুষের বড় অভাব।'

তাঁর দুঃখের কথা তো ঠিকই কিন্তু এই পরিস্থিতি থেকে তো নিস্তারের পথ খুঁজে বের করতে হবে। সে রাস্তাটা কী?

বললেন, 'মানুষই মানুষের সম্পদ। টাকা-পয়সা, জমি বাড়ি এসব বড় জিনিস নয়। মানুষের মধ্যেই আছেন নারায়ণ, মানুষে ভক্তি থাকলে, লক্ষ্মী নিজের থেকে আসেন। আপনি মানুষের সেবায় মাতুন, দেখবেন, লক্ষ্মীর দয়া পাচ্ছেন। আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাচ্ছে।'

আরও যোগ করলেন, 'আমার সামর্থ্য থাকলে পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা যাতে প্রথম শ্রেণীর নাগরিক অধিকার নিয়ে বাঁচতে পারে— তাদের মর্য্যদা, নিরাপত্তা যাতে সুরক্ষিত থাকে সেই উদ্দেশ্যে প্রাণপণ চেষ্টা চালাতাম। কিন্তু এই বয়সে এই ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে আমার দ্বারা আর তা সম্ভব নয়। এখনও দেশের মাটি, দেশের জলবায়ুর টানে মনটা সেখানেই পড়ে আছে। সকলেরই তাই হয়। কিন্তু একটা নিরুপায় অবস্থা। কিন্তু কেউ যে নেতৃত্ব নিয়ে কিছু করবে, এমনতর লোকও তো দেখতে পাই না। আমাদের সে পূর্বের জাতিগত শক্তি একগাট্টা ও একতানতার শক্তি আর দেখতেই পাওয়া যায় না। সবই লোপ পাওয়ার মুখে।'

একজন বললে, 'এর জন্যে প্রধানতঃ ব্রাহ্মণরাই দায়ী'

'বামুনের দোষ দেন কেন? উচ্চবর্ণের বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্যে কিছু-কিছু শক্ত বিধি-বিধান রচনার দরকার হয়ে পড়েছিল, না-হলে সব-কিছু জগাখিচুড়ি হয়ে সমাজ চিত্রটা যে কী হয়ে যেত তা চিন্তাও করা যেতো না— একটা স্বধর্মে জাগ্রত বৈশিষ্ট্য চেতন মানুষও খুঁজে পেতেন না। শুধু বামুনের দোষ দেওয়া ঠিক হবে না।'

বলে চললেন, 'আরও জানবেন হিন্দুরা ছিল একটা বিরাট জাতি— তাদের জাতীয় সংবিধানে মানুষে মানুষে ঘৃণার স্থান ছিল না। তারা সকল মানুষকে কখনো আপন ছাড়া পর ভাবেনি। যে সব ফাঁক ফোকর দিয়ে পতন ঢুকতে পারে, সেই সব জায়গায় কিছু কঠোর বিধি নিয়ম করা ছিল— যেমন বিবাহ বন্ধন নির্মাণের ক্ষেত্রে। অবৈজ্ঞানিক কুবিবাহ প্রচলিত হলেই জাতির মহাসর্বনাশ অনিবার্য হয়ে উঠবে— এই চিন্তা থেকে ঐ সব ব্যাপারে ব্রাহ্মণগণ কিছু কঠোর নির্দেশ জারি করেছিলেন। তাই অনেক গোলমালের মধ্যেও হিন্দু জাতি এখনও টিকে আছে— মর্যাদার সঙ্গেই টিকে আছে । অথচ হিন্দু জাতি কখনো কাউকে বাদ দিয়ে চলেনি। প্রতিটি বর্ণ বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করে নিয়ে জাতির ক্রমোর্দ্ধ্বগতিকে সুনিশ্চিত করতে কতই না প্রয়াস ছিল হিন্দুদের। সনাতন হিন্দু জাতির তুলনা পাওয়া ভার।'

এক ভদ্রলোক একদিন প্রশ্ন তুললেন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তো পূর্ববঙ্গের নাম সবার উপরে, তো তাতে তাদের ভাগ্যে জুটলো কী? এ-সম্পর্কে আপনার কী মত?

প্রশ্ন শুনে ঠাকুর বললেন, 'গোড়া কেটে দিয়ে আগায় জল ঢাললে কি গাছ বাঁচে? যে গাছ বাঁচেই না, সে আবার ফুলফল দেবে কি? মূল ভিত যদি ঠিক না থাকে, তবে উপরসা যাই করতে যাওয়া যাক না কেন তা অর্থহীনই হয়ে দাঁড়ায়। শিব গড়তে বানর গড়া বললে যা বোঝায়, তাই হয়।'

আরও একটি বহুশ্রুত সমস্যার বিষয়ে বললেন, 'সাম্প্রদায়িকতা কিন্তু কোন সমস্যাই নয়। আমরা যদি নিজের ধর্ম মতের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ এবং কর্মনিষ্ঠ থাকি, তা হলে অন্যান্য ধর্মমতের প্রতিও প্রীতি এবং শ্রদ্ধা পোষণই করবো। স্বধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি কখনো পরধর্মমতে বিদ্বেষী হয় না। আমরা ধর্মকেই ভালোবাসি না— তা আবার স্বধর্মই বা কি আর পরধর্মমতই কী। ধার্মিক ব্যক্তির কাছে তো সব ধর্মমতই এক। যে ধর্মমত যে-ভাষাতেই প্রচারিত হোক না কেন, তার মূল বক্তব্য একই। বিশ্লেষণ করে বুঝে দেখলে দেখা যাবে, সব প্রবক্তার বক্তব্য একই। জীবন বৃদ্ধিকর কথা ছাড়া কেউ ধ্বংসের কথা বলেন নি—গণ্ডগোলের উস্কানিও দেন নি।'

এ-সম্পর্কে আরও বলেছেন, 'মানুষকে ভালোবাসা, সেবা করা তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাকে বাড়িয়ে তোলা, অন্যের ভালোর সঙ্গে নিজের ভালো করা— এ সবই ধার্মিক ব্যক্তির ধান্ধা। লোকে মানবতার কথা কয়, কিন্তু আমি তো দেখি, ধর্মের রাস্তা ছাড়া মানবিকতা-চর্চ্চার কোন সুযোগই নেই। সকল উন্নয়ন এবং বিকাশ তো রয়েছে ধর্মের মধ্যেই। ধর্ম বাদ দিলে কোন উন্নয়নই থাকে না।'

কথায় কথায় হিংসা ও অহিংসার কথা উঠলো। হিংসা বর্জন করে অহিংসার পথেই স্বাধীনতা অর্জনের সম্ভাব্যতার কথা উঠলো।

ঠাকুর বললেন, 'আমরা রোগকে হিংসা করবো— কিন্তু রোগীকে নয়। সেই রকম দোষকে হিংসা করতে পারি, কিন্তু দোষীকে হিংসা করতে পারি না। দোষীকে নির্দোষ করে তোলাই হবে আমাদের ব্রত। আমরা দোষের মূলোচ্ছেদ চাই— দোষীর সংশোধন চাই, তার মৃত্যু চাই না। আমরা মৃত্যুর মৃত্যু চাই।'

আর মানুষের ভালো করতে গেলে চাই— প্রীতিপূর্ণ শাসন, তোষণ, ধৈর্য, সহ্য, সেবা, অধ্যবসায় ইত্যাদি। যার ভালো করতে যাচ্ছি, তার মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে আত্মপ্রত্যয়, ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা এবং গুরুজনের প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা। প্রত্যেককে করে তুলতে হবে আত্মশোধনের কর্মী।

প্রকৃতি-জগতের দিকে তাকালেই দেখা যায়, সব কিছুর পিছনেই বিধাতার একটা মঙ্গল-সাধনের মতলব লুকিয়ে আছে। কোনখানে অমঙ্গলের বীজ বুনে দেওয়ার ধান্দা নেই। মৌমাছিদের ফুলে বসে মধু-সংগ্রহের স্বভাব দিয়েছেন, ফলে বৃক্ষ-লতা ফুলে-ফলে শোভাময় হয়ে অন্তিমে অন্যের প্রতি কল্যাণকর হয়ে উঠছে। প্রকৃতির এই বহু-বৈচিত্রের মধ্য দিয়ে পরমপিতার এই কল্যাণ-বৃত্তিই প্রকটিত হয়। তিনি যে স্বয়ং কত সুন্দর, তাঁর সৃষ্টির সহজ সৌন্দর্য কত কল্যাণবহ তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

এ সব ভাবলে তাঁর প্রতি আমাদের অসীম কৃতজ্ঞতা এবং বৃদ্ধি–বিকাশী প্রেম স্বতঃই হৃদয়কে আন্দোলিত করতে থাকবে। তিনি দয়াময়, পুষ্টিময় এবং জীবনময়— তাই তাঁর দয়াতে পুষ্টিতে এবং জীবনরসে আমরা সঞ্জীবিত হতে পেরেছি। প্রকৃতি-জগৎও তাঁর করুণা-ধারায় অভিসিঞ্চিত হয়ে, প্রাণীজগতের প্রতি কল্যাণ ও পুষ্টিময়তায় অফুরান যোগান দিয়ে চলেছে। এতেই বোঝা যায়, তাঁর প্রেমপ্রবৃত্তির শেষ নেই। তিনি অগণিত ধারায় অফুরন্ত মঙ্গলবারি বর্ষণ করেছেন। মানুষ ঘুমোয়, প্রকৃতিও ঝিমোয়, কিন্তু তিনি জেগেই থাকেন। কল্যাণের রাজ-মহলে আমাদের রেখে নিজে পাহারায় বসে আছেন ।

তিনি পরম পালনকারী বলেই আমাদের পাতকহারী পরমপিতা।

প্রভু, আমাদের মধ্যে তোমার বহুমুখী বিজয় নিরন্তর হয়ে থাকুক। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতে থাকলেই আমরা তোমার নিকটতর হতে থাকবো।

॥ ষোলো ॥

১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ৯ই মে রবিবার, সকাল থেকেই সূর্যগ্রহণ। গ্রহণকালে ঠাকুরের প্রস্রাবের বেগ এসেছে। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে একটা মত প্রচলিত আছে যে, চন্দ্র বা সূর্যের গ্রহণকালে পান-ভোজনও করতে নেই আবার পায়খানা-প্রস্রাবও করা চলে না। ঠাকুর হাতের কাছে বিজ্ঞব্যক্তি সুশীল বসু-মশাইকে দেখতে পেয়ে তাঁকে বললেন, 'সুশীলদা, ভালো করে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পাঁজিটা একবার দেখুন তো, ওতে গ্রহণকালে পায়খানা প্রস্রাব করা সম্বন্ধে কিছু লেখা আছে কিনা'।

সুশীল বসু ঠাকুরের কথায় বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা বেশ ভালো করে দেখলেন, কিন্তু এ-ব্যাপারে কোন শাস্ত্রীয় নির্দেশ খুঁজে পেলেন না।

দেখে এসে ঠাকুরকে তা জানালেন।

অত্যন্ত প্রস্রাবের বেগ অনুভূত ঠাকুর শেষ-পর্যন্ত প্রস্রাব করতে গেলেন। প্রথা মতো সদাসেবক প্যারী নন্দী গাড়ু-গামছা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গেলেন।

প্রস্রাব করে এসে বিছানায় বসে বললেন, আমার একটা স্বভাব হলো, প্রচলিত প্রথাগুলিকে ভালো করে বিচার করে ত্যাগ বা গ্রহণের সিদ্ধান্তে পৌছানো। ভালো করে কারণ না জেনে কোন চলতি প্রথা ভাঙ্গার পক্ষে আমার মন সায় দেয় না।

মন্তব্য শুনে ঋত্বিগাচার্য বললেন, তাহলে তো দেখা যাবে, অনেক-কিছু মানতে হচ্ছে।

'মানার প্রয়োজন তো জীবনের প্রয়োজন থেকেই'— প্রতিমন্তব্য করলেন ঠাকুর।

'গ্রহ বড় না ঠাকুর বড়— এই প্রশ্নটাই তো তা হলে এসে পড়ছে। প্রচলিত প্রথার রদবদল তো গুরু—ঠাকুরই করবেন— তাঁর বিচার মতো। আপনি যদি আবার নিজেই পঞ্জিকা দেখতে লোক পাঠান, তাহলে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায়?'

উত্তরে ঠাকুর বললেন, 'গ্রহ মানে প্রবৃত্তির অভিভূতি'। ব্যাখা করে বললেন, ধরুন একজন ইষ্টদেবকে ভালোবাসে, কিন্তু লোভের তাড়নায় অখাদ্য-কুখাদ্য খায়, এক্ষেত্রে তার ঠাকুরের প্রতি টানের চেয়ে লোভের টানই বেশি। ইষ্টের প্রতি টান অধিক হলে সে কিন্তু লোভের টানে পড়বে না। আর তার ফলে ভালো থাকবে। ইষ্টপ্রীতির দরুণ মানুষ এই রাস্তায় কল্যাণের অধিকারী হয়। এই কারণেই সত্তাকে সুস্থ রাখতে গেলে ইষ্টানুসৃতি এত জরুরি।

আরও যোগ করলেন, 'বহু ইষ্টপ্রাণ মানুষের সংহত প্রয়াসের ফলে সমাজে ইষ্টপ্রাণ মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি হতে পারে। অন্য রাস্তায় এটা সম্ভব নয়। আবার এই অর্জিত ফলটাকে ধরে রাখতে গেলে চাই সুবিবাহ ও সপ্রজনন। এন্তার দীক্ষা, দীক্ষান্তর সমষ্টিগত সেবাবুদ্ধি এবং বিধি সম্মত সুবিবাহ ও সুপ্রজনন— এইগুলির মাধ্যমে ব্যষ্টি ও সমষ্টির সর্বাত্মক উন্নয়ন সম্ভব। অন্যথায় কিছুই হবার নয়। আর নবদীক্ষিতদের চলার কায়দা সম্পর্কে বলেছেন, "উষা নিশায় মন্ত্র-সাধন, চলাফেরায় জপ। যথাসময়ে ইষ্টনিদেশ মূর্ত করাই তপ'— এইটুকু ধরে রাখতে পারলে অনেক কিছুই সহজ হয়ে আসে। এতেই বহুকাল কেটে যায়। ইষ্টধান্ধা প্রবল হলে অমঙ্গল-যোগকে মঙ্গল-যোগে পরিণত করার কায়দা পাওয়া যায়।'

সেবা-দেওয়া সম্বন্ধে কথা উঠেছে। ঠাকুর বললেন, 'সেবা এমন ভাবে দিও না যাতে সে পঙ্গু হয়ে পড়ে। ধরো তোমাকে কেউ ভাত রেঁধে খাওয়াচ্ছে— ঠিক আছে, এতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু তার ফলে রেঁধে খাওয়ার ব্যাপারে তুমি চিরতরে অক্ষম হয়ে গেলে, তাহলে তুমি আখেরে ক্ষতিগ্রস্তই হলে।'

তোমার সেবা যেন কারও সাবলম্বন বুদ্ধিকে হরণ না করে। যাকে সেবা দেবে, সে যেন পঙ্গু হয়ে না পড়ে।

একদিন উপনয়ন সম্বন্ধে কথা উঠেছে।

ঠাকুর বললেন, 'আমি বলি, আর্য দ্বিজদের প্রত্যেকেরই বিহিতভাবে উপনয়ন নেওয়া দরকার। না নিলে পিতৃপুরুষের সংস্কৃতির ধারাটা নষ্ট হয়ে যায়। ওতে হিন্দুর সর্বনাশ অবধারিত।'

গীতায় বলা আছে, 'তপস্যাহীন লোককে ভক্তিহীন মানুষকে শ্রবণে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে অথবা আমার প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ লোককে কখনো আমার কথা শুনাতে যেও না। এতে উভয় পক্ষেরই ক্ষতি হয়।'

তাই গুহ্যতম উপলব্ধির কথা যত্রতত্র বলতে নেই।

'ঐক্য' শব্দের যথার্থ অর্থ নিয়ে একবার আলোচনার সূত্রপাত করলেন কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মশাই।

উত্তরে ঠাকুর বললেন, সমাজ বৈচিত্র্য, ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্য ও রকমারিত্ব আছেই এবং থাকবেও। একতা মানে এই নয় যে, সব রকমারিত্ব মুছে গিয়ে একমেব-অদ্বিতীয় একটা কিছু মাত্র থাকবে। এক থেকে বহুত্ব এসেছে। এ বহুত্ব আর মুছে যাবার নয়। এই বহু আবার নিজ-নিজ বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব নিয়ে বিদ্যমান থাকবে। সব রকমারিত্ব মিশে গিয়ে একটা-কিছু কিম্ভূতকিমাকারিত্বে লুপ্ত হওয়া নয়। যে যার মতো সে তাই থাকবে। ঐক্য মানে, সব মানুষ নিজ-নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়েই এক আদর্শে গ্রথিত থাকা। যে যার সহজাত সংস্কার নিয়ে চলেও অভিন্ন আদর্শের পথে চলতে পারে। সেই অভিন্ন আদর্শ হলো দেহধারী জ্যান্ত কোন পূর্ণপুরুষ। তাঁর জীবনরীতি ও ক্রমবর্ধনার কৌশলই হবে তার অনুগত অনুসরণকারীদের অনুসরণীয়। ঐক্য মানে হলো ঐ একজনকে স্বীকার করে নিয়ে তাঁকে মেনে চলা।'

ভারতের বর্তমান দুরবস্থা থেকে ত্রাণের উপায় সম্পর্কে কথা উঠতে ঠাকুর বললেন, 'অন্তত পাঁচ কোটি আত্মোৎসৃষ্ট যুব শক্তির এক বিশাল স্বস্তি-বাহিনী যদি গড়ে তোলা যায়, তাহলে বোধ হয় সব দিক্ সামাল দেওয়া যায়।'

খবর পাওয়া গিয়েছে, হিমাইতপুর সৎসঙ্গ- আশ্রমে ফেলে আসা ঠাকুরের বড় আদরের 'বিশ্ববিজ্ঞানকেন্দ্র' পাকিস্তান সরকার টি,বি, হাসপাতালে পরিণত করছে। এই খবর শুনে ঠাকুর বড় দুঃখিত চিত্তে মন্তব্য করলেন, এ তো সৎসঙ্গের প্রতি একটা বিরাট অপমান। এ তো দুর্ব্যবহারের সামিল— পরম অন্যায় এবং অনিষ্টকর প্রতিহিংসা। আমরা ভালো ছাড়া খারাপ করতে চাইনি— এ তবে কিসের প্রতিহিংসা। এ বজ্জাতের ধান্ধা।

বিদেশী ভক্ত ফেন্- সাহেব এসেছে অনেক দিন পরে। তাকে দেখে ঠাকুরের যেন তার আশ মেটে না। তাকে দেখাটাই বেশ কিছুক্ষণ ধরে উপভোগ করলেন উৎফুল্ল ঠাকুর।

তারপর বিজ্ঞান-জগৎ এবং অনুভূতি-জগৎ সম্বন্ধে কথা উঠলো ভক্ত-সমাবেশে। বিজ্ঞান বিষয়ে সবচেয়ে মান্য এবং জ্ঞানী প্রশ্নকর্তা হলেন কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য। ঠাকুর বেশির ভাগ বিজ্ঞান প্রসঙ্গই আলোচনা করেন তাঁর দিকে তাকিয়ে।

একদিন কথায় কথায় বললেন, 'সত্য এক বই দুই হয় না আর এই সত্যকে জানার কোন শেষ নেই। সত্যকে যত নানা দিক থেকে বোঝা যায়— জানা যায় ততই জ্ঞান বাড়ে। দূরদৃষ্টিও তাকেই বলে। স্থূল থেকে তখন দৃষ্টি সূক্ষ্মের দিকে প্রসারিত হয়।'

এই সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর অস্তিত্বগুলির বৈজ্ঞানিক নাম আছে। বিজ্ঞানরসিক কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের কাছ থেকে এই সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর এবং অতিসূক্ষ্ম সত্তাণুগুলির ইংরাজি নাম জেনে নিতেন ঠাকুর। আবার সেই প্রসঙ্গে বলতেন, উনি এই সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবস্থানগুলি খালি চোখেই দেখতে পান— এর জন্যে কোন দৃষ্টিসহায়ক যন্ত্রের দরকার হয় না। মস্তিষ্ককোষে সব অবস্থাই ধরা পড়ে। একমাত্র সত্যনামই হলো ঐ অবস্থাসমূহ দেখার মাধ্যম। ঐ নামের মাধ্যমে আদি থেকে সবকিছুই অনুভূত হয়। দেখাটা আসে বাইরে থেকে ভিতরের দিকে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন পরিধি নেই, এ নিত্য সম্প্রসারণশীল। কিন্তু এর কেন্দ্রবিন্দু আছে। সেই কেন্দ্রে আছেন নাম। সন্তমতবাদে বলা আছে, কেন্দ্র বিন্দুতে সেই মহানাম বা

আদিবীজ-ধ্বনি নিঃসৃত হচ্ছে পরমপিতার চরণ যুগল থেকে। এর থেকেই অনুমান করতে হবে পরমপিতার অবস্থান, তাঁর মাহাত্ম্য এবং বিশেষত্ব। এই পরমপিতাই যুগে-যুগে লোকত্রাণের উদ্দেশ্য নিয়ে নরাকারে মর্ত্যে আসেন করুণা করে। এটা তাঁর লীলা।

আদিধ্বনি বা বীজ-নাম থেকে সৃষ্টির প্রথম উচ্ছ্বাস এবং সেই নাম কেন্দ্রই নিরন্তর চলেছে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় বিস্তৃততর হতে হতে। এই প্রক্রিয়ার আদির কালও বলা যায় এবং এর অন্ত নেই বলে এর শেষাবস্থা কেমন তাও বলা যায় না। এইটুকু মাত্র বলা যায় না, এই প্রক্রিয়ার যাত্রারম্ভ হয়েছে বীজনাম থেকে এবং ব্যাপন- বিস্তারই এর ধর্ম।

ঠাকুর অনুকুলচন্দ্র প্রথম থেকে বর্তমান পর্যন্ত দেখতেন। বর্তমান থেকে ভবিষ্যতেরও ইঙ্গিত পেতেন। তাই, তিনি ছিলেন সর্বজ্ঞ। আর মজার কথা হচ্ছে এই যে তিনি নিজে সর্বজ্ঞ অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শী হয়েই ক্ষান্ত থাকেন নি, সকল মানুষকে তার বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে ব্রহ্মদর্শী বা ব্রহ্মস্বরূপ হওয়ার মরকোচও বাতলে দিতেন। ব্রহ্মদর্শীর অনুগত ছাত্রও ব্রহ্মজ্ঞ হবেন— এটাই ছিল তাঁর শিক্ষাব্যবস্থা।

মূল কথা হলো, যিনি স্বয়ং ব্রহ্ম, তাঁকে ধরে আপোষহীন চলনায় তাঁর পথে চলে ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া যায়। এ ছাড়া ব্রহ্ম–লাভের অন্য পথ নেই।

এ যুগে শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সেই সাক্ষাৎ ব্রহ্মমূর্তি। তাঁকে ধরলে আর ভয় নেই, ভব-সমুদ্রে সাঁতার কেটে ব্রহ্মসামীপ্যে পৌঁছে যাওয়া তোমার কাছে তেমন কোন ব্যাপারই নয়।

তিনি নিজেই করুণার হাওয়া, তোমাকে শুধু একটু পাল তুলে দিতে হবে। তিনি তাঁর কাছে তোমাকে টেনে নেবেন। সেই নামধামে পৌঁছানোর জন্যে তোমার জীবন-তরীর নামানো পাল এবার খাটিয়ে দাও!

॥ সতেরো ॥

১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসের মধ্যভাগ। একদিন কথা প্রসঙ্গে বললেন, 'ঋত্বিকের সম্মান যে কত! একজন ঋত্বিকের সম্মান একজন জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের থেকেও বেশি। তার জন্যে ঋত্বিকের তেমন সেবা–অবদান থাকা চাই। মানুষকে সব দিক্ দিয়ে বড় করে তোলাই হবে ঋত্বিকের কাজ। সে সর্বজন–শ্রদ্ধেয় না হয়ে পারে? যে-ঋত্বিক এক তুড়িতে মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য উড়িয়ে দিতে পারে, সেই হলো ঋত্বিকদেবতা। এর উপরে আর কাজ আছে?

একটু থেমে পুনরায় বললেন, 'পারিবারিক সৎসঙ্গেরও নিত্য প্রয়োজন আছে। আমাদের কাজ হবে, নির্দিষ্ট দিনের কোন নির্দিষ্ট সময়ে পরিবারের সকলে সমবেত হয়ে সৎসঙ্গের মতো অনুষ্ঠান করা, তাতে যেমন ঠাকুরের বিষয়ে আলোচনা হবে, তেমনি আবার পারিবারিক নানা সমস্যাদির পর্য্যালোচনা করে সেগুলির নিষ্পত্তিও করা যাবে। এটা একটা দরকারী জিনিস। এতে বাড়ির লোকদের আন্তরিক সঙ্গও যেমন পাওয়া যায়, তেমনি খোলা মনে ইষ্টচর্চ্চাও হয়। আবার কোন আভ্যন্তরীণ সমস্যা থাকলে তারও একটা হৃদ্যমীমাংসায় পৌছানো যায়। এই রকম পারিবারিক অধিবেশন আমার খুব ভালো লাগে।'

বললেন, 'আমার নিজের জীবনে এই শুভ সুযোগ বড় একটা পাই না। নিজের বউয়ের সঙ্গে মেলামেশা বা আলোচনা বড় একটা হয় না। আমার জীবনটা পাবলিকের জন্যে। এখানে আর কিছু করার নেই।'

পারিবারিক সৎসঙ্গ ও মেলামেশার প্রথা চালু করতে পারলে পরস্পরের মধ্যে আন্তরিকতা অনেক বাড়ে এবং একজনের উপলব্ধির সঙ্গে আর একজনের উপলব্ধির তুলনামূলক আলোচনারও সুযোগ ঘটে। আমরা নামধ্যান করি কেন, মাছ মাংস খাই না কেন, একজনের সেবায় অন্যজন এগিয়ে যাবো কেন প্রভৃতি দিকগুলিও পরিষ্কার হয়। মোট কথা, একটা নিবিড় নৈকট্য আমাদের গার্হস্থ্য-সম্পর্ককে আরও সংহত করে তোলে।

আবার এই পারিবারিক সম্মেলন হলে তাতে একজন মুরুব্বিও প্রধানের আসনে বসার সুযোগ পান। তার ফলে পরিবাররূপ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটিরও একজন স্বাভাবিক রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে যান।

একদিন স্বস্ত্যয়নীব্রত-পালনের উপকার বা লাভ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করে বুঝাচ্ছিলেন। বলছিলেন স্বস্ত্যয়নীর নীতি পাঁচটি নিখুঁত ভাবে পালতে হবে। প্রথম কথা হলো, শরীরকে শ্রীবিগ্রহের মন্দির ভেবে তার যত্ন করতে হবে। দেহকে সর্বপ্রযত্নে সুস্থ সহনপটু এবং কর্মতৎপর অবস্থায় রাখতে হবে। দ্বিতীয় পাল্য বিধান হলো মনের মধ্যে যখনই কোন অশুভ বৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইবে তখনই তাকে ইষ্টস্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তৃতীয় বিধান হলো, যে কাজ ভালো বলে মনে হবে, তা তৎক্ষণাৎ করে ফেলার উদ্যোগ নিতে হবে। চতুর্থ হলো, নিজের জীবন ও বর্ধনের স্বার্থে পারিপার্শ্বিকের সেবা ও উদ্বর্ধন সাধন করে যেতে হবে। পঞ্চম বিধান হলো নিজের সামর্থ্য ও অর্জনপটুতাকে বাড়িয়ে তুলে তা থেকে অর্থার্ঘ্য নিবেদন করে যেতে হবে।

এই বিধানগুলো যথাযথভাবে পালন করতে থাকলে মানুষের কর্মশক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং সুস্থ–সবল শরীরে বহুদিন পরিবেশ ও পরিবেষ্টনীর পরিচর্যা করে সপরিপার্শ্ব সেবাক্ষম থাকতে পারে। এটাই তো সমষ্টিগত মঙ্গলের রাস্তা। স্বস্ত্যয়নীর তাই অকল্প্য এ বিশাল ক্ষমতা।

বিধি হিসাবে বললেন, স্বস্ত্যয়নীতে নিবেদিত অর্থ থেকে তিরিশ দিনের দিন তিন টাকা ইষ্টসকাশে পাঠাতে হবে এবং বাকি অর্থ স্বস্ত্যয়নী ফান্ডে জমা রাখতে হবে। এই ভাবে স্বস্ত্যয়নী ফান্ড বাড়তে থাকবে। মোটামুটি বেড়ে গেলে সেটা কোন অর্থকরী কাজে লগ্নী করা যাবে। স্বস্ত্যয়নী-ব্রতধারী ব্যক্তি ঐ লগ্নীর লভ্যাংশ থেকে এক-পঞ্চমাংশ নিজস্ব বোনাস হিসাবে নেবে। এই লভ্যাংশ যত বাড়বে ব্রতধারী ব্যক্তিও ততই বর্ধিত বোনাস পেতে থাকবে। এই পদ্ধতির কারবার কখনো ফেল মারবে না। বরং এর লভ্যাংশের ব্যাপারে একটা নিশ্চিতির গ্যারান্টি থাকছেই। স্বস্ত্যয়নী-ব্রতধারীদের যেখানে যত ফান্ড একাউন্ট খোলা হবে, সেগুলিকে নিয়ে সমবায়ের ভিত্তিতে বিশেষ লাভজনক কোন প্রকল্পের কথাও মাথায় রাখা যাবে। সবটাই ইষ্টের স্বার্থে নিয়োজিত হচ্ছে— এই চিন্তা মাথায় রাখলে অর্থের নয়-ছয় হবার সম্ভাবনা থাকবে না। সমাজভিত্তিক স্বস্ত্যয়নী প্রকল্প তাই একটি গ্যারান্টিযুক্ত লগ্নীকরণ ব্যবস্থা।

একদিন বললেন, 'ললাটে যাই লেখা থাক, তাই নিয়েই যদি কেউ পুরোপুরি ইষ্টার্থী হয়, তবে অসম্ভবও সম্ভব হয়।'

একদিন মারাত্মক ক্যানসার রোগ সম্বন্ধে কথা উঠলো। গুণভক্ত শরৎ হালদার বললেন, একজনের ক্যানসার হওয়ায় আপনি আমাকে বলেছিলেন স্বস্ত্যয়নী-পূজোর ফুল দিয়ে তাকে কবচ করে দিতে। আমি তাই করে দিয়েছিলাম এবং সে-ব্যক্তি তাতেই আরোগ্যলাভ করেছিল।

ঠাকুর বললেন, 'ওটা কিন্তু ক্যানসারের ওষুধ হিসাবে বলিনি। মানুষটাকে দেখে আমার ঐ ব্যবস্থার কথা মনে এসেছিল, তাই বলেছিলাম। এটা একটা দৈবযোগ। আসল কথা হলো, এই দুরারোগ্য রোগের ঔষধ আবিষ্কার হওয়া উচিত।'

ঠাকুর একবার বলেছিলেন, 'করণীয় কাজ সময়মতো না করলে মানুষ রোগের কবলে পড়ে।'

সেই কথার প্রসঙ্গে অধ্যাপক শরৎ হালদার- মশাই প্রশ্ন করলেন, 'করণীয় কর্ম সময়মতো না করার সঙ্গে রোগে পড়ার সম্পর্কটা কেমন করে আসে।'

'আসলে কর্তব্য কর্ম সময়মতো না করার ফলে জীবন সম্বেগ কমে যায়। দেহের স্নায়ু ও কোষসমূহের প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।'

একদিন কথা উঠলো 'রাজনৈতিক নেতারা কেমন হলে দেশের সর্বাত্মক উন্নতি সম্ভব হয়।'

উত্তরে ঠাকুর বললেন, 'ইষ্ট বা গুরু না থাকলে কারও সম্পর্কে তো নেতা হবার কথাই আসে না। নেতা মানেই তো সমর্পিত সত্তা।'

কথা উঠেছে, দ্বিজ কে। দ্বিজত্ব-অর্জন মানেই বা কী।

ঠাকুর উত্তরে বললেন, 'সদ্‌গুরুকে ধরে তাঁর নির্দেশমতো চললে মানুষ নতুন জন্মলাভ করে। এইটাই দ্বিজত্ব লাভ। তখন আগেকার কুসংস্কারগুলি ইষ্ট-চলনায় নিয়ন্ত্রিত হয়ে নতুন জীবনবেগ লাভ করে। এই ভাবে তার ইষ্ট সংস্কার ঘটে এবং ইষ্টের মনের মতো হয়ে নতুন জন্মলাভ করে। এটাই দ্বিজত্ব। দীর্ঘকাল ধরে একই বর্ণের ক্রিয়া-কলাপ অনুশীলন করে চলার ফলে একটি বংশধারার মধ্যে সেই কর্মগত বৈশিষ্ট্য স্থিতিলাভ করতে থাকে। আগ্রহ ও নৈপুণ্যের তারতম্যের ফলে বিশেষ বর্ণের গুণাবলী সংস্কারে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে সময়ের হেরফের হতেই পারে। কোন গোষ্ঠীর বা বর্ণপ্রাপ্তি ত্বরান্বিত হয়, আবার কোন গোষ্ঠীর পক্ষে সময় বেশি লাগে।

প্রশ্ন হলো— আত্মার কি বর্ণ আছে।

উত্তর হলো— পরমাত্মার কোন বর্ণ নেই। জন্মের পরে বর্ণ। বিশেষ সত্তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেইতো তার বর্ণের প্রকাশ ঘটায়। বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠার আগে তো বর্ণবিভাজনের প্রশ্ন আসে না। তখন সবই অভিন্ন পরপুরুষ সত্তা। বা বলা যায়— আদি বীজের ধ্বনি প্রকাশ। তাকেই বলা হয়েছে অচ্ছেদ্যবর্ণ। তখন কোন বর্ণ থেকে কোন বর্ণকে আলাদা করে অনুভব করা যায় না।

অন্য প্রসঙ্গে আসা যাক। একবার ঋত্বিগাচার্য কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য শরৎ হালদার- মশাই সম্পর্কে বললেন , 'শরৎদা যে এত ঘুরছেন, তা ওঁর শরীর কিন্তু ঠিক আছে— কোন ব্যত্যয় ঘটেনি।'

ঠাকুর এই মন্তব্য শুনে বললেন, 'খবর নিয়ে দেখা গেছে যারা ঠিকমতো যাজনকর্ম নিয়ে ঘোরে, যজন তো তাদের হতেই থাকে, উপরন্তু তাদের শরীর-স্বাস্থ্য বেশ ভালোই থাকে। ইষ্টকর্মে ভাটা এলে যে যখন ঘরবন্দী হয়ে থাকে,

তখন সেই ভুগতে থাকে। বাইরে থেকে যজন-যাজনে যখন আবার এন্তার হয়ে আসে তখন শরীর-মনেও ফুর্তি পায় অসাধারণ রকমের। যজন-যাজনের চেয়ে সত্যিই বড় ডাক্তার আর নেই— দেহ ও মনের চিকিৎসার জন্যে। করে গেলেই বুঝতি পারবা, এ কৈসান চিজ।'

একদিন ঋত্বিগাচার্য খবরের কাগজ থেকে 'হিন্দুকোড বিল' সম্পর্কে এক লেখকের প্রতিবাদ-পত্রটি ঠাকুরকে পড়ে শোনালেন। ঠাকুর শুনে বললেন, 'কিছু সমাজসচেতন হিন্দু তাহলে এখনো আছে— এই যা ভরসা।'

আইন করে হিন্দু-সমাজের অধঃপতনের রাস্তা খুলে দেওয়া হচ্ছে। যে যাকে ইচ্ছে বিয়ে করতে পারবে— অনুলোম প্রতিলোমের বিচার থাকবে না, বিবাহ-বিচ্ছেদও করা যাবে সহজে—এমনটি হয়ে গেলেই তো জাতির পতন নাটক ক্রোড়াঙ্ক সুদ্ধ শেষ হয়।

একদিন বললেন, 'মনের গ্রন্থিগুলির নয় রকম বুদ্ধি' এইগুলিই নবগ্রহ। এক-এক সময়ে এক-এক গ্রহের পাল্লা ভারি হয়, তখন সেই গ্রহ অর্থাৎ প্রবৃত্তি মানুষকে বেশকরে নাকানি চোবানি খাওয়ায়। আমরা এইটাকেই বলি, 'গ্রহের ফের।'

সে দিনটা ইংরাজি ১৯৪৮ সালের একুশে জুলাই বুধবার। ঠাকুর বিকেল বেলায় বড়াল বাংলোর বারান্দায় তক্তপোষে শুভ্র শয্যায় উপবিষ্ট, ভক্তগণ-পরিবেষ্টিত হয়ে।

এটা-সেটা কথাবার্তার পর হঠাৎ এক সময়ে বললেন,' গোরক্ষ নাথকেই নাথ-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যে সবগুলি বর্ণই আছে। সব নাথ একরকম নয়।'

এই প্রসঙ্গে বিবাহ-ব্যাপারে বললেন, 'অনুলোমক্রমে বিহিতভাবে বাইরের অহিন্দু সমাজ থেকে মেয়ে আনা যায়। কিন্তু যত্রতত্র মেয়ে দেওয়া যায় না।'

কোন মন্ত্রোচ্চারণের সময়ে খুশিমতো ওঁ-টা উচ্চারণ করা ঠিক নয়— এই প্রসঙ্গে কথা উঠলো। কারণ ওঁ-টা বীজমন্ত্র। বীজমন্ত্র যত্রতত্র প্রকাশ্যে খেয়াল খুশিমতো ব্যবহার করা ঠিক নয়। এক ভক্ত এই কথার জের টেনে বললেন, 'আমরাও তো নামগান করে যেখানে সেখানে বীজমন্ত্র প্রকাশ্যে পরিবেশন করে থাকি।'

উত্তরে ঠাকুর বললেন, 'আমার নিষেধ করা ছিল, কিন্তু ঠেকানো যায়নি।'

এক বিশিষ্ট ভক্তের প্রশ্ন—'আপনি তো খুব অল্পবয়সে দীক্ষা দেবার কথা বলেছেন— সে সব ক্ষেত্রেও তো নানারকমের অসাবধানতা এসে পড়তে পারে।'

ঠাকুর বললেন, 'আনুষ্ঠানিক দীক্ষা দেবার মতো করে ঐ শিশুকালীন দীক্ষা দেবার কথা আমি বলিনি— ওদের শুধু নামটা বলে দিতে বলেছি। বড় হয়ে আবার অনুষ্ঠান করে দীক্ষা নিয়ে নিয়মমতো নামধ্যান করবে। সদাচার এবং ইষ্টভৃতির অভ্যাসটা শৈশব কাল থেকেই রপ্ত করিয়ে দেবার জন্যে ঐ বিধান দিয়েছিলাম।'

তখনকার সব কথাই তো বৈদ্যনাথ ধামে বসে। তাই কথাচ্ছলে একদিন ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন—'আচ্ছা এই যে বাবা বৈদ্যনাথের ধামে আছি, এই বৈদ্যনাথ শব্দের মানে কী?'

এক ভক্ত বললেন 'বৈদ্যনাথ মানে শিব।'

ঠাকুর বললেন,'বৈদ্য শব্দের মানে আমি বুঝি— যিনি জানেন। বৈদ্যনাথ মানে জ্ঞানীদের মধ্যে বিশিষ্টতম। তাঁকে জানলে— তাঁর চলনে চললে মানুষের অজ্ঞান-অন্ধকার ঘোচে, তখন সে জানার ভিতর দিয়ে চলে এবং বিজ্ঞান মেনে পা ফেলার ফলে নিরাময়ের অধিকারী হয়— শরীর ও মনের দিক দিয়ে সুস্থ হয়ে ওঠে। তাই, বাবা বৈদ্যনাথের আরাধনা করে—তাঁর ধর্ণা নিয়ে অর্থাৎ তাঁকে বেশ করে আঁকড়ে ধরে চলে।'

ঐ জুলাই মাসেরই ২৩ তারিখের ঘটনা।

মানুষের বসত বাড়িগুলি কেমন হবে। সেই সম্পর্কে বললেন-'প্রত্যেকটা বাড়িতে থাক চাই— তার বাইরের ঘর বা বৈঠকখানা, একটা ছোট লাইব্রেরি, একটা ল্যাবেরেটরি, একটা কামারশালা, একটা কাঠের কাজের ছুতোরের ঘর, একটা থাকবে মেশিনশপ— যেখানে থাকবে একটা লেদ, একটা বোরিং মেশিন, একটা ড্রিলহাতুড়ি, বাটালি ও কিছু সাধারণ যন্ত্রপাতি। যাতে করে সামান্য একটা কাজের জন্যে মিস্ত্রির কাছে ছুটতে না হয়। আর এ-সব বাড়ির ছেলেমেয়েদেরই শিখে নিতে হবে। উদ্দেশ্য হলো, স্বনির্ভর হয়ে চলা। আর চাই— চার-পাঁচ জন অতিথির রাত্রি বাসের জন্যে প্রয়োজনীয় ঘর ও বিছানাপত্র। আবার তাদের মধ্যে বাড়ির কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের জন্য ৫/৬ শয্যার একটা রোগীকক্ষ রাখতে

হবে। বাচ্চাদের পড়ার ঘর রাখতে হবে। আরও রাখতে হবে ছোটখাটো একটি কৃষি-উদ্যান, গোশালা, গার্হস্থ্য শিল্পোদ্যোগের ঘর এবং ঠাকুর ঘর, গল্পগুজবের ঘর প্রভৃতি। সময়ে সময়ে আত্মীয়-কুটম্বরাও এসে থাকতে পারে সে উদ্দেশ্যে ৩/৪ জনের বাসোপযোগী একটা নির্দিষ্ট ডর্মিটরি। এমন ভাবে সব ব্যবস্থা থাকবে যাতে সবারই মেলামেশার সুযোগ থাকে, হস্তশিল্পাদির চর্চার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রমোদশিল্পের চর্চা থাকে।

মোট কথা হলো, একটা বাড়ি হলো একটা প্রতিষ্ঠান। কৃষি-প্রযুক্তি শিল্পচর্চা, বিজ্ঞান-গবেষণা, কৃষ্টি-বিষয়ক সভা-সমাবেশ প্রভৃতির সব কিছুর ব্যবস্থা থাকবে একটা বংশধারার ভদ্রাসনে। এক-একটা ভদ্রাসনে আবার বংশক্রমের বৈশিষ্ট্যের মিউজিয়মও থাকা দরকার— যদি তেমনতর থেকে থাকে এখানে বংশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যবহৃত বিশেষ বিশেষ দ্রব্যাদি সংরক্ষিত থাকবে একটা প্রদর্শনীর মতো।

গৃহটা বংশবৈশিষ্ট্যের দ্যোতক হবেই। একটা গৃহ হলো,একটা পরিকল্পিত শিক্ষা কেন্দ্র। গৃহ শুধু পরিশ্রান্ত দেহের বিশ্রামস্থান এবং আহারাদি ও শৌচকর্মাদির স্থান মাত্র নয়। গৃহের ভিতরে থাকে গৃহবাসীদের মনের ছাপ এবং অন্য গৃহাগত মানুষেরও চিন্তার খোরাক। সেই জন্যই প্রতিটি সুব্যবস্থিত গৃহই একটি স্বয়ংপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, গৃহবাসীদের তো বটেই আশপাশের গৃহীদেরও অনেক অনেক ছোটখাট প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম থাকবে একটি মনের মতো সুগৃহ। গৃহ হলো গৃহবাসীদের স্বচালিত বিদ্যালয়। গৃহের প্রত্যেকটি লোক গৃহের স্বাস্থ্যসেনা। গৃহের এবং গৃহের আশপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে তারা।

॥ আঠারো ॥

বর্ণবৈষম্য হলো সৃষ্টিকর্তার লীলা। তাঁর কল্পলোকে যে বাসনা ছিল, তাই বিভাজিত হয়েছে চার রকম বর্ণের মধ্য দিয়ে। সবই একটি মাত্র ইচ্ছার মুহূর্তে জন্ম নিলে সবটাই এক বর্ণের হতো। চারটি বর্ণ তাই এক বা অভিন্ন লগ্নের সৃষ্টি নয়। এক এক গুণের বা বর্ণের আগমন এক-এক সময়ে— তৎকালিক এবং তদনুপাতিক প্রজনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। নির্দিষ্ট এক মুহূর্তের ঘটনা হলে একের অধিক বর্ণবিভাজন সম্ভব হতো না। সবই তাঁর ইচ্ছা মতো ভিন্ন ভিন্ন লগ্নের জাতক থেকে উদ্ভূত। এরা সব ভিন্ন ভিন্ন লগ্নের ভিন্ন ভিন্ন মানসিকতার প্রবণতার বাহক।

চারবর্ণের সৃষ্টিকর্তা হলেন ব্রহ্মা। মানুষ হলো ব্রহ্মার মানসপুত্র। ব্রহ্মার কল্পনার মধ্যে যেমন ছিল, জৈব প্রজননের নিয়ম মেনে তিনি তেমন প্রক্রিয়ায় তাকে মূর্তি দিলেন। তাই বলতে হবে, ব্রহ্মার মধ্যে যেমন ছিল মূর্ত হবার বাসনা, তেমনি ছিল বিজ্ঞান মেনে তাকে রূপ দেবার মাল-মসলা। ব্রহ্মার মধ্যে ছিল তাই বহুরূপে বিবর্তিত হবার বাসনা এবং সেই বাসনা-অনুযায়ী রূপপরিগ্রহণের ক্ষমতা ও উপাদান সমূহ। তাঁর কল্পনার সঙ্গে ছিল জীবাত্মার আত্মপ্রকাশের সম্বেগ ও উপকরণ নিচয়। তিনিই ছিলেন ইচ্ছা এবং তিনিই ছিলেন প্রকরণকর্তা।

বলা যায়, আদিতে একটাই প্রবণতা ছিল— বহু বিভাজনের। বিভাজন কালে বর্ণানুক্রমিক প্রবণতা মূর্ত হতে থাকে। এই ভাবেই এক থেকে বহুর সম্ভাবনা মূর্ত হয়েছে এবং বর্ণগুচ্ছেরও সৃষ্টি হয়েছে।

মূল জৈব উপাদান একটা ছিলই। সূর্যের আলোরশ্মি যে জৈব উপাদান যে রকম ভাবে গ্রহণ করে যেমন ভাবে পুষ্টি লাভ করলো তেমনি রকমারিত্ব নিয়ে সে তেমনি সত্তায় আত্মপ্রকাশ করলো। মূল জৈব শক্তি নানারূপ প্রক্রিয়ায় সূর্যকিরণ শোষণ করে নানারূপে বিকশিত হয়ে উঠলো। বৈচিত্র্যের সৃষ্টি এই ভাবেই, বর্ণবৈচিত্র্যের মূল কারণও এ-ই।

আদি জৈবশক্তির এক এক গুচ্ছ এক-এক দূরত্ব ও এক-এক রঙের রশ্মি আত্মসাৎ করে এক-এক জীবকোষে পরিণত হলো। জীবশক্তির বহুত্বের সম্ভাবনার সূচনা এই ভাবেই। সবটাই আলোড়ন, বিলোড়ন, ধাক্কা-ধাক্কি এবং আত্মীকরণের ফল থেকে জাত হয়েছে।

একজনের প্রশ্ন— মানুষের বর্তমান জীবন তো শুনি তার পূর্বকর্মফলেরই জের। তাহলে পুরুষকারের স্থান কোথায়। তার আত্মোন্নয়নই বা সম্ভব কোন্ পথে?

'হ্যাঁ, জীবন পূর্বকর্মফলের জের ঠিকই, কিন্তু জীবন তো থেমে নেই। সদ্‌গুরু ধরে চলে চলে সংস্কার পালটাতে হয়। সদ্‌গুরু ধরে চলার ফলে নতুন জন্ম হয়— দ্বিজত্ব আসে।'

চলা-ফেরায় জপের কথা এল একদিন। সেদিন জিজ্ঞেস করলেন একজন— 'কিন্তু চলাফেরার সময়ে তো ধ্যান ঠিক মতো হয় না। জপের সঙ্গে ধ্যানটাও তো ঠিকমতো চাই।'

উত্তরে ঠাকুর বললেন– 'যতটুকু হয়, তাতেই হয়। একেবারেই হয় না— এমন কথা ঠিক না। শিস দিতে দিতে কিছু ভাবতে-ভাবতে, গান করতে-করতে রাস্তা চলা যায় তো। চলা-ফেরায় জপের ফল কিন্তু সুদূরপ্রসারী— ঘুমের মধ্যেও তার ফল বোঝা যায়। ও বড় দারুণ চিজ!'

ঐ প্রসঙ্গে বলেছেন –'আমি তো টের পাই, তিনি আমাকে প্রতিপদক্ষেপে হাত ধরে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন।'

শরৎ হালদার-মশাই একদিন জিজ্ঞেস করলেন– 'এক বৈজ্ঞানিক বলেছেন— সূর্য ধীরে ধীরে মরে যাচ্ছে, এ কথাটা কি ঠিক?'

ঠাকুর উত্তরে বললেন, 'পৃথিবীটাও তো একদিন সূর্যের অঙ্গীভূত ছিল। এই সূর্যটা হয়তো কোন দিন একটা গ্রহে পরিণত হবে এবং অন্য এক সূর্যের প্রদক্ষিণ করবে। তিনি ইচ্ছে করলে সবই হতে পারে। তাঁর লীলার কি অন্ত আছে। তবে, বিজ্ঞান মেনেই সব-কিছু হতে হবে। পরমপিতা এবং বিজ্ঞান তো অভিন্ন। তাঁর চিন্তা, ইচ্ছা এবং প্রক্রিয়া সবই তো বিজ্ঞান। এর মধ্যে বিধি-না-মানা বলে কিছু থাকতে পারে না। একই গাছে লাল জবা এবং সাদা জবা যে ফুটেছিল, তাও বিজ্ঞান বিধি না-মেনে নয় কিন্তু। তাঁর ইচ্ছায় সেখানে সেই বিধি অনুসারেই তা হয়েছিল। তাঁর ইচ্ছাও একটা নিয়মের মধ্য দিয়েই হয়। তিনি তো বিধানেরই বিগ্রহ। তাঁর করুণাও বিধান মেনেই আসে। কী বিচিত্র লীলা তাঁর দ্যাখো!'

প্রশ্ন উঠেছে— 'প্রাণী কি সকল গ্রহ বা জ্যোতিষ্কের মধ্যেই আছে?'

উত্তর দিলেন— 'যার মধ্যে প্রাণ আছে, সেই যদি প্রাণী হয়, তবে আমি তো দেখি প্রাণী সর্বত্রই বিদ্যামান— তার-তার মতো করে। আমি তো দেখি, ধূলিকণাটাও প্রাণময়। এর ব্যতিক্রম সম্ভব নয়।'

ঠাকুরের সুখ বলতে লোকের কল্যাণ। সকলে ভালো আছে, ভলো করছে এই খবর শুনলে সব চেয়ে সুখী হন এবং তাঁর শিষ্য-কর্মিগণ যতই মানুষের সুখ-সমৃদ্ধির কারণ হয়ে উঠতে পারে, ততই তিনি খুশি হন— সুখী হন। এই ব্যাপারে তিনি ছিলেন দ্রুততার পক্ষপাতী। ঢিলেমি একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না।

একদিন বললেন, পরমপিতার কর্মী আছেই— তাকে খুঁজে বের করা লাগে। ঐ দায়িত্বই তো তোমাদের সকলের।

এক সময়ে উন্মনা হয়ে বলতে লাগলেন— 'আমার মনে হয়, আমি চেষ্টা করলে একজন প্রথম শ্রেণীর ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, ব্যারিষ্টার বা অন্য-কিছু হতে পারতাম। হয়তো খুব নাম হতো। কত জিনিসের ভাবনা যে আমাকে পেয়ে বসতো, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। এখন শরীর খারাপ। শক্তি নেই। তবে আমার বরাবরের একটা ধরণ হলো— নিজের জন্যে কিছু করতে পারি না। নিজে যেন সব সময়ে ফতুর। অপরকে বড় করে তুলতে পারলে, অপরের ভালো হলে ভাবতাম, একটা কিছু করতে পারলাম। আদত কথা হলো, সবার মধ্যে যেন আমি বিদ্যমান। সবাইকে নিয়ে যেন আমি। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডকে যেন আমি আমার এই দেহে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি।'

আনমনা হয়ে বসে থাকতে থাকতে আসল আপ্ত–কথাটি শ্রীমুখ থেকে নিসৃত হয়ে এলো। মানুষের কী ভাগ্য! এটা বলার জন্যে মানুষের তো কোন চাপ ছিল না।

একজন অভাবের তাড়নায় ইষ্টভৃতি বন্ধ করে দিয়েছে। শুনে বললেন, "সর্বনেশে কাম করিছিস। ঐ জায়গায় গোলমাল হ'লি অস্তিত্বই টালমাটাল হয়ে যাবিনি। তখন আর যুঝবি কী নিয়ে। মনে রাখা চাই— 'যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি করলে কাটে মহাভীতি।' মনে রাখবি, 'ইষ্টভৃতির বিধান পরমপিতার এক বিশেষ দয়ার দান।' আরও বললেন, 'মনে রাখবি ইষ্টভৃতিই আমাদের বাঁচিয়ে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে'।"

একদিন বিকালে বর্ষাকালে রোহিণী রোড ধরে সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'ঈশ্বরকে নিয়েই যে কত রকম মতবাদ আছে! কেউ বলে ঈশ্বর আছেই, কেউ বলে ঈশ্বর অসিদ্ধ, কেউ বলে তিনি অজ্ঞেয়—তাঁকে জানা ভার। জ্ঞেয়বাদ, অজ্ঞেয়বাদ ইত্যাদি কত রকম বাদ আছে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে। কিন্তু এই সব মতবাদের মীমাংসা হয়েছে 'বাসুদেব'-এ এসে। তিনি ব্রহ্ম ও আত্মার চেতন বিগ্রহ।'

বললেন, 'পুরুষোত্তমই সব-কিছুর সমাধান-মূর্তি। বসুদেব-দেবকীর পুত্র বাসুদেবই সাকার ঈশ্বর। বাসুদেব কথার মধ্যে রয়েছে ঐ বাপ মায়ের ঘরে আগত নরদেহধারী ঈশ্বর-বিগ্রহের কথা। মানুষের মতো হয়ে আসেন মানুষের ঘরে— মানুষের যোগ্য হয়ে।

'ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করে।' বলেছেন ঠাকুর।

আবার এও বলেছেন—'ধার্মিক লোক যদি অযথা দুষ্ট লোকের দ্বারা বিধ্বস্তও হয়, তবে সেক্ষেত্রেও শেষ পর্যন্ত ধর্মই জয়যুক্ত হয় এবং ধর্মেরই প্রতিষ্ঠা হয়। কারণ, যে মানুষটির মধ্যে ধর্ম জীয়ন্ত, তাকে কেন্দ্র করে আবার সেখানে ধর্ম মাথাচাড়া দিয়ে জেগে উঠবেই।'

পুরুষোত্তম কৃষ্ণের কথা— 'মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎ-প্রসাদাৎ তরিষ্যসি। অথ চেৎ ত্বমহংকারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষসি ॥'

বললেন 'এটা অকাট্য বিধি। এই রকম হতেই হবে।'

এসবই দেওঘরে বসে বলা। বলেছেন, 'এখন এখানেই নতুন করে আশ্রম গড়ে তোলার জন্য সমবেত ভাবে যত্নবান হও। যে সব সৎসঙ্গী পরিবার এখানে চলে এসেছে, তারা সকলে দানা বেঁধে থাকুক, একটা যৌথ পরিবারের মনোভাব নিয়ে সবাই সকলের প্রতি সেবাপ্রবণ হয়ে ইষ্টকর্মে মেতে উঠুক। তবে এখানে এসে এর মধ্য দিয়েও কিছুটা হবে। আর যারা স্থানীয় মানুষ— প্রতিবেশী, তাদের সঙ্গে বান্ধব-সুলভ আচরণে তাদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা অর্জন করতে হবে। এখানেই সকলের সহযোগিতা ও সহানুভূতিতে নতুন করে সব গড়ে তুলতে হবে। তবেই ধর্মের কীলকেন্দ্র রক্ষা পাবে।'

একদিন এক ভক্তকে বললেন, 'ইষ্টার্থী সেবা দিয়ে লোককে আপন করার বুদ্ধি যার বেশি, তার টাকার অভাব হয় না। টাকাবুদ্ধি যার বেশি, তার টাকা হয় না।'

আর একদিন বললেন, 'ধর্মদান সব থেকে বড় কাজ। আর সেই কারণেই, যাজন আমাদের নিত্যকর্ম। অর্থাৎ যাজন করে মানুষকে ইষ্টে যুক্ত করার নামই তো হলো ঐ ধর্মদান।'

এক শিষ্য তার সাংসারিক অভাব-অনটানের কথা জানালে দয়াল ঠাকুর উত্তরে বললেন, 'খেটে খাওয়ার বুদ্ধি থাকলে কি ভাতের অভাব হয়? যাও গা-গতর খাটিয়ে চলতে অভ্যস্ত হও— দেখবে, নিজের সংসার চালিয়েও অন্যের দায় বহন করার মতো অবস্থাও তোমার হয়েছে। বিধি তো তাই কয়।'

বাড়িটা হবে একটা গার্হস্থ্য জীবনের সব দিককার কৃতিক্ষেত্র এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনের দিক্ থেকে স্বসম্পূর্ণ শিল্পালয়। অতিথিগণসহ সকলকে নিয়ে চলার এক আনন্দ-নিকেতন। ঐ দিনই এক মা কে বললেন, 'মেয়েদের এমন করে শিক্ষা দিতে হয় যাতে তারা আদর্শ স্ত্রী ও সু-মাতা হতে পারে। বিয়ের আগে যেন কোন

মেয়ের মন অন্য পুরুষে ঝুঁকে না যায়। অনুলোম বিবাহ সম্বন্ধে যা যা কওয়া আছে, সেগুলি যেন পালন করা হয়। ভালো বিয়ে এবং তার ফলে ভালো সন্তানের জন্ম দিয়ে কৃতী মা হয়ে ওঠা যে কত বড় জিনিস, তা একজন সফল মা'ই জানে। এর থেকে বড় আনন্দ আর স্বস্তি কী আছে? যাদের সংসার এমন নয়— যাদের সংসার অনভিপ্রেত সন্তানদের দাপটে ধ্বসে যাবার মতো, তারা বোঝে, একটা সুসন্তান ঘরে আনার মতো সুখ আর নাই।'

বললেন, 'বিয়ে একটা জবর চিজ। কিন্তু কঠিন নয়। মেয়েদের ঠিক মতো মানুষ করা— এবং ঠিক জায়গায় বিয়ে দেওয়া— এই হলো ফরমুলা অর্থাৎ বিধির বিধান।'

॥ উনিশ ॥

দেওঘর তখন বিহার প্রদেশের অন্তর্গত। তাই, বিহারে সৎসঙ্গের ভাবাদর্শ প্রচারের উপরে জোর দিতেন ঠাকুর। বলতেন, বিহার-বাসীদের মধ্যে যাজক, অধ্বর্যূ, ঋত্বিকের পাঞ্জা দিয়ে তাদের ইষ্টমাতাল করে তুলতে পারলে বিহার বড় হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সৎসঙ্গের বনিয়াদও পাকা হবে। ইষ্টমুখী না হলে তো মানুষ বৃদ্ধিশীল হয় না। বিহারকে বড় করে তোলার একটা সাধও ছিল ঠাকুরের মাথায়।

তাই, প্রত্যেক কর্মীকে বলতেন, বিহারকে খুব ভালো করে জানতে চেষ্টা করো। তার ইতিহাস, ভূগোল, প্রাকৃতিক সম্পদ, বিহারের নানা জাতি ও উপজাতির আদব-কায়দা, তাদের কালচার প্রভৃতি ভালো করে জানো, সেই সব উপজাতিভুক্ত মানুষের সঙ্গে সেবাবুদ্ধি নিয়ে অন্তর দিয়ে মেশো— তাদের ভালোবাসো। তুমি বিহারে এসে আছো— তুমি এখন বিহারবাসী। তুমি এখন বিহার সম্বন্ধে ভাবো, বিহারের জন্যে করো। দেখবে, বিহারের মানুষ তোমার আপনজন হয়ে উঠেছে। তখন বিহারবাসীদের মাথায় ইষ্টভাবনা ঢুকিয়ে দাও, তাদের জীবন সর্বতোমুখী উন্নয়ন ও কল্যাণের রাস্তা খুঁজে পেলে তোমারও পথের সাথী হয়ে উঠবে। বলতেন, 'আমি চাই—মানুষ আপন পায়ে দাঁড়িয়ে আপনার ও অপর জনগণের সর্বাত্মক উন্নতিবিধানে নিয়ত প্রয়াসশীল হয়ে চলুক। সমষ্টিগতভাবে এই উদ্দেশ্য নিয়ে চললে জাতি জাগ্রত না হয়ে যাবে কোথায়। প্রত্যেকটি প্রদেশে যদি জনজাগরণ শুরু হয়ে যায়, তবে ভারতই বিশ্বের গুরু-স্থানীয় হতে ক'দিন লাগে? যা বলি বা বহুদিন থেকে এক নাগাড়ে বলে চলেছি, সেই কাজে সব মনপ্রাণ নিয়ে লেগে পড়ো। এমনিতেই বিলম্ব হয়ে গিয়েছে, আর অযথা সময় নষ্ট কোরো না।

আবার বলেছেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপক এবং ছাত্রদের মধ্যে পরমপিতার ভাব ছড়িয়ে দিতে হবে। আজ যারা ছাত্র, দুদিন বাদে তারাই তো দেশের মুরব্বি হয়ে দাঁড়াবে। আবার, আজকের অনেক ছাত্রই তো ভবিষ্যতের শিক্ষাদাতা হবে। কাজেই, তাদের মাথায় এখন থেকেই ইষ্ট ঢুকিয়ে দিতে হবে।'

বলেছেন, 'মানুষ আপন ইষ্ট না বোঝা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই। সকলের সুখের রাস্তা তৈরি হলে তবেই আমার সুখ। সকলে মঙ্গলের রাস্তায় চলতে শুরু করলে তবেই আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি, তবেই আমার শান্তি।'

ধর্ম মানে কী? এর উত্তরে ঠাকুর একদিন বললেন, 'ধর্ম মানেই হলো পুরোপুরি ইষ্টের হয়ে যাওয়া, ইষ্টের জন্যই যা-কিছু করা।'

'আর জানবে, ইষ্টই যা-কিছু হয়ে আছেন। তিনিই তোমাদের প্রাণপুরুষ। তাই নাম আর নামীকে নিয়ে থাকবে। সর্বদা প্রবৃত্তির চাহিদাকে উপেক্ষা করে দেহ-মনকে ইষ্টেচ্ছা-পরিপূরণে নিযুক্ত রাখবে। এই হ'লো মোক্ষম তুক। এতে শত দুঃখের মধ্যেও মহানন্দে থাকবে।'

এর সঙ্গে আরও যোগ করলেন, 'তোমাদের স্বার্থ কোথায় তা তোমরা না জানলেও পরমপিতার দয়ায় এই বেকুব বামুন ভালোভাবেই জানে। তাই, তার কথা বেকুবের মতো মেনে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ।'

কথার মধ্যে কী সুন্দর সরল গ্রামীন সাহিত্য! এ সব কিছু নিয়েই জনগণের ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র।

ঐ দিন সন্ধ্যায় তিনি বসে আছেন বড়াল বাংলোর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে। কিছু ভক্ত এবং নিয়ত সেবক কাছে আছেন। এমন সময়ে ঋত্বিগাচার্য কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য সঙ্গে করে নিয়ে এলেন এক ভদ্রলোককে। পরিচয় দিয়ে বললেন, ইনিই দেওঘরের এস, ডি, ও সাহেব— যাঁর কথা আপনাকে বলেছিলাম। আরও বললেন—ধর্ম এবং কৃষ্টির প্রতি ওঁর একটা স্বাভাবিক টান আছে।

ঠাকুর বিনীতভাবে হেসে বললেন, 'ঐ তো রাজ-লক্ষণ। ঐ টানটাই মানুষের মূল সম্পদ। এই সম্পদ যার আছে, সে কৃতী হয়— সার্থক হয়।'

উত্তরে মহকুমা-শাসক বললেন, 'আমি অতি সাধারণ মানুষ— কাজের কাজ কী-ই বা করতে পারি!'

'আপনি সাধারণ মানুষই হোন না কেন, আপনি জন-সাধারণের কাছের মানুষ হয়ে থাকুন— সকলের যাতে সব দিক দিয়ে ভালো হয়, তাই করুন। এই রকম চলার তোড়ে দেখবেন, আপনার মধ্যেই ভগবত্তা জেগে উঠেছেন। তখন তো আপনি লোকহৃদয়ের রাজাধিরাজ! সেই তো প্রকৃত শাসক। দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন তখন আপনার মাধ্যমে নিখুঁত ভাবে হতে থাকবে।'

ঠাকুর ভট্টাচার্যমশাইকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এস,ডি,ও দাদাকে আমাদের আগের কথা এবং বর্তমান কথা সব বলেছেন তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সবই বলেছি।' উত্তর দিলেন ঋত্বিগাচার্য।

'ঠিকই করেছেন। দাদা হলেন দেওঘরের শাসক— আমরা তো ওঁর মুখ চেয়ে আছি।' বিনয় করে উত্তর দিলেন ঠাকুর।

মহাকুমা-শাসকও সবিনয়ে বললেন, 'আমার সাধ্যের মধ্যে যা আছে তা অবশ্যই করবো।'

ভদ্রলোক প্রণাম করে ধীরপদে বিদায় নেবার পরেও ঠাকুর স্নেহময় দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে লক্ষ্য করে।

একদিন আশ্রমের কাঠমিস্ত্রী মনোহর সরকারকে দেখে বললেন, 'কিরে, চৌকিটা বানানো হয়ে গেছে?' মিস্ত্রী উত্তরে বললে,'সবে তো কাল বিকেলে আরম্ভ করেছি, এত তাড়াতাড়ি শেষ হবে কি করে?'

উত্তরে ঠাকুর বললেন, ' দূর পাগল, কি যে ক'স্? তুই যখন লাগিছিস, তখন থেকে ধরলি তো ১৫/১৬ ঘন্টা চলে গেল—এই সময়টা কি কম?'

মিস্ত্রীও জবাবে বললে, 'আজ্ঞে, বিশ্রাম বলেও তো একটা জিনিস আছে। বেশি খাটলে তো শরীরও নষ্ট হয়ে যাবে, তখন তো আর খাটতেই পারবো না।'

'দূর পাগল, কী যে ক'স্! ইষ্টের জন্যে লাগাতার কাম করে গেলি শরীর আরও ঠিক থাকে— বিগড়ায় না।'

আরও বললেন, 'আগের দিনে দেশের আশ্রমে কেমন কাজ হতো, মনে আছে তো? কাজ চলছে তো চলছেই— দিনরাত চলছে, বিশ্রামের নাম ছিল না। তখন কি কারও শরীর খারাপ করিছে, না দুর্বল হয়েছে। শরীরকে চালায় তো মন, আর মন যদি ইষ্টে নিবেদিত থাকে, তো শক্তির যোগান আসতেই থাকে। মোদ্দা কথাই তো ঐ ইষ্টপ্রাণতা।'

একদিন সুশীলচন্দ্র বসু মশাই বললেন, 'অনেক সময় দেখা যায়, কোন এক ব্যক্তি মানুষ জনের কথকতা করতে করতে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তাঁর দেহ দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু ভাষণ শোনা যাচ্ছে। এ সব যাদু হয় কী করে?'

ঠাকুর বললেন, 'যাদু বলে ম্যাজিক বলে, কোন জিনিসকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্রত্যেক ঘটনার পিছনেই বিজ্ঞান সম্মত কারণ থাকে। স্থূল দেহকে সূক্ষ্মদেহে রূপান্তরিত করার মরকোচ যার জানা আছে, সে তা করতে পারে। আপনি পারেন না বলে তাকে আজগুবি ম্যাজিক বলতে পারেন না। কারণ ছাড়া কোন কার্য ঘটে না। কাজেই কোন ব্যাপারই যাদু নয়— সবই বৈজ্ঞানিক পন্থাতেই ঘটে। সেই বিজ্ঞানটা উদ্‌ঘাটন করা চাই।'

একদিন বললেন, 'কারও মায়ের উপরে প্রবল টান আছে দেখলে আমার খুব ভালো লাগে।'

একদিন বললেন, ' ঈশ্বর হলেন অস্তিত্বের উৎস। সেই মহা-অস্তিত্বের কোলে দাঁড়িয়ে আমরা অস্তিত্ব অটুট রাখি ও তা উপভোগ করি। নিজেদের আমরা যতখানি পরমপিতার উপভোগ্য করে তুলি, আমরা ততখানি আনন্দের অধিকারী হই। আবার এই আনন্দ দাঁড়িয়ে আছে সৎ অর্থাৎ সত্তা এবং চিৎ অর্থাৎ সুকেন্দ্রিক এবং বিস্তারমুখী চেতনার উপর।'

এক ভক্ত বললেন, 'দেখা গেছে রামকৃষ্ণদেব পায়খানার সময়ে ভাগ্নে হৃদয়ের কাছে জলভর্তি গাড়ু চেয়েছেন— অন্যে সেই জল দিতে গেলে তিনি তা নেননি— ভাবতেন, তাতে তিনি সত্যভ্রষ্ট হয়ে যাবেন। আমরা আপনার বেলাতেও এমন হতে দেখেছি। আপনি একে এক রকমের দ্বন্দ্বীবৃত্তি বলেছেন।'

'হ্যাঁ, ঠিকই। আমার স্বভাবও ঐ রকম। আমি যদি কারও কাছে খাবার জল চাই এবং তা যদি অন্য কেউ দেয়— অবশ্য আমার প্রয়োজনের তাগিদ বুঝেই সে হয়তো তেমন করে— তখন আমারও সেই রকম সত্যভ্রষ্টতার ভয় হয়। আমি এটাকেও গো-বিটুইন বলি। এতে আজ্ঞাকারী এবং সেবাদাতা উভয় পক্ষেরই সত্য ভঙ্গের অপরাধ হয়।' —বললেন ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র।

আবার বলেছেন, 'তোমরা এখানে এসে আছো কী জন্যে? আমার আদেশে চলে আমাকে তুষ্ট করার জন্যে তো? আমাকে খুশি করে আমার কাছ থেকে আরোতর জীবন লাভ করে ধন্য হবার জন্যে তো? কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই রকম উৎসর্গকরা প্রাণ কটা? তাই, যা করতে চাই, তার সুযোগ পাই না। তোমরা কি

এটা বোঝো না যে, তোমরাই আমার শক্তি— আমরা হাত-পাঃ আর তোমাদের দিয়ে আমার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করে তোমাদের সবাইকে পরমপিতার দরবারে পৌঁছে দেওয়াই আমার সাধ ও স্বপ্ন। সবটাই তো তাঁর লীলা।'

বললেন, 'আদিযুগে আমার প্রধান সহায় ছিল মাত্র দু'জন— কিশোরী এবং অনন্ত। তারা আমাকে কাঁটায় কাঁটায় অনুসরণ করতে সদা সচেষ্ট থাকতো। তাদের দিয়ে সেই যুগে কত অসাধ্য সাধন করা সম্ভব হয়েছে, তা এখনকার বড় বড় হোমরা-চোমরা কর্মীদের দ্বারাও হচ্ছে না।'

একটু যোগ করে বললেন, ' অনন্ত যদি আগাগোড়া তার ঐ আত্মাহুতি বজায় রাখতে পারতো তো জগতের অনেক কল্যাণ হতো এবং তাকেও অকালে চলে যেতে হতো না। সবই আমার দুর্ভাগ্য।'

॥ কুড়ি ॥

একদিন এক ঋত্বিক এসে তাঁর শারীরিক অকুশলতা এবং সেই কারণে তাঁর ইষ্টপ্রতিষ্ঠার কাজে বিঘ্ন ঘটছে এমন কথা জানালে ঠাকুর বললেন,' শরীরটাকেই মনে করবে প্রথম ঠাকুরঘর আর তাই ভেবে ভালোমতো তার যত্ন নেবে।'

আরো যোগ করলেন, ' সদাচার কিন্তু পালন করাই লাগে। সদাচারের অভাব ঘটলে শরীর তো ঠিক থাকবেই না। শরীরের তোয়াজই তো ঐ সদাচার।'

'আর নাম চালায়ে যাবা খুব জোর কদমে। হর্‌বখ্‌ত্‌ চলা চাই নাম। আদত জিনিস তো ঐটা। অসুখ হইছে বলে মন খারাপ করে বসে থাকলি তো রোগ আরও পা'য়ে বসবেনে।'

'সদাচার পালন করো, অখাদ্য-কুখাদ্য খাবা না আর দিদার নাম চালাও। আমি তো বুঝি, শরীর এবং মন ভালো রাখতি হলি এইটাই মোক্ষম দাওয়াই। যাও, লা'গে পড়ো।'

আরও বললেন, 'দ্যাখো, ভালো ভালো বই পড়তে হয় আর সৎ মানুষের সঙ্গে আধ্যাত্মিক চর্চা রাখতে হয়। তোমার শরীর মন তো তুমি পরমপিতাকেই সমর্পণ করেছ। তুমি শরীরে-মনে অসুস্থ থাকলে তো পরমপিতাই দুঃখিত হন। কাজেই, সদাচারসম্মত খাওয়া-দাওয়া করো, নাম ধ্যান করো, লোকের মধ্যে যাজন জোরদার করে মনকে ইষ্টকর্মে স্ফূর্তিযুক্ত করে রাখো— দেখবে, ধীরে ধীরে ভোল পালটে যাচ্ছে।'

কথা শুনে ভক্ত কর্মী খগেন মৌলিক মশাই নতুন মনোবল লাভ করলেন এবং ঠাকুরের কথামতো চলার উদ্দীপনা নিয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। প্রণাম করে নিবেদন করলেন, 'ঠাকুর, আপনার আশীর্বাদে যেন পারি।'

"যেন পারি—আবার কী কথা? পারবার জন্যিই তো ক'লেম। আমার কাম করবের জন্যিই তো তোমার জীবন, এইটে মনে রেখে চললিই সব ঠিক হয়ে যাবিনি। মানুষ অলস হয়ে পড়লি তার শরীর মন ক্রমেই বসে যেতে থাকে—টুপসা খেয়ে পড়ে।'

কথা প্রসঙ্গে আরও বললেন, 'পরমপিতা সর্বদা সুযোগ খোঁজেন যাতে আমাদের টিকিয়ে রাখতে পারেন। কিন্তু আমরা যদি তাঁকে সুযোগ না দিই, তাহলেই তিনি নাচার, একেবারে নিরুপায়। কেউ লোক হিসাবে ভালো বা যেমনই হোক না কেন, সে যদি প্রকৃত পক্ষে ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপন্ন হয়, তবে তার মঙ্গল অবধারিত।'

এক সময়ে কথাচ্ছলে বললেন,'আগে চাণক্যশ্লোক স্কুলপাঠ্য ছিল। ওর শ্লোকগুলি মুখস্থ রাখতে হয়—ওগুলি কত সুন্দর এবং শিক্ষাপ্রদ।'

একজন ভক্ত বললেন, 'সত্যিই তাই।'

'আমাদের কৃষ্টিকে যদি বুঝতে হয়, তবে সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য, কাব্য, দর্শন, নাটক, পুরাণ, সংহিতা, ধর্মসূত্র, পানিনি ব্যাকরণ ইত্যাদি পড়া দরকার। আর শাস্ত্রীয় গ্রন্থগুলির টীকা-টিপ্পনী না পড়ে মূল শ্লোকগুলি পড়ে ব্যাকরণ সম্মত ভাবে তার মানে বুঝতে চেষ্টা করতে হয়।'

একদিন বললেন, 'আমি যে লেখাপড়া শিখিনি, তথাকথিত পণ্ডিতদের কাছে নানাবিধ তত্ত্বালোচনা শুনিনি, তাতে আমার পক্ষে ভালোই হয়েছে। মূলেরও মূল যা—যা থেকে সব-কিছু গজিয়েছে, তা পরমপিতার দয়ায় সচেতনভাবে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছি— বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ সহকারে, খতিয়ে খতিয়ে। আমি বুঝি, আমি পরমপিতার দায়বদ্ধ অক্ষম সন্তান। তাই তিনি আমার হাত ধরে গোটা ব্যাপার এবং গোটা জগৎটা দেখিয়ে দেন, বুঝিয়ে দেন এবং প্রত্যেকটি পদক্ষেপে আমাকে চালিয়ে নেন।'

আবার জুড়ে দিয়ে বললেন, 'আমি বুদ্ধি করে কমই বলি, কমই করি। ভিতর থেকে জগৎপ্রভুই কলকাঠি নাড়েন এবং যা-যা করার তা করেন। আমি যেন তাঁর হাতের পুতুল মাত্র। আমার নিজের উপরে আমার কোন এক্তিয়ারই নেই।'

একটু থেমে আবার বললেন, 'তবে হ্যাঁ, বলতে পারি— এই দেহের প্রত্যেকটি কোষ দয়ালপ্রভুর ইঙ্গিত-মোতাবেক পা ফেলে চলতে সদাসচেতন থাকে, পুরোপুরি, তন্মুখ থেকে।'

বললেন, 'দয়াল মালিকের লীলা দর্শন করি আবার নিজেও কখনো কিছু খেলা খেলি। কোন ক্রিয়া কেমন করে ঘটে— কোন ঘটনার উৎস কোনটা, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। তাতে আমার বেশ মজা লাগে। তখন বোঝা যায়, জগতে কোন ঘটনাই অকারণ ঘটে না— এক-একটা কারণ থেকে বা এক-এক গুচ্ছ কারণের জেরে এক-একটি ঘটনা বা কোন ঘটনাপ্রবাহ উদ্ভূত হয়। একটি মাত্র বিন্দু-কারণের হেতু-স্বরূপ একগুচ্ছ ঘটনাপ্রবাহের উৎপত্তি হতে পারে— আদিতে যেমনধারা হয়েছিল। সেই আদি কারণকে জেনে বুঝে নিতে পারলে সব ভবিষ্য ঘটনাপ্রবাহের আগাম ছবি মনের নেত্রে দেখা যেতে পারে। এই ভাবেই কোনও ব্যক্তি দ্রষ্টা-পুরুষে পরিণত হতে পারেন। এর মধ্যে এক তিলও আজগুবি স্বপ্ন নেই। সবটাই নিরেট বিজ্ঞানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।'

বলে চললেন, 'কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় সাফল্য লাভ করতে হলে চাই— দেহধারী পূর্ণজ্ঞান, ভক্তি, শক্তি ও অখণ্ড প্রেম-স্বরূপ দেহধারী কোন লোকগুরুকে জীবন দিয়ে ভালোবাসা। তাঁকে মেনে চলা এবং তাঁকে তুষ্ট ও পুষ্ট করার নেশায় সর্বদা মেতে থাকতে হবে।'

আরও বললেন, 'পরমপিতা বড় দয়াল। যারা তাঁর দরবারে এসে নতজানু হয়, তিনি, যেন-তেন-প্রকারেণ তাঁদের মঙ্গল সাধন করেনই। যে তাঁকে ডেকেছে— তাঁকে ভালোবেসেছে, সে তাঁর করুণাদৃষ্টির মধ্যে আছেই। তাঁর স্বভাব হলো— নাছোড়বান্দা হয়ে আমাদের পিছনে লেগে থাকা। তাঁর সর্বদা চেষ্টা থাকে যাতে আমরা তাঁকে ভালোবেসে, তাঁকে তৃপ্ত করে, তাঁর বাঞ্ছা পূরণ করে তাঁর দেখানো পথে চলে চলে তাঁর ধামে পৌঁছতে পারি।'

তিনি আমাদের ত্রাতা। আবার ত্রাণের পথপ্রদর্শক। আশ্রমের কাজের যোগ্য মানুষ কেমন হবে? সেই প্রসঙ্গে একদিন কাঠমিস্ত্রী খগেন তপাদার এবং মনোহর সরকারকে বললেন, 'এখানে কাজ করাতে হলে কিন্তু চাকরির মনোভাবাপন্ন মানুষরা অযোগ্য। যারা চাকরি খুঁজছে, তাদের মতন দু-চার জন মিস্ত্রী নিলে কিন্তু আমার কাজ হবে না। আশ্রমের যে-কোন বিভাগেই হোক, কাজের জন্যে চাই ত্যাগী লোক। যারা এখানে দীক্ষিত— যারা আত্মত্যাগ করে ইষ্টতুষ্টির জন্যে কিছু করতে চায়, তারাই পারবে এখানে ত্যাগী সন্ন্যাসীর মতো থেকে কাজ করতে।

তারা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে পড়ে থাকবে। যে-বেলা জোটে সে-বেলা খাবে— যে-বেলা জুটবে না, সে-বেলা খাবে না। পেটভরে কুয়োর জল খেয়ে হাসিমুখে কাজ করে যাবে। আমার খুশির জন্যে কাজের ভাবনাই হবে তার খাদ্য। কোথা থেকে কেমন ক'রে যে তার শরীর ঠিকই থাকবে, সে তা টেরই পাবে না। আমি দেখেছি, নাম আর ইষ্টধান্ধা-পরায়ণতার মতো টনিক আর নেই। কারণ, দয়াময় পরমপিতা তাদের কোন প্রকারে কষ্ট পেতে দেন না— সর্বদাই তাদের সুস্থতা এবং মানসিক ও শারীরিক শক্তির যোগান দিয়ে চলেন।'

ঐ সময়ের মধ্যেই একদিন ঋত্বিকদের কর্মব্রত সম্বন্ধে বললেন, 'ঋত্বিকরা হলো মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও প্রগতির অগ্রদূত। ঋত্বিকরা মানুষের যোগ্যতার সংবর্ধক এবং অস্তিত্ব ও ক্রমবর্ধনার ধারক। ঋত্বিক মানেই তো জীবনের জোগানদার । মানুষকে ইষ্টকর্মে ধরে রেখে তার অগ্রগমনের পথকে সুগম রাখাই হলো প্রতিটি ঋত্বিকের অবশ্য করণীয়।'

জনৈক ভক্তের দুঃখ-দুর্দশা এবং বেঠিক চলন পরিত্যাগ করতে পারার অক্ষমতার কথা শুনে আদরের সঙ্গে বললেন, 'দ্যাখো সোনা, আমরা যদি পরমপিতাকে ভালো না বাসি, তাঁর মনের মতো হয়ে না চলি, তাহলে আমাদের প্রতি হাজার ভালোবাসা থাকলেও আমার জন্যে কিছু করে উঠতে পারেন না। আমাদের জীবন ও চলনা যদি তাঁর উপভোগ্য হয়ে না ওঠে তবে তিনি আমাদের লাগাম হাতে নিতে পারেন না।'

বললেন, 'ভুলত্রুটি যা হয়ে গেছে, তা তো গেছেই। এখন থেকে এই মুহূর্ত থেকেই ইষ্টগতপ্রাণ হয়ে তাঁর নির্দিষ্ট পথে চলতে থাকো শক্ত সংকল্প নিয়ে। দেখবে, দয়াময় পরমপিতা তোমার মতো দুর্বল লোকটির পাশে-পাশে শক্তির যোগান দিয়ে চলেছেন। এত বড় দয়ালু আর কোথাও পাবে?'

স্বাধীনতা সম্বন্ধে কথা উঠেছে। ঠাকুর বললেন, 'স্ব মানেই তো সেই এক এবং অদ্বিতীয় পরম সত্তা যা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বহুরূপে প্রকট হয়ে আছেন এবং আরও বহুতর আকারে ও প্রকারে প্রকট হয়ে চলেছেন। সেই পরম আদিসত্তা এবং তার থেকে উদ্ভূত যাবতীয় অস্তিত্ব-প্রবাহের পালন–পোষণে যখন আমরা তৎপরায়ণ, বাস্তবতঃ তখনই আমরা স্বাধীন। আরও বললেন, 'এই স্বাধীনতার স্বাদ যে পেয়েছে, সে জগতের সবাইকে তা বিতরণ না করে পারে না। তার মনোভাব— মধু আমি খেয়েছি, তুমিও খাও।'

'প্রত্যেকে যদি প্রত্যেকের পালক ও পোষক হয়ে ওঠে— স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পরস্পরকে পরিপূরণ করে চলে, তখনই দেশের মধ্যে আসে প্রকৃত স্বাধীনতা।'

আবার বলেছেন, স্বাধীনতা মানে অনধীনতা নয়। পর-অনির্ভরতাও নয়। পর-নিরপেক্ষতাও নয়। অন্যের সেবা ও সাহায্য ছাড়া আমাদের একটা দিনও চলতে পারে না। একজনের সেবা ও সাহায্য অন্য আর একজনকে নিতেই হয়। আমি যে আহার্য গ্রহণ করে উদর পূর্ণ করছি, দেখা যাচ্ছে— তার কোনটাই হয়তো আমি উৎপাদন করিনি। যদি বলো— আমি নিজের জমির ধানের ভাত খাই, নিজের বাগানের তরি-তরকারি খাই, নিজের পালিত গাইয়ের দুধ খাই, জমির সরষে ভাঙ্গিয়ে তেল করে ব্যবহার করি। তথাপি তুমি পর-নির্ভর— পরাপেক্ষী। ভেবে দ্যাখো, তুমি জমিতে যে লাঙল দিয়েছ, সেই লাঙলের ফলা কোন কর্মকার অনেক খেটেখুটে তার কামারশালে বসে তৈরি করে দিয়েছে। জমিতে যে সার প্রয়োগ করছো, তা তোমার দ্বারা প্রস্তুত নয়। আবার জমির সব ব্যাপারে একা করে পারছো না— অন্য ব্যক্তিরও সাহায্য নিচ্ছো। কাজেই, তুমি মুখে নিজেকে স্বাধীন বললেও তুমি অন্যান্য বহু ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল। সুতরাং, ঐ বড়াই আমরা কেউই করতে পারি না। আমরা সামাজিক মানুষেরা পরস্পরের সেবা ও সাহায্য দেওয়া-নেওয়ার ভিতর দিয়েই তো এই সমষ্টির সমাজকে গড়ে তুলেছি। এইটাই তো মানব-সভ্যতার বিশেষ অবদান। তাই, স্বাধীন মানুষ বা স্বাধীন রাষ্ট্র বলতে তো আমরা বুঝবো, পারস্পরিক সেবা-সাহায্য আত্মনিযুক্ত ব্যষ্টি-মানুষ এবং সংঘবদ্ধ মানুষের সমাজকে। স্বাধীনতার সঙ্গে মানব-সমাজের ছবিটা আসছেই— অন্যনিরপেক্ষ পৃথক-পৃথক অসহায় কিছু মানুষের ছবি নয়। স্বাধীনতার মধ্যে রয়েছে আত্মদানে পরের সেবা করার তুক্। এই সদাসত্য তুক্ মরকোচকে বাদ দিয়ে কোন স্বাধীন ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের কথা ভাবাই যায় না। গভীর, ব্যাপক এবং আন্তরিক পরনির্ভরতাই স্বাধীনতার বুনিয়াদ। যে দেশে এই বীজ-সূত্রটি যত গভীর এবং প্রাচীন, সেই দেশ স্বাধীন দেশ হিসাবে তত প্রখ্যাত এবং প্রাচীন। এই রকম স্বাধীন দেশের সত্তাই মানব-সভ্যতার মূল উপাদান। সমষ্টির সংহতি স্বাধীনতা আর সর্বদাই তা একজনের অপেক্ষায় অন্য জনের থাকাকেই বুঝায়।

এই অপেক্ষতা যতই নিবিড় হবে— আত্মায়-আত্মায় হবে, এক পরমপুরুষের কল্যাণবাঞ্ছার পরিপূরক হয়ে সংহত হয়ে উঠবে, সেই অনুশীলনভূমি তত ঐতিহ্যশালী ও সভ্যতার স্থায়ী নিদর্শনরূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

যারা মূল সত্তায় সংঘবদ্ধ এবং সেই সত্তার দেহ-বিগ্রহের প্রতি নিবিড় আনুগত্যে আবদ্ধ ও নিজেদের মধ্যে আন্তরিক সেবা-বিনিময়ে একতানতার উদাহরণ স্বরূপ, তারাই শ্রেষ্ঠ স্বাধীন জাতির সম্মান লাভ করে।

॥ একুশ ॥

একদিন ঠাকুর বললেন, গীতায় যে বারবার 'মাং' বলা আছে, 'বাসুদেব' বলা আছে— এইগুলি আমার খুব ভালো লাগে। এর মানে হলো, শ্রীকৃষ্ণ এমনই এক যুগ-পুরুষোত্তম যাঁর আবির্ভাব ঘটেছে সাধারণ বিজ্ঞান সূত্র মেনেই— এক মায়ের গর্ভে, এক পিতার ঔরসে। পুরুষোত্তম অন্য-কিছু আজগুবি যাদু-ব্যক্তিত্ব নয়। মানুষের জানা নিয়মে মানুষের ঘরেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন যুগের দাবিতে। এসে কী করেন? দুষ্কৃতিদের বিনষ্ট করেন এবং সাধুব্যক্তিদের রক্ষা করেন ও ক্রমবর্ধনার পথে এগিয়ে নিয়ে যান। তাঁর আসাটাই এই সব চেনা-জানা সাধারণ মানুষের জন্যে। তিনি নিজে মানুষ, কাজও করেন মানুষের জন্যেই। কাজেই, তাঁর সবকিছুই মানবীয়। তিনিও মানুষের পরিচিত সীমারেখার দ্বারা সীমাবদ্ধ। কিন্তু তাঁর বিজ্ঞান নির্ভর ব্যক্তিত্ব এত বিশাল, সর্বমুখী এবং সর্বক্ষম যে মানুষ তাঁর কাছ থেকে পায় অনেক। তাঁর লোক-দরদী কর্মকাণ্ডসমূহ এত সর্বগ্রাসী যে মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনের সব-কিছু সমস্যার অব্যর্থ সামাধান তো পায়ই— উপরন্তু ঐশী লীলার অংশীদার হয়ে কাঙ্ক্ষিত পথে চলে তাঁর অভীপ্সিত নিত্যানন্দধামে অভিনীত হওয়ার সুগম সরণিও প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

তাই, ঈশ্বরের গায়ে মানুষের গন্ধ না থাকলে তাঁর ভালো লাগে না। তিনি বলতে চান, ঈশ্বর যদি নিজ গাম্ভীর্যে অসম্পৃক্ত অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে মানুষের সমাজ থেকে বাস করতে থাকেন, তবে তাতে সাধারণ মানুষের লাভ কোথায়? সে রকম ঈশ্বর মানুষের কাজে লাগেন না। ঈশ্বর যখন মানুষ হয়ে মানুষের জন্যে আসেন— মানুষের কাজে মানুষের সঙ্গে একাকার হয়ে যান, তখনই তিনি মানুষকে কিছু দিতে পারেন আর মানুষও নিজস্ব চেনাজানা কায়দায় তাকে বুঝে নিয়ে ভালোভাবে বেঁচে থাকা এবং বেড়ে ওঠার পথ পেয়ে ধন্য হয়। মানুষ যাতে তাঁকে গ্রহণ করতে পারে— আত্মসাৎ করতে পারে, তেমন রূপ নিয়ে, তেমন ধরণ-ধারণ নিয়ে তাঁকে আসতে হয় এবং মানুষ হয়ে মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে তাদের বন্ধু হয়ে গিয়ে তাদের পথ দেখাতে হয়— তাদের সুপরামর্শ দিতে হয়। মানুষকে ভালোবাসা দিয়ে, তৃষ্ণার তৃপ্তি দিয়ে তাকে এমন করে তোলেন যে, সে তাঁকে ছাড়া আর কাউকে চায় না— তাঁকে ছাড়া আর কাউকে বোঝে না, আর কোন-কিছু পেয়ে তৃপ্ত হয় না। তিনিই হয়ে ওঠেন তার পরম লভ্য এবং আকাঙ্ক্ষার বস্তু।

ইষ্টপ্রেমের দাতাও তিনি, ইষ্টপ্রেমের ভোক্তাও তিনি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মালিক হয়েও তিনি মনুষ্যদেহ স্বীকার করেন এবং মানুষের প্রতি করুণাময় হয়ে মানুষের মতো করেন, যাতে মানুষ তাঁকে নিজের হিতৈষী বন্ধু ভেবে তাঁকে মান্য করে এবং তাঁর অনুগত হয়ে চলে। এই ক্রিয়াকাণ্ডই তাঁর লীলা।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র নিজেও ছিলেন তাই। তিনি মানুষের জন্যেই জীবনধারণ করেছেন। মানুষের ভালো না হলে তাঁর সুখ হতো না। মানুষ বাঁচলে তবে যেন তিনি বাঁচতেন। শুধু মানুষ কেন, একটা পশু বা পাখির মৃত্যু নিবারণ করতে পারলে তবে তিনি নিজের অস্তিত্ব রক্ষিত হলো— এমন মনে করতেন।

তাঁর মানুষী তনু স্বীকার এমনই দায়বদ্ধতার ব্যাপার এমনই দুঃখবহ এবং এমনই যন্ত্রণাসহ।

সাধারণতঃ ভালো পথটা মানুষের কাছে কঠিন পথ। মন্দ পথটা সহজ পথ এবং প্রলোভনের পথ। দুর্বলচিত্ত মানুষের কাছে মন্দ পথের আকর্ষণ বেশি। কারণ, মন্দ পথে চলার জন্যে তেমন-কোন কসরত নেই— এ-রাস্তায় সংগ্রাম করতে হয় না। মানসিকভাবে ঢলে পড়াটাই এই পথে চলার শক্তি যোগায় এবং আগ্রহকে অধিকতর করে তোলে। কুপথ প্রহেলিকাময় মজার পথ। এ পথে চলাও সহজ, মরাও সহজ।

ঠাকুর নিজেই বলেছেন, 'আত্মবিনাশের পথটাই তো মানুষের কাছে প্রিয় পথ। কারণ, এ পথে কোন কঠিন তপস্যার ঝামেলা নেই— শুধু সাধারণ স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলেই হলো।'

বলেছেন, আত্মবিনাশের পথ থেকে বাঁচিয়ে আত্মবিকাশের পথ দেখাবার জন্যেই মহাপুরুষেরা করুণাপরবশ হয়ে বার-বার যুগে-যুগে কষ্টকর জীবনধারণ স্বীকার করেন। আমরা তাঁকে পেয়ে, তাঁকে অনুসরণ করে, তাঁর চলায় চলে আমাদের হারিয়ে যাওয়া স্বরূপকে পুনরায় উদ্ধার করতে পারি।

তাই, তাঁকে পাওয়া মানে নতুন জীবন পাওয়া। সংকল্প নিয়ে ইষ্টানুসৃত পথে চলাই দ্বিজত্বলাভ। দ্বিজত্ব মানে নতুন করে জন্ম নেওয়া। ইষ্টপথে থেকে, তাঁর কথামতো চলে নতুন জীবন লাভই দ্বিজত্বপ্রাপ্তি।

বলছেন,' পরমপিতা মানুষ হয়ে আসেন মানুষের ভিতর ভাবভক্তির উদ্বোধন ঘটাবার জন্যে। তাঁর সঙ্গ-সাহচর্য লাভ ও আদেশ-নিদেশ পালানের সুযোগ যত বেশি মানুষের ঘটে, দেশের পরিবেশ ও সমাজের পরিকাঠামো ততই উন্নত হতে থাকে।'

দু'জন লোকের অভ্যাসের সমতা । একজন শ্রীরামকৃষ্ণ, অন্যজন ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, আরে অমুক লোকটা যে এখানে এসেছিল— প্রশ্নটশ্ন করে এই মুকখোর কাছ থেকে অনেক কথা শুনে গেল, তা, এখানকার সম্পর্কে কী বলেছে—সে খবর রাখোনি? সব খবর রাখতে হয়।

ভক্তরা বলেছে, 'আপনার সম্পর্কে লোকের মতামতের কী দরকার আছে? আপনি নিজেই সম্পূর্ণ, নিজেই সব জানেন।'

'আরে, তা বললে কি চলে? সব খবর রাখতে হয়— মানুষ নিয়েই তো সব কারবার।'

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রও লোকমতের মুখাপেক্ষী ছিলেন। কারও জন্যে কোন বার্তা পাঠিয়ে তার কেমন লেগেছে— কী বলেছে, জানতে চাইতেন। সে কিছু না বলে থাকলে, তার কেমন লেগেছে বা কী মনে হয়েছে, তা জেনে আসতে সেই লোককে আবার পাঠাতেন।

দু'টি ব্যক্তিত্বের মনের প্রবণতা হুবহু এক। যেন বদলা-বদলি করা যায়। এক সত্তারই দু'টি সম্প্রসার।

দিন লিপিকার প্রফুল্লকুমার দাসের হাত দিয়ে তাঁর মধ্যম সহোদর প্রভাস চক্রবর্তী মশাইয়ের উদ্দেশ্যে লিখিত একখানি পত্র তাঁর স্ত্রীকে পড়ে শোনাতে বললেন, ঠাকুর। দাস মশাই ফিরে এলে জিজ্ঞেস করলেন, ' হ্যাঁরে, চিঠি শুনে কিছু বললে?'

'আজ্ঞে, কিছু বলেননি।' উত্তর দাস মশাইয়ের।'

'তা, তুইও জিজ্ঞেস করিস্‌নি?'

'আজ্ঞে না তো।'

'যা, গিয়ে জিজ্ঞেস করে আয়— এসব জানতে হয়। প্রতিক্রিয়াটা কী হলো, তা জেনে নিতে হয়।' বুঝিয়ে দিলেন ঠাকুর।

এক আসরে এক শিষ্য জিজ্ঞেস করলেন, 'মানুষ ছাড়া জগতের অন্যান্য বস্তুর কি মন আছে— না, থাকতে পারে?

উত্তরে ঠাকুর বললেন, 'আমার তো মনে হয়, বস্তুজগতের মধ্যেও মন আছে। তাদের মধ্যেও টান আছে, পছন্দ-অপছন্দ বলে ব্যাপার আছে। কিন্তু তা মানুষের মতো নয়। বস্তুর মন আমাদের মনের মতো নয়, তা আলাদা ধরণের। তাই আমরা তা বুঝতে পারি না।'

বললেন, 'বস্তুর মধ্যেও আত্মা আছে, আত্মার মধ্যেও বস্তু আছে। কোনটা ছাড়া কোনটা নয়, শুধু সমাবেশের রকমারিত্ব। '

একদিন কথা উঠলো মনের মধ্যে শিথিলতা এসে গেলে কাজে-কর্মে অমনোযোগ এবং অপারগতা দেখা দিলে অর্থাৎ মনের মধ্যে বিচ্যুতি ঢুকে গেলে কি তার জন্যে প্রাজাপত্য বা ঐ-জাতীয় কোন প্রায়শ্চিত্ত করা ভালো?

সরাসরি উত্তরে বললেন,' নাম করলেই হয়। নামের আগুনে সব আবর্জনা জ্বলে যায়।'

বললেন, 'সর্বক্ষণ নাম করতে হয়। কাজকর্মও চলবে, নামও চলবে। নামে শিথিলতা এলেই মুশকিল।'

'আবার একটা বাস্তব উদাহরণ দিই। ধরুন, আমি কাউকে দেশলাই কিনতে দিলাম। সে দেশলাই কিনলোও, কিন্তু আমাকে না দিয়ে কাছে রেখে দিলো এবং দিলো মাস-তিনেক পরে। তখন বুঝতে হবে, তাকে প্রবৃত্তিরূপ রোগে ধরেছে। তার তপঃপ্রাণতার সম্বেগ শিথিল হয়ে পড়েছে। এ থেকে খুব সাবধান থাকা দরকার।'

'এক গুজরাটি শিষ্য— নাম জানীভাই। তিনি সপরিবার শ্রীগুরুদেবের দরবারে এসে নিবেদন করলেন, তাঁর বড় দুর্দিন চলছে— মন অস্থির, কোন কাজ ভালো লাগে না, একটা বিষাদের দশা তাঁকে পেয়ে বসেছে। তিনি জানতে চাইলেন, এই অবস্থা কাটবে কেমন করে। এর থেকে রেহাই পাওয়া যাবে কেমন করে।'

ঠাকুর হেসে বললেন,' তোমাকে তো ভালোই দেখছি— তোমার কোন অসুখই নেই। আমি বলি কি, অনিচ্ছা হলেও রোখ করে হাসবে, খেলবে, বেড়াবে, গল্প করবে, ফূর্তি করবে, অপরকে ফূর্তিতে রাখবে— নিজের ক্ষতি না করে বা অন্যের ক্ষতি না করে মজা মারবে।'

'আমি বলি কি, নামটাম ঠিকমতো চালিয়ে যাবে। ওর মতো ওষুধ আর নেই। ওর চেয়ে বড় রসায়ন নেই। দেদার নাম করতে থাকো, আপসে আপ সব অসুবিধার অবসান হয়ে যাবে— ফূর্তি ফিরে পাবে। শরীরে এবং মনে বল পাবে। মনে ফূর্তি এলে এবং শরীরে বল পেলে দেখবে ভয়-ভয় ভাবটা আর নেই— সব অসোয়াস্তি ও মনের ভয় কোথায় পালিয়ে গেছে। নামকে কসে ধরে ইষ্টানুরাগের ঘোড়া ছুটিয়ে তাঁর কাম করে বেড়াও!'

শিষ্যটির আবার খেদ প্রকাশ— মন অবসন্ন হলে আর প্রভুকে ডাকতেও ইচ্ছে করে না।

বাবা, 'তাঁকে না ডেকেই তো এই অবস্থা। তাঁকে ডাকতে হবে, তাঁর কর্ম করে যেতে হবে, সব রকম ভাবে তাঁর হয়ে যেতে হবে।'

জানীভাই মশাইয়ের আবার নিবেদন— আমার মনে হয়, আপনার কাছে যা চাইবো, তাই পাবো।

ঠাকুর মন্তব্য করলেন, 'নিজের জন্যে চাইতে গেলেই তো গোলমাল। সব-কিছুর আকাঙ্ক্ষাই হবে একমাত্র ইষ্টের জন্যে। ইষ্ট কিসে তুষ্ট হন, পুষ্ট হন, খুশি হন— তাই তো তোমার ব্রত ও কেবল কর্ম। তোমার অন্য ব্রত নেই।'

'বললেন, অত যুক্তিতর্কো খাড়া না করে বিনা শর্তে ইষ্টচেতন হয়ে চলো, তাঁর কাজ করো— দেখবে সব অসুবিধা উবে গেছে।'

ব্রাহ্মণ-সন্তান জানীভাই তাঁর পালনীয় আচারানুষ্ঠান প্রভৃতি থেকে স্খলিত হননি— একথা শুনে ঠাকুরও খুব খুশি হলেন এবং তাঁকে আরও নিবিড়ভাবে ইষ্টপ্রাণ হয়ে নামধ্যান-পরায়ণ হয়ে চলার নির্দেশ দিলেন।

জানীভাই আশীর্বাদ পেয়ে খুশিমনে ঠাকুর প্রণাম করে বিদায় নিলেন।

॥ বাইশ ॥

ইংরেজি ১৯৪৮ সালের বাইশে আগস্ট, রবিবার। সময়— সকাল বেলা। ঠাকুর বসে আছেন বড়াল বাংলোর বারান্দায়, শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত হয়ে। নিকটবর্তী অশ্বত্থগাছে পাখিরা কিচিরমিচির রব করে চলেছে।

সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঠাকুর বললেন 'এই যে পাখিগুলো অনেকক্ষণ ধরে তাদের ভাষায় ডেকে চলেছে, আমরা ওদের ডাকও বুঝিনা, ওদের ব্যাপারে মনোযোগীও নই। আমরা ওদের ডাকাডাকির ব্যাপারে ভাবিও না, মনও দিই না।'

'যদি আমরা পাখীকে ভালোবাসি, আগ্রহ-সহকারে তাদের ডাক শুনি, তবে বুঝতে পারবো, কি রকম মানসিক অবস্থায় ওরা কেমন আওয়াজ করে থাকে।' এইটুকু বলে নিয়ে আরও বলে চললেন, 'এই রকম মানুষ, গাছপালা, ফুলফল, পশুপাখী-কীটপতঙ্গ, জলমাটি, আলো-বাতাস, চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদি নানা বিষয়-বস্তুর সঙ্গে আমাদের একটা জীবনীয় সম্পর্ক আছে। সে সম্পর্ক আদান-প্রদানের এবং ভালোবাসার। যারা জীবনের যোগানদার, তাদের সঙ্গে যথাযথ সংযোগ-স্থাপনে জীবন সার্থক হয়, বুদ্ধি ও বোধের, চিন্তা ও কর্মশক্তির বহুমুখী বিকাশ ঘটে— লেনদেনের সম্পর্কানুযায়ী।'

প্রসঙ্গতঃ বললেন, 'আমি ছেলেবেলা থেকেই অভ্যস্ত ছিলাম বিবিধকে নিয়ে চলতে। সব কিছুর পরম সত্তা এবং আমার পরম সত্তা যে এক তা বোধের মধ্যে থেকে আমাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াতো। আর এই কারণেই স্বার্থ বলতে আমি বুঝতাম প্রত্যেকটি ব্যষ্টি ও সমষ্টির স্বার্থ। নিজের আলাদা স্বার্থ বলতে কিছু জানতাম না।'

আরও বললেন, 'বুঝে দেখে এটা অভ্যাস করা লাগে।'

এক সময় কথা বলতে বলতে বললেন 'সব চাইতে ক্ষতি হয়েছে দেশ ভাগ হয়ে। এতে ভারত ও পাকিস্তান— হিন্দু ও মুসলমান, এমন কি অন্যান্য সাম্প্রদায়ের মানুষদেরও দারুণ ক্ষতি হয়েছে। সংহতির বোধটা ভাগাভাগি হয়ে গেলে কি ছোট ছোট সম্প্রদায় গুলির মধ্যে কোন ঐক্য থাকে? টুকরো-টুকরো অংশ গুলির আবার শক্তি কোথায়?'

'ব্রহ্মদেশ প্রত্যাগত বিশিষ্ট শিষ্য ব্রজেন চট্টোপাধ্যায় একদিন বললেন, চট্টগ্রাম জেলায় একটি হিন্দু-সম্প্রদায় আছে, তারা নিজেদের ক্ষত্রিয়সন্তান বলে দাবি করে।'

শুনে ঠাকুর বললেন, আজকাল দেখা যায়— ক্ষত্রিয়বর্ণধারী বলে যারা দাবি করে, তাদের ধারণা— ক্ষত্রিয়রা বদরাগী হবে, প্রতিহিংসাপরায়ণ হবে এবং সব সময়ে মারমুখী হয়ে থাকবে। এটাই ওরা গৌরবজনক মনে করে। এটা কিন্তু প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের বৈশিষ্ট্য নয়। ক্ষত্রিয়রা হবে কুশল-কৌশলী লোকরক্ষক। ক্ষত্রিয়ের কাজ লোকহৃদয় রঞ্জিত করে তোলা— অনুরাগ-উদ্দীপ্ত করে তোলা। লোকপালন, লোকরক্ষণ, লোকতোষণ— এক কথায় লোকসেবাই তাদের চরিত্রের ধরণ।'

আরও যোগ করলেন, 'সেবার তাৎপর্যই হলো রক্ষণ, পালন, পোষণ ও পূরণ। ইষ্ট, কৃষ্টি, ধর্ম, সংঘ ইত্যাদি হলো লোকজীবনের ধারক। ক্ষত্রিয়ের সহজাত স্বভাবই হবে এগুলিকে রক্ষা করে চলা।'

সুশীলচন্দ্র বসু-মশাই তথ্য সম্বলিত কাগজ দেখে বললেন, শ্রীচৈতনদেবের আমলে বাংলা ও বিহার মিলিয়ে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৪,০০০। মুসলিম— সমাজের জনসংখ্যা কত দ্রুত গতিতে বাড়ছে— বাংলায় তো হিন্দু সংখ্যালঘু।

'ধর্মমত-ভিত্তিক দেশ-বিভাজনে তাই আমরা ঠকেছি।' মন্তব্য ঠাকুরের। 'ধর্ম যেখানে একটাই, সেখানেও কল্পিত ধর্মবহুত্বের ভিত্তিতে দেশকে টুকরো করা হলো।'

'ধর্ম-সম্বন্ধে মানুষের কোন বোধই ছিল না। আবার বিভাজনের পরেও রেষারেষির অন্ত নেই। এতে লাভ যে হচ্ছে কার— তা ভেবে দেখার লোক নেই। একটা রাষ্ট্র ছোট হয়ে গেলে এবং তার পরেও বিদ্বেষ বজায় থাকলে, সে যে কী দুর্দশা তা কেউ ভেবেও দ্যাখে না।'

'ধর্মান্তরণকে স্বীকার করে নিয়ে হিন্দুরা যে কী আত্মঘাতী কাজ করেছে, তা বলে শেষ করা যায় না। ঠিকঠিক মতো বিবাহসংস্কার পালিত না হওয়ার ফলে এমন আত্মঘাতী জাতকের জন্ম সম্ভব হয়েছে। কৃষ্টি-বিধ্বংসী সন্তানদের জন্ম হওয়ায় জাতি ও দেশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। সবই কু-বিবাহের ফলে।'

সেদিনটা ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের পঁচিশে আগস্ট। পাবনা থেকে দেওঘরে এসেছে ইয়াদালি ও দোখল পরামাণিক। এসেছে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে।

ঠাকুর তাদের দেখে বেজায় খুশি। প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন তাদের ঘরগৃহস্থালীর খবর, জানতে চাইলেন পাড়া-প্রতিবেশী নিয়ে তারা সব কেমন আছে। তাদের ঘরের গরু-বাছুর, ছাগল, হাঁস-মুরগীগুলোর স্বাস্থ্যের খবরও নিলেন। কথা যেন আর ফুরোয় না। কতদিন পরে যেন আপন লোককে কাছে পেয়েছেন। এক ভক্তকে বলে দিলেন— ভালো দেখে প্যাড়া এনে ওদের খাওয়াতে।

এরপর, নতুন সরকার কেমন চলছে, দেশবাসী কেমন আছে, তারা কী ভাবছে, জীবনের ধারা আগের মতোই আছে, না রাজনৈতিক চাপে নতুন জীবন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হচ্ছে প্রভৃতি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

ইয়াদালি জানালে, বহু হিন্দু তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে ভারতে চলে এসেছে। পশ্চিমা মুসলমানরা এসে যেখানে-সেখানে বসে গিয়েছে। বহু অবাঙালি মুসলমান সরকারি কাজে বদলি নিয়ে পূর্ব-পকিস্তানে এসেছে। তারা দাপটও দেখায় বেশি। আরও বললে, সুখও নেই— শান্তিও নেই। সবই কেমন ওলট-পালট হয়ে গেছে।

প্রাণ ভরে উভয় পক্ষের কথা বর্ণিত হ'ল। এইটা বোঝা গেল, সুখের আশায় দেশ ভাগাভাগি করে জনজীবনের দুঃখ অনেক বেড়েছেই। সবাই একলা হয়ে পড়েছে। এ এক করুণ বান্ধব-বিহীন জীবন। খোদাতালার অভিশাপ।

একদিন বললেন, 'মানুষ যখন নিজেকে ঈশ্বরের উপভোগ্য করে গড়ে তুলতে পারে, তখনই সে নিজেকে ঈশ্বরকে এবং জগৎকে ঠিকঠিক উপভোগ করতে পারে— আর তবেই তার জীবন সার্থক হয়। অন্য সকলেও তার সংস্পর্শে আনন্দ লাভ করে। সকলকে সে আপন বলে অনুভব করে এবং ভালোবাসে। মনে রাখবে, সৃষ্টির কোন-কিছুরই ঈশ্বর-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নেই। সব কিছুই তাঁর অধীন এবং তাঁর উপর নির্ভরশীল।'

এর মধ্যে, এক ভক্তের শরীর খারাপ শুনে বললেন, 'নামধ্যানে কমতি পড়েছে। নামধ্যান, যজন-যাজন—এসব তো টনিকের মতো কাজ করে। ঐগুলি ঠিকঠিক চালিয়ে যেতে হয়।'

ইয়াদালি এবং দোখল কথা তুললে, বিনা জিয়াফতে বা দাওয়াতে অর্থাৎ নিমন্ত্রণ না পেয়ে কোথাও খাওয়া যায় কি না।

উত্তরে ঠাকুর ওদের বললেন, 'বিনা নিমন্ত্রণে খাওয়া যায় গুরু-বাড়ি, জমিদার বাড়ি এবং প্রতি–পালকের বাড়ি। আর বিনা আমন্ত্রণে খাওয়া যায় মুসাফির-অবস্থায়।'

ইয়াদালি এবং দোখল থাকা কালে ঠাকুর ওদের জন্যে নতুন এক এক সেট পোষাকের ব্যবস্থা করেছেন। ওদের সেই পোষাক পরিয়ে এবং ভালো মানিয়েছে দেখে ঠাকুর মহাখুশি। রসিকতা করে বললেন, এই পোষাক পরে নিজের গাঁয়ে ফিরে গেলে গ্রামবাসীরা তোমাদের চিনতে পারবে তো? উপস্থিত সকলকে আলাদা-আলাদা করে জিজ্ঞেস করলেন— কি গো, কেমন মানিয়েছে, কও।

সকলেই একবাক্যে বললে— দারুন মানিয়েছে।

ঠাকুরের স্বভাব হলো দিয়ে খুশি হওয়া। যে পেলো, সে যদি খুশি হয়, তবে তিনি মহাখুশি।

তাঁর দানসত্র খোলাই আছে। তিনি অন্ন দিচ্ছেন, বস্ত্র দিচ্ছেন, মান দিচ্ছেন, ভালোবাসা দিচ্ছেন— প্রাণ ভরিয়ে দিচ্ছেন। আবার দিচ্ছেন পরলোকের পাথেয়, মুখের কাছে তুলে ধরেছেন অফুরন্ত অমৃতের পাত্র। পরমপূর্ণকারী পরমপুরুষ ছাড়া এমন ভাবে কেউ পূর্ণ করতে পারে?

ঠাকুরের এই দানকাণ্ড দেখে এক প্রবীণ ভক্ত বললেন, লোকে গান্ধীজীর মুসলিম-প্রীতির কথা বলে, আপনার মুসলিম প্রীতিও তো কম নয়।

শুনে ঠাকুর বললেন, মুসলিম-প্রীতি কেন, মানুষ-প্রীতিই আগে। আগে মানুষ, তারপর হিন্দু-মুসলমান।

এক সময়ে বললেন, বাবা-মার উপর নেশা যাতে বাড়ে, তাই করা লাগে। নিজের আগ্রহ থেকেই তাঁদের ও তাঁদের প্রিয় যারা, তাদের দেওয়ার অভ্যাস করা লাগে। আবার তাঁরাও যদি ভালোবেসে কিছু দিতে চান, তাও প্রত্যাখ্যান করতে নেই— গ্রহণ করে নিজেকে ধন্য মনে করতে হয়।

মুম্বাই থেকে এক পুরনো ভক্ত এসেছেন। নাম-চন্দ্রকান্ত মেহ্‌তা। খুব ভক্ত মানুষ— কর্মী মানুষ— ত্যাগী মানুষ।

মেহ্‌তাকে দেখে ঠাকুর বললেন, প্রত্যেক রাজ্যে যাতে দীক্ষার সংখ্যা বাড়ে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখা লাগে। লোকের জন্যে করাও লাগে অনেক কিছু। এ জন্যে অবশ্যই অর্থের প্রয়োজন আছে। তবে সে অর্থ এমন ভাবে সংগ্রহ করতে হবে যাতে দেনেওয়ালা তোমাদের এই সংগঠনকে অর্থ দিয়ে কৃতার্থ মনে করে। তোমাদের ইষ্টদেবের আদর্শকে তেমন ভাবে তুলে ধরতে হয়। এর তুক হলো, গুরুদেবের আদর্শ নিজের জীবনে পালন করে তার লোকপূরণী ভাবধারার সত্যতা প্রমাণ করার সুকৌশলী চলন-বলনের অভ্যাস। অর্থাৎ তুমি যাকে অনুসরণ করছো, তোমাকেও অনেকটা তাঁর মতোই হতে হবে। লোকে তো শিষ্যকে দেখেই গুরুকে চেনে। তাই, এ ব্যাপারে খুব হুঁশিয়ার। তোমার বেচাল চলনায় তোমার গুরুর দুর্নাম হতে পারে। কাজেই, দায় তোমাদের অনেক।

॥ তেইশ ॥

একদিন সকালে বড়াল বাংলোর বারান্দায় বসে বললেন, কিছু কিছু দান করার অভ্যাসটা খুব ভালো। গুরুদেব, বাবা-মা, শিক্ষক, সাধু-সজ্জন প্রভৃতিকে নিত্যই সাধ্যমতো কিছু-না-কিছু দেওয়া ভালো। আর সাধারণ ভাবেই অনুসন্ধিৎসু সেবাবুদ্ধি নিয়ে চলা দরকার। এতে করে যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও ব্যক্তিত্ব বাড়ে। জীবনে বড় হতে গেলে এসব লাগে।

ঐ দিনই বললেন, সব বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও ইষ্টচলনে অস্খলিত থাকাই বাঁচার পথ।

এক ভক্ত সঙ্গে সঙ্গে বললে, 'কিন্তু তা পারা খুবই কঠিন।'

'কঠিন হোক, সোজা হোক, করা এবং পারা ছাড়া উপায় নেই।'

আশ্রমের নিকটবর্তী করণীঝগের এক ভক্ত একটি ভালো চাকরি পেয়েছে— সেই খবর এসেছে আশ্রমে। ঠাকুর তখনি তার বাড়িতে লোক পাঠিয়ে তাকে চাকুরিস্থলে রওনা হতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু চাকরিপ্রাপ্ত ছেলেটি আবহাওয়া খারাপ থাকায় সেদিন রওনা হলো না। সেই দিনেই মধ্যরাত্রে সে বিষধর সাপের কামড়ে মারা যায়। ঠাকুর সব শুনে বললেন, 'ঐ জন্যেই সন্ধ্যের আগেই তাকে কর্মস্থলে রওনা করে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কথা শুনলো না, আমি অসহায় হ'য়ে পড়লাম— কিছু করতে পারলাম না।'

এই রকম কত যে ঘটেছে, তার ইয়ত্তা নেই। সকলের ভবিষ্যৎই তিনি আগে থেকে দেখতে পেতেন এবং তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করতেন। যে তাঁর নির্দেশ মতো কাজ করতো, রক্ষা পেতো আর যে তাঁর নির্দেশ অগ্রাহ্য করতো, সে বিনষ্ট হতো— তিনি শুধু কষ্ট পেতেন। যে মরবেই, সে সহস্র নিষেধ অমান্য করে নিজের খেয়ালে চলতো। পরমপুরুষকে অসহায় হয়ে তার মৃত্যু দেখতে হতো।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে ডাঃ প্যারীচরণ নন্দীকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আজকাল ডাক্তার-কবিরাজরা যেভাবে চিকিৎসা করে, তাকে চিকিৎসাই বলা চলে না। কোন রোগীর চিকিৎসা করা মানে কী, তার কিছু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা পরমপিতার দয়ায় আমার আছে। আমার চিকিৎসায় কোন রোগী মারা যায় নি। আমার হাত থেকে অন্য ডাক্তারের হাতে গিয়ে অনেক রোগী মারা পড়েছে। যে-সব রোগী বা রোগীর লোক পট করে অন্যের ফুঁসলানিতে রোগীকে আমার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতো তাদের ভিতর অনেক রোগীই নষ্ট হতো। তাদের জন্যে আমি মনে ব্যথা পেতাম, কিন্তু ছিলাম অসহায়। আমার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমার হাতের বাইরে চলে যাওয়ায় আমি তাদের বাঁচাতে পারতাম না।'

আরও বললেন, 'ডাক্তারের প্রথম কাজ হচ্ছে রোগীর ভিতরে ভালো করে ঢোকা। তার রোগের কারণ খুঁজে বের করা এবং মূল ধরে কম ওষুধে তার চিকিৎসা করা।' ঠাকুর হয়তো সেই কারণেই বলেছেন, 'প্রথম শ্রেণীর মনোবিজ্ঞানী না হতে পারলে ভালো ডাক্তারও হওয়া যায় না। নচেৎ, আন্দাজে ঢিল ছোড়ার মতো এক কাঁড়ি ওষুধ খেতে দিলে রোগ আরও জটিল হয়ে গিয়ে রোগী নষ্ট হয়। ডাক্তারের কর্তব্য হলো রোগকে খতম করা, কিন্তু তারা ভুল-বশত রুগীকেই খতম করে বসে।'

আরও যোগ করে ভক্তদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'এই রকম ডাক্তারি চারায়ে দেখতে পারো, তার ফলটা কী রকম হয়। যতদিন আমি এই ভাবে চিকিৎসার ব্যাপারটা চালাতে পেরেছি, আশ্রমের একটা পিঁপড়েও মারা পড়েনি। অনন্ত মহারাজ, কিশোরী— ওদের মতো ছোট গ্রাম্য ডাক্তাররাও এই পদ্ধতিতে কত বড় বড় রোগের চিকিৎসা করে রোগীদের বাঁচিয়ে তুলেছে। সেই রকম চিকিৎসা আবার ফিরায়ে আনা লাগে। তোমরাই আবার নতুন করে লেগে যাও— ডাক্তার সমাজ নতুন করে চিকিৎসা-বিজ্ঞান নিয়ে আবার চিন্তা ভাবনা করুক। নতুবা, পয়সা খরচ করেও রুগীকে বাঁচানো যাবে না। রোগের সঙ্গে পথ্যের কী সম্পর্ক, তা আজকালকার ডাক্তার ভেবেই দেখে না। এই দিকটা কবিরাজরা ভাবে, কিন্তু কবিরাজের সঙ্গে ডাক্তারদের তো ঝগড়া নেই। উভয়েরই দায়িত্ব—মানুষকে সুস্থ করে তোলা। এ ্য অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তাররা যদি আয়ুর্বেদ থেকে পথ্যজ্ঞানটা শিখে নেয়, তবে সে ছোট হয়ে যাবে না, ভালো চিকিৎসক হতে পারবে।'

একদিন প্রকাশ্যে সবাইকে লক্ষ্য করে বলেই ফেললেন— প্রত্যেক দিনই কোন না কোন গুরুজনকে কিছু দেওয়া ভালো।

কথাটি সকলেই কানে নিলেন। কানের সঙ্গে প্রাণেও নিলেন ভক্ত হরিদাস সিংহ। তিনি রোজ সকালে কিছু না কিছু আনতে লাগলেন শ্রীগুরুদেবের জন্যে। একদিন সকালে রুমালে বেঁধে এনেছেন নিজের হেঁসেল বাগানের কতগুলি করলা এবং কয়েকটি মিষ্টিকুমড়োর ফুল— বড়া করে খাওয়ার জন্যে।

ঠাকুর হরিদাসের নিত্য-অভ্যাস লক্ষ্য করে খুশি হলেন এবং বললেন, 'হরিদাসের এই অভ্যাটা অন্যেরও অনুকরণ-যোগ্য। এটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলে যোগ্যতা, উদারতা, ইষ্টপ্রাণতা ও আন্তর-বিস্তার যে কত বেড়ে যায়, তা কওয়া যায় না। তখন অভাব বলে কিছু থাকবে না, শত্রু বলে কেউ থাকবে না, আপসে-আপ সবাই আপন হয়ে যাবে। বান্ধববন্ধন তৈরি হয়ে সবাইকে নিয়ে তৈরি হয়ে যাবে এক নতুন পরিজন। মানুষ আপন করার এই তুক আধুনিক বিচ্ছিন্ন জীবনে ঐক্যবন্ধনের এক অমোঘ মন্ত্র।'

বললেন, 'করে দেখলি তবে বোঝা যায়। এর চেয়ে ভালো সেবার তুক আর নেই, যা মানুষের সঙ্গে মানুষের হৃদয়কে এত নিবিড়ভাবে বেঁধে দিতে পারে।'

একবার ঠাকুরের সেবায় নিযুক্ত মায়েদের মধ্যে প্রচণ্ড ঝগড়া বাধে। ঠাকুর নির্বিকার মনে সকলের অভিযোগই শোনেন। শুনে বললেন, 'আমি যদি কাউকে ভালোবাসি, তবে আমার উদ্দেশ্য হবে, তিনি যাতে সোয়াস্তি পান, তাই করা। আর সেজন্যে নিরভিমানতা, সহিষ্ণুতা, ক্ষমাশীলতা, প্রীতিপ্রবণতা প্রভৃতি হবে আমার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। অন্যে আমাকে আঘাত করলেও আমি তাকে সে-আঘাত ফিরিয়ে দেবো না বরং, যাতে শান্তি বজায় থাকে এবং অন্যায়কারী নিজে থেকেই তার ভুল বুঝতে পারে।'

একদিন ঋত্বিগাচার্য এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করলেন ঠাকুরকে। প্রশ্ন হলো, মানুষের মধ্যে অন্যকে আকর্ষণ করার শক্তি বাড়ে কি-ভাবে।

ঠাকুরের উত্তর হলো— 'মানুষ যত অচ্যুতভাবে ইষ্টকে ভালোবাসে, ততই তা তার ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে এবং তার ফলেই অন্যেরা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়।'

প্রশ্ন উঠেছে সত্তাশত্রুর বিনাশ কি ভাবে হয়। মানুষ বিপদে পড়ে যদি ঈশ্বরকে ডাকে, তবে কি তিনি সাড়া দেন?

উত্তর হলো, তিনি তো সেই আকুল আকুতিই চান। অমনতর অবস্থা তৈরি হলে তিনি স্বতঃই অবতীর্ণ হন। সাধুত্রাণই তাঁর কাজ।

আরও বললেন, 'আমরা সমষ্টি-কল্যাণের জন্য সংকল্পবদ্ধ হলেই তাঁকে পাই, ইতিহাস তাই বলে।'

একদিন শিবাজীর কথা উঠতে বললেন, 'শিবাজীর পিছনে ছিলেন একজন বেদজ্ঞ গুরু— রামদাস যাঁর নাম। তাঁকে অনুসরণ করেই শিবাজী রাজ্য শাসন করতেন। শিবাজী-কাহিনীতে আছে, গুরু রামদাস একদিন ঝুলি নিয়ে ভিক্ষায় বেরুলে শিষ্য শিবাজী— তাঁর সমগ্র রাজ্যের দানপত্র করিয়ে প্রণামপূর্বক তাঁর গৈরিক ঝুলিতে অর্পণ করেছিলেন। রাজ-গুরু রামদাস সেই দলিল হাতে নিয়ে পাঠ করে সেই দানপত্র স্বীকার করে নিলেন এবং পুনরায় তা শিবাজীকে ফেরত দিয়ে বললেন, বাবা শিবাজী, তোমার দান গ্রহণ করলাম, কিন্তু আমি সংসারত্যাগী, রাজ-চালনা আমার কাজ নয়—তুমি আমাকে প্রদত্ত এই রাজ্যকে নিজের রাজ্য মনে করে এর শাসনকার্য চালাতে থাকো— এই রাজ্যে যেন ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে। তুমি গুরুর সেবাইতের মতো এই রাজ্যের সিংহাসনে বসে তাঁর কাজ চালিয়ে যাও!'

শিবাজী গুরুর নির্দেশমতো রাজ্য শাসন করতেন, রাজ্য-পরিচালনায় গুরুর ইচ্ছাকেই অনুসরণ করতেন, কিন্তু বাইরের লোককে তা জানতে দিতেন না। অথচ ভিতরে তিনি ছিলেন রামদাসের দাস।

গুরু ছাড়া কারও জীবনে কোন সফলতা আসে না। এক এবং অদ্বিতীয় যিনি তাঁকে আমাদের মানতে হবে, কৃষ্টিবাহী পিতৃপুরুষকে মানতে হবে। বৈশিষ্ট্যপালী সার্বজনীন বর্ণধর্ম এবং চতুরাশ্রমক্রমিক আশ্রমধর্ম মানতে হবে আর মানতে হবে পূর্বাপূরক যুগ-পুরুষোত্তমকে। তাঁকে মানার মধ্য দিয়ে সমাজজীবন ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকে। আর সকল পূর্বগামী মহাপুরুষগণের সম্পূরক বর্তমান পুরুষোত্তমের অনুসরণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে পরম সাফল্যের চাবিকাঠি।

১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর মাসের কথা। গণমান্য সৎসঙ্গী প্রকাশচন্দ্র বসুর পুত্র মেন্টু বসুর এক প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর বললেন, 'ঈশ্বরের ঐশ্বর্য থেকেই সমগ্র জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। মজার কথা হলো, এ অখণ্ড সত্তা থেকে সৃষ্ট হয়েও প্রত্যেকে কিন্তু আলাদা— প্রত্যেকেই তার তার মতো। এক থেকে বহু হয়েছে, অথচ বহুর প্রত্যেকটি আবার স্বতন্ত্র— অর্থাৎ আলাদা। প্রত্যেকে এক কেন্দ্রসত্তা থেকে জাত হয়েও স্ববৈশিষ্ট্যে পৃথক। সেইজন্যে তাঁকে হতে হয় বৈশিষ্ট্যপালী। নতুবা সকলের জনকরূপে তিনি সর্বপূরক হতে পারেন না। এক অভিন্নসত্তা থেকে সব-কিছুর জন্ম হওয়া সত্ত্বেও সকলে হুবহু এক নয়। একৈক জনক পুরুষের এটাও এক লীলা। সেই জন্যেই এক থেকে উদ্ভূত হয়েও সকলে আলাদা-আলাদা, বৈশিষ্ট্যের বহুতার ফলে মানসিকতাও আলাদা। বর্ণ–বিভাগও হয়েছে বৈশিষ্ট্যের বহুতা থেকে।'

মেন্টু বসুর পুনরায় প্রশ্ন ঃ একই যদি মূল, তবে এই মনোজগতের প্রবণতা এক-এক জনের এক- এক রকম কেন? এত রকম পেশাই বা কেন?

উত্তর হলো ঃ আমার মনে হয়, প্রাথমিক আমলে সকলে জীবিকা-হিসাবে একই কর্ম করতো। সেটা হলো কৃষিকর্ম। এই কৃষিকর্ম করতে করতেই কেউ কেউ হয়ে উঠলো কৃষির ব্যাপারে বেশি জ্ঞানী। তারা হলো কৃষি বিজ্ঞানী। এই কৃষি বিজ্ঞানীরা হলো ব্রাহ্মণ। কেউ-কেউ কৃষির জন্য মেহনত দিতে লাগলো, ফসলকে রক্ষা করার জন্যে নানা ভাবে প্রয়াস চালাতে লাগলো, কিছু লোক কায়িক শ্রম দিয়ে— জলের সেচ দিয়ে, আগাছা উপড়ে ফেলে কৃষিকে সাহায্য করতে লাগলো— তারা হলো ক্ষত্রিয়। আবার উৎপন্ন ফসল নিয়ে কিছু গৃহস্থ ব্যবসা-বাণিজ্য করতে লাগলো, তারা হলো বৈশ্য। আর যারা কৃষির নানা স্তরে

কৃষককে সহায়তা দিতে লাগলো—কায়িক শ্রমের মাধ্যমে, তারা হলো শূদ্র। এই চার বর্ণের মধ্যে সকলেরই প্রয়োজন রয়েছে কৃষিকে সার্থক ও সফল করে তোলার জন্যে। কাজেই মনে হয়, একটা নির্দিষ্ট পেশার মধ্যেও চার বর্ণের স্ব স্ব ভূমিকা থাকতে পারে। কাজেই বলা যায়, কোন একটি পেশায় সাফল্য অর্জনের জন্যে চারবর্ণের মানুষেরই প্রয়োজন হতে পারে।

পরে এক-একটা বিশেষ বিভাগ তৈরি হয়ে এক এক বর্ণের মানুষ পুরুষানুক্রমে সেই কাজ করে একটা বর্ণগত বৈশিষ্ট্যের ধারক হয়ে উঠেছে।

॥ চব্বিশ ॥

'ইষ্টপ্রাণতা হলো ইঞ্জিন আর ভাবধারা হলো লাইন'— কথাটি ঠাকুরের।

একদিন বললেন, 'সংসারে প্রত্যেকে—এমন কি শিশুরাও যদি কিছু আহরণ করে অভিভাবককে পুষ্ট করে তুলতে পারে তাতেও সকলে বেড়ে ওঠে। কিন্তু আহরণ করে ট্যাঁকে গুঁজলে কিছু হবে না। আহরণ করে সংসারের মুরব্বিকে দেওয়া লাগে। তাতে কৃতজ্ঞতাও বাড়ে। যোগ্যতাও বাড়ে।'

সেদিন ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার। নিজের প্রদত্ত বাণীগুলি বিষয়ে একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করলেন ঠাকুর। নিজেই নিজের মুখথেকে নিসৃত ঈশ্বরদত্ত বাণীনিচয় সম্পর্কে যা বললেন, তা হলো এই রকম— 'এই মালগুলি চোস্ত মাল। এগুলি শোনা কথা নয় বা কোন বই থেকে পড়া কথা নয়— কারও উক্তি থেকে ধার-করা জিনিস নয়। মানুষের জন্যে ভেবে-ভেবে করে-করে জীবন ঝাঁঝরা করে দিয়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, এগুলি তারই ভাষারূপ— পরমপিতার দান। এগুলি আপনগতিতে বেরিয়ে এসেছে, তাই এগুলির শিরোনাম হয় না। কেবল পারম্পর্যক্রমে সাজিয়ে নিতে হয়— তাহলেই হলো।'

আরও বললেন, 'আমি যে বইটই পড়িনি, ধর্মতত্ত্ব-বিষয়ে কারও সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গেও কিছু শুনিনি, তা আমার পক্ষে পরমপিতার আশীর্বাদ-স্বরূপ। এতে করে অন্য কারও চিন্তার ছোপ এতে লাগেনি— এগুলির মধ্যে অন্য কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির ভাব-ভাবনার রং বা আভাস নেই। আমার পড়াশুনো থাকলে বা অন্য কারও সঙ্গে আলোচনা করা থাকলে এমন ষোল-আনা নিজস্ব চিজ বেরুতো না। এ একবারে শিবচন্দ্রের ছাওয়াল অনুকূলচন্দ্রের অনুভূতি নিংড়ানো কথা।'

সাতশো বাণী দেওয়ার পর ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শ্রীমুখ থেকে আত্মসমালোচনার এই অপূর্ব উক্তি।

অন্য এক ভক্ত সমাবেশে বলেছেন, 'মানুষের পেশা তার বর্ণানুযায়ী হলে সেটাই সর্বোত্তম। একজন সংস্কারগতভাবে শিল্পী মানুষ। সে হয়তো কর্মস্থলে চামড়ার কাজ অর্থাৎ জুতো তৈরি করে, তখন তার তৈরি জুতোর মধ্যে শিল্পীভাবনার ছাপ থেকেই যাবে। যদি মাটির কাজ করতে যায়, তাহলেও প্রতিটি নির্মিত মৃৎকর্মের নমুনার মধ্যে থেকে–যাবে তার শিল্প চেতনার অভিজ্ঞান।'

একদিন ঠকানো এবং ঠকে যাওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা চলছে। ঠাকুর বললেন, 'আমাকে অনেক লোক ঠকিয়েছে এবং ঠকাচ্ছে— কিন্তু তাতেও আমি ঠকে যাইনি। মানুষের বদ মতলব জেনেও তার যাতে ভালো হয়, সেই চেষ্টা অবিরাম চালিয়ে গিয়েছি। আমাকে ঠকালেও অন্যকে জিতিয়ে নিয়ে যাওয়াই হলো আমার স্বভাব। আমি ভাবি, সবাইকে জিতিয়ে দিতে পারলেই আমার লাভ। মানুষকে হারানো আমার স্বভাব নয়— মানুষকে সব রকম ভাবে জিতিয়ে তাকে পরিপুষ্ট করে তোলার মজ্জাগত নেশাই আমার স্বভাব।'

আরও বললেন, 'মনে রাখবে, যতদিন আমি আছি অর্থাৎ তোমাদের মগজের মধ্যে আমার নিনড় প্রতিষ্ঠা আছে, ততদিন তোমাদের কোন ভয় নেই পরমপিতার আশীর্বাদে। আমার এই দেহটা না থাকলেও যার অন্তরে এবং কর্মের পরিচয়ে আমি আছি, তাকে যদি তোমাদের নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ দাও, তাহলেও তোমাদের ভয় নেই— তোমরা ঠিকই আমার কাছে থাকবে। কোনদিন বিপদে পড়বে না, দুঃখে কষ্টে পড়বে না।'

এই উক্তির পরের দিনই বললেন, দ্যাখো, শুধু টাকা-পয়সা দেওয়াই দেওয়া নয়, আবার অন্ন দান করা অথবা জামা-কাপড় দেওয়াই দেওয়া নয়, মুখের কথা বলেও মানুষকে উজ্জীবিত করা যায়— তাকে বাঁচিয়ে তোলা যায়।

বাপ-মায়ের উপর টান-সম্পর্কে এক সময়ে বললেন, 'আমি যদি মা-বাবাকে ভালো না বাসি, তবে আমার নিজেকেই পেতে পারি না। এইটুকু যার বোধের মধ্যে না থাকে অর্থাৎ যার সত্তা থেকে নিজ-সত্তা ফুটে উঠলো, তাকেই যদি উপেক্ষা করে, তবে তার কী দাম রইলো? সে কী করতে পারবে? তোমার জীবন-সত্তার উৎপত্তি যেখান থেকে, তাকে বাদ দিয়ে— তার ধার না ধেরে, তোমার জীবন নিরর্থক, তোমার জীবন বরবাদ।'

১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর। এ দিন সকালে বড়াল বাংলোয় বসে বললেন, 'আমি বুড়োদের মধ্যে গণ্য হতে চলেছি, এখন তোমরা কৃতী হয়ে উঠছো— এইটে যদি দেখতে পেতাম, তাহলে কিছুদিন বেশি বেঁচে যেতে পারি।' ঐ দিনের পরের দিনের কথা। বললেন, 'অভিমান বড় বাজে চিজ। অভিমান হলো নরকের মূল। অন্যের উপর এসে যেতে পারে কিন্তু অভিমানকে আস্কারা দিতে নেই, তার বদলে ভালোবাসার পথ ধরতে কসরত করতে হয়। সব সমস্যার সমাধান ঐ ভালোবাসায়। আত্মীয়ের রোগের দিনেও ঐটাই বড় ডাক্তার।'

ঐ দিনেই এক সময়ে শিরদাস কোঙার নামক এক শিষ্য বললেন, শরীরের জন্য কিছু করতে পারি না। এইটা একটা বিরাট বাধা। এইটা কী করে দূর করা যায়?

উত্তরে ঠাকুর বললেন,' কাজের চোটে শরীর সারে। চিন্তার মধ্যে রাখা লাগবে— এই কাম আমাকে করতেই হবে, খেলাপরুরা চলবে না। এই ঠেলায় অসুখের কথা ভুলে যাওয়া শুরু হয়। তখন পরমপিতার দয়ায় অসুখ কোন্ দিকে পালাবে, তা ঠিক পায় না। ওর সঙ্গে নাম। এর মতো চিজ আর নেই।'

এক সময়ে এক ভক্তকে উপলক্ষ্য করে বললেন, 'একটা ভুল কর্ম করলেই যে সব সময় মানুষ মাটি হয়ে যায়, অর্থাৎ এক্কেবারে খতম হয়ে যায়, তা কিন্তু নয়। ভুলকে ভালোবেসে ফেললেই বিপদ। বারবার ভুল করে ভুলের প্রতি প্রেমে পড়ে গেলেই বিপদ। ঐ থেকে সাবধান!'

একদিন বললেন, 'আমাদের এক রোগ আছে। আমরা ভাবি, আমরা যথেষ্ট পরিমাণে খেতে পাই না। কিন্তু আসল ব্যাপার হলো আমরা যা খাই, তা হজম করতে পারি না। ফলে অজীর্ণ হয়, পেটে গ্যাস হয়, অম্বল হয়— পুষ্টি না পেয়ে, নতুন রক্ত তৈরি না হয়ে মস্তিষ্ক দুর্বল হয়। আর চিন্তাশক্তি না থাকলে যা হবার তা'ই হয়—ক্রমশঃ উচ্চস্তর থেকে নিম্নস্তরে নেমে আসে।'

আরও বললেন,'আগের দিনে সৎসঙ্গের এই আনন্দবাজারে জলের মতো পাতলা ডাল আর নানাবিধ ভিক্ষের চালের সংমিশ্রণে যে অতি-তরল খিচুড়ি তৈরি হতো—মায়ের ব্যবস্থাপনায়, তাই খেয়ে কর্মীরা কত খেটেছে আর কেমন সুস্থ থেকেছে। সে দিনই গেছে আলাদা। খিচুড়ির একটা ভাজা-লঙ্কা পাতে পাওয়া গেলেই ভোজনকারী নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতো।'

একদিন কথা উঠলো, ইষ্টদেবের কাছে ভক্ত কী বলে প্রার্থনা জানাবে। কী প্রার্থনা করলে ভালো হয়।

ঠাকুর বললেন, 'বলতে হয়— প্রভু আমার, প্রাণেশ্বর আমার, জীবনদেবতা আমার! তুমি আমার চিরকাল থাকো— সারা বুক জুড়ে বিরাজ করো, আমার যা কিছু তোমাতে সার্থক হয়ে উঠুক। আমি যেন তোমার কর্মে ডুবে থাকি। এতেই মানুষ কৃতী হয়, ঐশ্বর্যশালী হয়। তাকে নিজের মনের মতো করে চাইতে নেই, নিজেকে তাঁর মনের মতো যাতে করতে পারি, তার জন্যে প্রার্থনা রাখতে হয়।'

১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের দশ তারিখ সময় অপরাহ্ন। ঠাকুর বসে আছেন বড়াল বাংলোর বারান্দায়। ভক্তবৃন্দ তাঁকে ঘিরে বসে তাঁর শ্রীঅঙ্গ এবং বদন-সৌন্দর্য্য উপভোগ করছেন।

'হিন্দু কোড বিল' সম্পর্কে ঋত্বিগাচার্য ঠাকুরকে অবহিত করছিলেন। বলছিলেন, আমাদের দেশের হিন্দু-বিধানকে তুলে দেবার চেষ্টা চলছে, যাতে ভারতের হিন্দুদের অনেক কুসংস্কার উঠে গিয়ে তারা পশ্চিমা সাহেবদের মতো আধুনিক চিন্তাধারা এবং অভ্যাস ইত্যাদির পথে চলে উন্নত হতে পারে। তারা ভাবছেন, হিন্দুদের আচার-আচরণ বিবাহ-সংস্কার অভ্যাস ইত্যাদি এ-যুগে অত্যন্ত অনুপযোগী এবং এ-কালে অচল—ঐগুলো থেকে মুক্ত হওয়া খুবই জরুরী।

ঠাকুর বললেন,'আমাদের নেতাদের এমন ক্ষমতা নেই যে, বিদেশীদেরই বুঝিয়ে দিতে পারে যে, আমাদের বিধানসমূহের মধ্যে এমন কল্যাণকর মাল আছে যা তোমাদের বিধানে নেই— তোমরা যেখানে-সেখানে ছেলে-মেয়ের বিয়ে দিয়ে কেমন ভাবে ঠকছো—কেমন সব ছেলেমেয়ে ঘরে আসছে— তাদের নিয়ে সমাজে কেমন সমস্যা তৈরি হচ্ছে— সে সব কথা বুঝিয়ে বলতে পারে না— তাদেরটাই গ্রহণ করে নিজেদের নীচতাই স্বীকার করে নিচ্ছে। এ সব নেতাই তো কৃষ্টিহারা। সমাজের প্রতি এরা বিশ্বাসভঙ্গে লিপ্ত।'

আসল কথা হলো, এই সব সমাজ-বিধাতাদের জন্মই তো প্রতিলোমজ বিবাহক্রমে। বৈজ্ঞানিক বিবাহ-বিধান ভঙ্গ করে এলোপাথাড়ি কাম-বিবাহের প্রচলন করলেন মাতব্বররা তার ফলেই তো এই রকম সমাজ নিয়ন্তাদের জন্ম। এর থেকে মুক্তি পাওয়া তো প্রায় অসম্ভব। এর পরিণতি থেকে রেহাই পেতে হলে এখন থেকে বৈজ্ঞানিক অনুলোম বিবাহ-প্রক্রিয়ার প্রচলন করা দরকার। বিশ্বাস ঘাতক কৃষ্টিবিরোধী সন্তানের জন্মই যাতে হতে না পারে, সেই দিকে দিতে হবে কড়া লক্ষ্য। নচেৎ দেশকে, সমাজকে যে আরও কোন স্রোতে ভেসে যেতে হবে, তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। অধঃপতনের শেষসীমা-সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই নেই। এ যে কত দুঃখের তা বলাই যায় না। বিধান ভঙ্গ করলে বিধাতা কিন্তু ছাড়বে না। বিধাতা অতি নির্মম।

॥ পঁচিশ ॥

শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি বাণী–সম্বলিত গ্রন্থ সম্প্রতি বেরিয়েছে। সেই প্রসঙ্গে ঠাকুর বললেন, 'এই বাণী–সমৃদ্ধ গ্রন্থ কাছে থাকা মানেই আমি সঙ্গে থাকা।'

একদিন বললেন, 'প্রধান কথা হলো— ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয় এবং সর্বজন-উপাস্য। প্রেরিত পুরুষগণ অভিন্ন। যুগ-পুরুষোত্তমে পূর্বতন প্রত্যেকেই বর্তমান। যুগ-পুরুষোত্তমের অনুশাসন সর্বদা পালনীয়।'

এর সঙ্গে যোগ করলেন, 'মূলকথা সব দিয়ে গেলাম। যা যা দিলাম, তা ঠিকভাবে মেনে চললে ব্যষ্টি ও সমষ্টির উন্নতির জন্যে যা-যা প্রয়োজন তার কোনটাই বাদ থাকবে না।'

আবার তাঁর বলা আছে, 'কর্মীদের একটা একাগ্র উদ্যম থাকা চাই। নেশাধরা মানুষ হওয়া লাগে।......'

এর সঙ্গে আরও বলেছেন, 'যারা সহজে ব্যথা পায় অপমান বোধ করে বা মুষড়ে পড়ে, তাদের দ্বারা কিন্তু কাজ হয় না। আনেকটা বেহায়ার মতো লেগে থাকতে হয়।'

৯ অক্টোবর, ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের একটি উল্লেখযোগ্য উক্তি। তখন বড়াল বাংলোর বারান্দায় বসে আছেন ঠাকুর ভক্তগণ পরিবৃত হ'য়ে। যার যে ভাবনা, সেই দৃষ্টিতে দেখছে সাক্ষৎ ইষ্টবিগ্রহকে।

এক সময়ে বললেন একটি নিরেট তত্ত্বকথা। বললেন, 'একদল মানুষ জন্ম নেয় ভগবৎ-নেশা নিয়েই। তারা অন্য কিছু চায় না— অন্য কিছুতে ভোলে না। জন্ম থেকেই তারা কী যেন খোঁজে। আর সেটা না পাওয়া পর্যন্ত তাদের শান্তি থাকে না, স্বস্তি থাকে না। তাঁকে না পেলে যেন জীবন বাঁচে না। এই গুরু-পুরুষকে পেলে তাঁকে আর কিছুতেই ছাড়ে না। ইহকাল-পরকালের মতো তাঁর কেনা–গোলাম হয়ে যায়। এই ঝোঁক নিয়ে ঐ সব লোকের জন্ম। এরা তাই জন্মগত সংস্কারবশতঃ চট্‌ক'রে ইষ্টপ্রাণ হয়ে ওঠে। একেবারে গুরুগত হয়ে এই জাতকেরা জীবন কাটায়।'

১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর মঙ্গলবার দেওঘরে বড়াল বাংলোর হাতায় যতি-আশ্রমের শুভ সূচনা।

প্রথম নির্বাচিত যতিরা হলেন— অধ্যাপক শরৎ হালদার , নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রভৃতি। পরে আরও কয়েকজন যতি শ্রেণী-ভুক্ত হন। এঁদের প্রতি নির্দেশ হলো বাড়ির লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্ক না রেখে এ টিনের ঘরে থাকবে— পরস্পর সেবা দেওয়া-নেওয়া করে দিন চালাবে এবং প্রতিক্ষণ ইষ্টকর্মে মশগুল থাকবে। বেশি প্রয়োজন হলে লোক মারফত বাড়ির খবর নিতে পারে—এই মাত্র। গৃহের আঙ্গিনা মাড়ানোই চলবে না। যতি-জীবন হবে এক পুরোপুরি ইষ্টনিবেদিতপ্রাণ তৎকর্মসর্বস্ব নতুন জীবন। বলা যায় ইহজগতে থেকে ইষ্টজগতে বাস করা। যতিরা আর গৃহস্থ থাকবে না, তারা হবে— অন্য জগতের বাসিন্দা, ইষ্টকর্ম ব্যতীত জীবনের অন্য কোন স্বপ্ন বা সাধ নেই। বৌ-ছেলেমেয়ে কেমন আছে, কার কেমন ভাবে দিন চলছে, কার সমস্যা সমাধান কেমন করে করা যায়— এসব মাথায় থাকবে না। প্রত্যেকে হবে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। জীবনে ইষ্ট ছাড়া অন্য কিছুই থাকবে না।

বললেন, এই আশ্রম-প্রাঙ্গণেই তিন- শয্যাবিশিষ্ট দুখানা শোয়ার ঘর আর একটা রান্নাঘর তুলে দিচ্ছি— ছায়ার মধ্যে। ঘিরে দেওয়া হবে বাঁশের বেড়া দিয়ে। ভিতরে নিজেরাই ফুলের গাছ করবে, থানকুনির চাষ করবে, টুকটাক সবজিও তৈরি করতে পারবে। যতিরা সারাদিন ইষ্টধান্ধায় ঘুরে বেড়িয়ে দুপুরের স্নানাহার এবং রাতের নিদ্রার জন্যে এখানে আসবে। এ হবে পুরোপুরি আশ্রম-সমধর্মী এবং সমকর্মী কিছু সন্ন্যাসীর জন্যে। এর পবিত্রতা যেন সুরক্ষিত থাকে।

প্রত্যেকের প্রতি নির্দেশ হলো, নিজেরা বাড়ি ফিরে গিয়ে নিজের বিছানাও আনতে পারবে না। এইক্ষণ থেকেই এরা যতি। গামছা-বিছানা-মগ-বালতি, জামা-কাপড় যা আনতে হবে, তা অন্যেরা গিয়ে এনে দেবে। নির্দেশমাত্রই নতুন জীবন শুরু। এদের নিজের থালা-বাসন, এরা নিজেরা ধোবে, নিজের জামা-কাপড় বিছানাপত্র নিজেরা পরিস্কার করবে। কেউ কারও থালা-বাসন-ঘটি-মগ নাড়বে না। নিজের সব কাজ নিজে হাতে করতে হবে।

কেউ কেউ ঠাকুরের বাক্যোচ্চারণের ক্ষণ থেকেই রয়ে গেলেন বড়াল বাংলোর মধ্যেই— আর বাড়ি গেলেন না।

শুরু হলো নতুন যতি-আশ্রমের নতুন যতি-জীবন।

এখন কৃষ্টিবান্ধব করার যুগ চলছে। নতুন কৃষ্টিবান্ধবদের পইপই করে বলে দিচ্ছেন— 'ইষ্টভৃতি কষে করবে। অমন মাল আর নেই। ওতে করে শক্তি ঠেলে বেরিয়ে পড়বে। কিছুতেই আটকাবে না।'

আরও নির্দেশ দিলেন— 'ভোরে ওঠে সন্ধ্যা-আহ্নিক ও ইষ্টভৃতি করে কাজে বেরুবে। দেখবে, কিছুতেই আটকাবে না।'

অন্য একদিন বলেছিলেন, 'ইষ্টভৃতির অশেষ ফল। ও রকম রক্ষাকবচ আর নেই।'

বলেছেন, 'রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতের কথা শুনেছো? সে যুদ্ধে যাবার আগে বসেছিল নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করতে। নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সমাপ্ত করতে পারলে সে হতো অজেয়— তার পতন ঘটা অসম্ভব হতো। কিন্তু সে যজ্ঞ শেষ করতে পারেনি, তার আগেই তার মৃত্যু ঘটানো হলো।'

আমি কই, 'ইষ্টভৃতি করে যে রাস্তায় বেরোয়, সে ঐ নিকুম্ভিলাযজ্ঞের ফল লাভ করে। সে অমর অজেয় হয়ে কর্ম সমাপন করে ঘরে ফেরে।'

এ যে কী চিজ, তা করে পরীক্ষা করো।

ইষ্টভৃতি করে ইষ্টনাম নিয়ে কাজে বেরোলে তুমি সুরক্ষিত থাকলে। তোমার বিনাশ বা বিপদ অসম্ভব।

ওরই মধ্যে এক সময়ে বিদেশী ভক্ত অ্যান্টনি অ্যালেঞ্জি মিত্তামকে বললেন, 'আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না, ধর্মের বহুত্ব চিন্তা কেমন করে এলো। প্রত্যেক প্রফেট বা প্রেরিত পুরুষই তো দেশ-কাল-পাত্রানুযায়ী বাঁচা-বাড়ার নীতি বিধান প্রচার করেছেন এবং এই ব্যাপারে পূর্বগণকে স্বীকার করেছেন। অথচ আমরা নির্দ্বিধায় তাঁদের বাণী ও জীবনধারাকে অগ্রাহ্য করে প্রবৃত্তিমুখী চলনায় চলে নিজেদের স্ববংশে নিধনকার্যে ব্যস্ত রয়েছি।'

বললেন, 'আমার মনে হয়, যে প্রেরিত পুরুষদের কোন একজনকে মানে— অন্যদের মানে না, সে কাউকেই মানে না।'

'এটাকে কওয়া যায়— দুষমনির বুদ্ধি।'

'এটা মানুষ বোঝে না যে, ওঁরা সবাই এক। ওঁরা এক সত্তা থেকেই যুগে-যুগে এক-এক দেশে নরত্রাণের জন্যে এক কথাই বলতে আসেন। যুগের দাবিমতো কিছু নতুন সমস্যার মোকাবিলা করে যান। ধর্মসংস্থাপনের জন্য যুগে-যুগে তাঁর আবির্ভাব ঘটে। মানুষের প্রয়োজনে তিনি রাম হয়েছেন। কৃষ্ণ হয়েছেন। বুদ্ধ হয়েছেন, যীশু হয়েছেন, নূরনবী মহম্মদ (দঃ) হয়েছেন, শ্রীচৈতন্য হয়েছেন, রামকৃষ্ণ হয়েছেন। এঁরা প্রত্যেকই তাঁর নিজের কালের কিছু সমস্যার সমাধান তো দিয়েছেনই, উপরন্তু শাশ্বত জীবন বৃদ্ধির নিয়মনীতি ও কলা কৌশল পুনঃপুনঃ মানুষের কাছে হাজির করে তাদের ধর্মমুখী করে তোলার প্রচেষ্টা

চালিয়েছেন। যারা তাঁর সেই যুগ-দেহকে ইষ্ট বলে স্বীকার করে নিয়ে জীবন সর্বস্ব করে নিয়ে তাঁর পথে চলেছে, ইতিহাসে তাঁরা ধার্মিক বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। বস্তুতঃ তাদের মাধ্যমেই মানব সভ্যতা টিকে আছে এবং ক্রমঃ বিকশিত হয়ে চলেছে।'

ঐ অক্টোবর মাসেরই মাঝামাঝি একদিন বললেন, 'যজ্ঞ হলো আমাদের কৃষ্টির প্রতীক— কৃষ্টির স্বীকৃতি। ওতে পরিবেশ পবিত্র হয়, বায়ু দূষণমুক্ত হয় আর সেই দূষণমুক্ত জীবনদ উপকরণযুক্ত বায়ু গ্রহণ করে মানুষ ও জীবজগৎ সুস্থ হয়, সবল হয়। সামগ্রিক ভাবে, তাই যজ্ঞের ফলে মানুষসহ জীবজগতের বহু রোগ-নিরাময় ঘটে এবং আয়ুবৃদ্ধি হয়। জীবনী-শক্তি সমৃদ্ধ হয়। এটা গোটা পরিবেশে টনিকের মতো কাজ করে— বায়ুবাহিত জীবাণুগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং বায়ুদূষণ নিবারিত হয়ে পরিবেশের সামগ্রিক স্বাস্থ্য স্থিতিশীল করে।'

আমরা অনেক ভালো ভালো সংস্কারকে প্রাচীন বলে সেগুলিকে চিন্তাশক্তিবিহীন বুদ্ধ মানুষের কর্মকলাপ বলে সেগুলিকে শুধু পরিত্যাগই করিনি রীতিমতো ঘটা করে সেই সব সংস্কারের প্রবর্তকদের নির্বোধ বলে প্রচার করে থাকি। এই কাজটি করে আমাদের শিক্ষিত এবং জ্ঞানালোকিত বুদ্ধিমান সভ্য মানুষ বলে জাহির করি।'

ঠাকুর একদিন বললেন, 'একজন খ্রিষ্টান যদি ভগবান যীশুকে ভক্তি না করে কৃষ্ণকে মানে, তার কৃষ্ণকে মানা হয় না। আবার একজন গোবিন্দভক্ত যদি তার পূর্বপরুষকে এবং গোবিন্দ ভজনাকে ত্যাগ করে যীশুকে ভজনা করতে যায়, তাহলেও কিন্তু যীশু চোখ বুজলেন— জীবন থেকে তিনি বিসর্জিত হলেন।'

হিন্দু মুসলমাদের বিবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতার কথা যখন ওঠে, তখন, দেখা যায়, শিক্ষিত এবং উদার বলে দাবিদার হিন্দুরা হিন্দুদেরই নিন্দা করে, বলে— এজন্যে হিন্দুরাই দায়ী। এ সম্বন্ধে ঠাকুর বললেন, 'আমি তো তার উল্টোটাই দেখি। মুসলমানদের জন্যে হিন্দুদের যা করা দেখেছি, তার তুলনা হয় না। হিন্দু-মুসলমানদের সদ্ভাবের দৃষ্টান্তও আমি অনেক দেখেছি।'

'হিন্দুরা যে কত উদার এবং প্রীতিপ্রবণ, তা হিন্দুরাই জানে না। মহত্বের ভান করে নিজেদের হীন মনে করলে যে কত নীচ হয়ে যেতে হয়, হিন্দুরা তাও জানে না। জাতি হিসাবে নিজেদের হীন এবং দীন বলে প্রচার করার অধিকার তাদের কে দিলো? এই ঘৃণ্য মূঢ়তা তাদের মনে ঢুকলো কী করে। হিন্দুদের মতো এতো বিরাট এবং উদার সভ্যতা, পৃথিবীতে দ্বিতীয় নেই। হিন্দুজাতি সমগ্র পৃথিবীর সকল ধর্মমতের রক্ষকের কাজ করেছে— ধ্বংসকারীর ভূমিকা নেয় নি।

হিন্দুজাতি বিশ্বসভ্যতার গর্ব। মানবিক কৃষ্টি এবং শুভ সংস্কার সমূহের প্রবর্তক। একজন প্রকৃত ধর্মপ্রাণ হিন্দু মানবজাতির বন্ধু এবং সমগ্র বিশ্বের সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদি প্রবর্তক এবং বর্তমানের রক্ষক। দুর্ভাগ্য এই যে, এই হিন্দুরা হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু জাতিকে চেনে না। নিজেদের হিংসুক এবং হীনমনস্ক বলে প্রচার ক'রে মানুষের চোখে উদার বলে প্রমাণিত হতে চায়। বাস্তব ক্ষেত্রে তা হয় না। নিজেদের চিনতে হয়— ইতিহাস জানতে হয়। নিজেদের বিশাল বিরাট জাতীয় পরিচয় এবং স্বধর্মনিষ্ঠা ও ধর্মসহিষ্ণুতার যে ইতিহাস হিন্দুজাতির ইতিহাসে যুক্ত আছে, তার পৃষ্ঠা— উল্টে দেখে না। হে হিন্দু সন্তান, তুমি মনে রেখো, তুমি না জাগলে বিশ্বসভ্যতা নিরাপদ নয়। মানব সভ্যতার শত্রু এবং মানবজীবনে সন্ত্রাসের সৃষ্টিকারীরা ক্রমশঃ বেড়ে উঠছে হিন্দুদের আত্মবিস্মৃতির সুযোগ নিয়েই। হিন্দুর মতো আত্মসংহত এবং পরমত সহিষ্ণু এক বিশাল বিশ্ব-জাতির এই দুর্দিন যে কত দুর্ভাগ্যজনক, তা ভাবলেও শরীর শিউরে ওঠে।'

হিন্দু! তুমি গোঁড়ামি এবং সংকীর্ণতার প্রতীক নও— তুমি বিশালতা, উদারতা এবং মহত্ত্বের প্রতীক! তুমি এই গ্রহের মনুষ্যজাতির মঙ্গলরক্ষক। শুধু মানব জাতির নয়, জীবজগতের প্রতিটি সত্তার বন্ধু তুমি। অজীব অর্থাৎ প্রাণহীন বলে কথিত বস্তু নিচয় এবং আবিশ্বের সমগ্র স্থূল ও সূক্ষ্ম সত্তাসমূহের আত্মিক সুহৃৎ ও তাদের সঙ্গে সাত্ত্বত সমতার আবিষ্কারক এই হিন্দু সন্তান— তুমিই আত্মবিস্মৃত হলে সমগ্র পৃথিবীর অকল্যাণ। তোমার পতনের অর্থ সমগ্র বিশ্বের পতন। তুমি টলমল করলে মানব সভ্যতার অস্থিরতা অনিবার্য। হিন্দুর আত্মবিস্মৃতি অর্থ মানবজাতির বিপদ।

॥ ছাব্বিশ ॥

১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের মধ্যকাল। সকাল বেলায় বড়াল বাংলোয় বসে আছেন। ভক্তগণ তাঁকে ঘিরে বসে তাঁর বাণীসুধা পান করছে এবং দৈবী তনু দর্শন করে জীবন ধন্য করছে। নানা কথা বলতে বলতে এক সময়ে বললেন, 'মানুষকে ভালোবাসতে গিয়ে তার অন্যায়কেও যদি ভালোবাসি, তাহলে কিন্তু সেই মানুষটার সঙ্গে শত্রুতা করাই হলো। এ হ'লো কেমন? একটা মানুষকে ভালোবাসতে গিয়ে তার মারাত্মক রোগটাকেও ভালোবাসার মতন। রোগটাকে ভালোবাসা মানে রোগটাকে প্রশ্রয় দেওয়া। রোগের তোয়াজ করে তাকে হঠানো থেকে নিরস্ত হওয়া। কোন মানুষকে ভালোবাসা মানে তার রোগটাকেও ভালোবাসা নয়। মানুষটাকে ভালোবাসা মানে তাকে রোগগ্রস্ত করে রাখা নয়— তাকে রোগমুক্ত করা— তাকে সুস্থ সতেজ করে তোলা।'

একদিন নৈহাটির এক ভক্ত ইষ্টচরণে নিবেদন করলে, 'আপনার কথামতো নামধ্যানও করছি আর যাজন ইত্যাদি কর্মও করছি, কিন্তু মাঝে অবসাদ যেন পেয়ে বসে, তখন মুস্ড়ে পড়ি— কিছুই ভালো লাগে না।'

শুনে ঠাকুর বললেন, 'অবসাদকে আমল দিতে নেই। যা করণীয় তা করে যেতে হয়। মন তো ওঠানামা করেই—ওটাই ওর ধর্ম। জানবে, যে মন আজ অবসাদে বসে যাচ্ছে, সেই মনই একটু ইষ্টনেশা আর একটু নাম নিষ্ঠা পেলেই মাথা চাড়া দিয়ে জেগে উঠতে পারে।'

বললেন, 'সদাচার পালন করবে। অস্থানে কুস্থানে খাবে না। যার তার হাতে খাবে না। নাম করবে। এই ভাবে চলবে। সবই তো বলা আছে। মেনে চললেই ফল পাবে। না ঘাবড়ায়ে কাম করে যাও!'

সব বিধানই বৈজ্ঞানিক। কোনটাই মনগড়া বা আজগুবি না। এখন তোমার করা আর ফল পাওয়া।

একদিন একজন জিজ্ঞেস করলো, আমরা করছি, তার সঙ্গে যদি আসন, প্রাণায়াম ইত্যাদি করা যায়, তবে তা কেমন হয়?

'আরে, তোমার ওসবে কাম কী? ঠিকমতো না হলে তো খারাপও হতে পারে। যে সোজা পথ পেয়েছ, তাই করে যাও! অন্য কসরত করতে যেও না। যা পেয়েছো, ঐটাই তো চরম বস্তু!'

এক সময়ে বললেন, 'ঐক্যবিধৃত বৈশিষ্ট্য ও বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত ঐক্য জিনিসটা আর্যকৃষ্টির মূল কথা। আমরা একাকার চাই না। একই বহু হয়ে আছেন বহু বৈশিষ্ট্য নিয়ে। আমার পাঁচটা ছেলে মানে পাঁচ রকমে আমি। আমারই পাঁচটা রূপ।'

একদিন জনৈক শিষ্য তার সাংসারিক অসুবিধার কথা জানালে ঠাকুর উত্তরে বললেন, 'ইষ্টভৃতি ঠিকমতো করে যাও। ইষ্টভৃতিই হলো পরম ঢাল— আত্মরক্ষার বর্ম। ইষ্টভৃতি ঠিক থাকলে সব গুছিয়ে নিতে পারবে।'

একবার এক বিহারী শিষ্য প্রার্থনা জানালেন, 'আমি যেন অন্তিম কালে ভগবানের নাম স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করতে পারি।'

বহু মানুষের এই একই প্রার্থনা। ভক্ত যেন সকলের হয়ে প্রার্থনাটি জানালেন।

উত্তরে ঠাকুর বললেন, 'অচ্যুত হয়ে তাঁকে অনুসরণ করো। সদাচারে থাকো। ভগবান তোমাকে কৃপা করবেন।'

বিরাট ভরসার বাণী উচ্চারণ করলেন ঠাকুর।

একজন শিখ সৎসঙ্গী এসেছেন ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি থাকেন ব্রহ্মদেশে। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'প্রেমভক্তি আসে না কেন?'

ঠাকুর বললেন, 'অমন কথা ভাবতেই নেই। প্রেমভক্তি আছেই, নাম করতে করতে আরও বেড়ে যায়। সঙ্গে চাই ইষ্টভৃতি। ইষ্টভৃতিতে নামভক্তি সব বাড়ে। হৃদয়ে প্রেম আসে। এর মতো জিনিস নেই।'

অনেক কথাবার্তা হলো সিং-জির সঙ্গে।

এক সময়ে সিং-জি প্রশ্ন করলেন, 'একজন সৎসঙ্গী ম'রে কী হবে?'

'সে আরও ভালো জন্ম লাভ করবে।' উত্তর দিলেন ঠাকুর। আরও বললেন, 'সে যদি নামপরায়ণ হয়, তবে পরমপিতা তাকে টেনে তোলেন— সে কুলমালিকের সাহায্য পায়।'

বিরাট একটা ভরসার বাণী শুনলেন সিং-জি। শুনলো পৃথিবীর সকল ইষ্টশরণাগত মানুষ।

সিং-জির অন্য এক প্রশ্ন ঃ সব অবতারের শক্তি কি এক রকম?

উত্তর দিলেন ঠাকুর ঃ প্রতিপদের চন্দ্র আর পূর্ণিমার চন্দ্র একই চন্দ্র। এক-এক সময়ে এক-এক রকমে ধরা পড়ছে।

এমন তাৎক্ষণিক উত্তর এত বিজ্ঞান-মাধুর্যে ভরপুর— যা ভাবাই যায় না। একেই বোধ হয় বলে— দৈবী বাণী! ঈশ্বরীয় প্রতিবেদন!

আবার প্রশ্ন ঃ সব যুগেই কি এক নাম?

উত্তর ঃ যে যুগে যেমন প্রয়োজন।

আরও বুঝিয়ে দিলেন ঃ যেমন রেডিওতে শর্ট ওয়েভ, লং ওয়েভ, মিডিয়াম ওয়েভ প্রভৃতি আছে, তেমনি যে-যুগে যেমন ওয়েভ ও নামের প্রয়োজন, সেইটেই প্রকট হয়।

চরম বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রশ্নের কী মজাদার শৈল্পিক উত্তর।

ব্যাখ্যাচ্ছলে আরও বললেন ঃ বর্তমান যুগের সৎনামের মধ্যে পূর্বতন প্রত্যেক যুগের সব নাম কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে।

পরবর্তী অবতার পূর্বতর অবতারের আরোতর রূপ। মানে, আরও যুগোপযোগী বিকশিত রূপ, কিন্তু প্রকারে আলাদা নয়। পূর্ণিমার চাঁদ যেমন প্রতিপদের চাঁদেরই বিকশিত রূপ। বস্তু হিসাবে দুই চাঁদ আলাদা নয়।

সিং-জির আবার প্রশ্ন ঃ স্বামীজি-মহারাজই তো সর্বোচ্চ বীজ বা আদিধ্বনি প্রকাশ করলেন। আগে তো এই বীজ পাওয়া যায় নি।

উত্তর ঃ স্বামীজি সর্বোচ্চটা দিলেন কিন্তু আগের ক্ষুদ্রতর নাদেরও তো বোদ্ধা তিনিই। নাদের প্রত্যেকটি বৃত্তেরই তিনি বোদ্ধা। মূল থেকে তৎকালীন বর্তমান পর্যন্ত তাঁর জানা। তবেই তো তিনি দ্রষ্টা এবং বোদ্ধা। তিনি নিজেই ব্রহ্ম।

আরও বললেন ঃ এঁরা হলেন যুগের পূরক। যখন মানুষের জ্ঞানের চাহিদা আরও বাড়বে, তখন তিনি সেই চাহিদা পূরণের জন্যে আরও সূক্ষ্মতর নাদের খবর দিবেন। সবটাই মানুষের প্রয়োজনে। তুমি যত চাও, তাঁর কাছে তার থেকে আরও কিছু বেশি মজুত আছে। তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডার অফুরন্ত। তিনি দেনেওয়ালা, আদি থেকে ক্রমবিস্তার-শীল সব-কিছুই দেন— যুগে-যুগে অবতীর্ণ হয়ে।

সিং-জির পুনঃ পৃচ্ছা— কাল ও দয়ালের পার্থক্য কী?

দয়াল ঠাকুরের জবাব— কাল হলো সৃষ্টি, দয়াল হলো দয়া— করুণা। দয়ালের কাছে কাল প্রার্থনা করে সৃষ্টির জন্যে। আবার কালের মধ্যেও দয়ালের শক্তি ক্রিয়া করে সৃষ্টির জন্যে। দয়ালের সঙ্গে সংযোগ না থাকলে শুধু কাল তো মেরে ফেলে দেয়।

আরও বললেন— আত্মার তরঙ্গ মন। সেই তরঙ্গের উপর সৃষ্টি হতে হতে চললো।

পুনশ্চ প্রশ্ন— মহাপুরুষেরা আসেন কোথা থেকে, দয়ালধাম থেকে, না, অন্য কোথাও থেকে?

'এক-এক সময়ে এক-এক তলা থেকে।' উত্তর দিলেন দয়ালধামের মালিক। 'যেমন প্রয়োজন, তেমন ভাবে আসেন। শ্রীকৃষ্ণকে যদি খাটো করে দেখি, তবে দয়ালকেই খাটো করা হয়। তিনিই রামচন্দ্র, তিনই বুদ্ধ, তিনিই যিশু, তিনিই স্বামীজি-মহারাজ।'

সিংজির আবার জিজ্ঞাসা ঃ তাঁদের কি শক্তির তারতম্য থাকে?

'পরবর্তীকে দিয়ে পূর্ববর্তী পরিপূরিত হন। কিন্তু তাই বলে পূর্ববর্তী ছোট নন। প্রত্যেক অবতারই প্রয়োজন অনুযায়ী একেরই আবির্ভাব।' উত্তর পেলেন সিং-জি।

'শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?' আবার প্রশ্ন হলো সিং-জির তরফ থেকে।

'হুজুর মহারাজ ও তাঁর পূর্ববর্তী মহাপুরুষদের বোঝার পথ সহজ করার জন্যেই তাঁর আবির্ভাব।' উত্তর দিলেন ঠাকুর।

সিং-জি আবার প্রশ্ন করেন ঃ একই মানুষের দল কি যুগে যুগে সদ্‌গুরুর সান্নিধ্য লাভ করেন?

উত্তর ঃ নতুনও আসে।

প্রশ্ন ঃ জন্মজন্মান্তরের সংস্কার কাটে?

উত্তর ঃ নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্রশ্ন ঃ ঐ সংস্কার কতদূর যায়?

উত্তর ঃ গভীর অনুরাগ নিয়ে গুরু-অনুসরণ করলে গুরুতে ডুবে যায়। তখন শ্রীগুরুই সংস্কার হয়ে যান।

সত্যযুগের তাৎপর্য কী?— আবার প্রশ্ন করেন সিং-জি।

'সত্যযুগ হলো ঐক্যের যুগ। এই যুগে সেবা-প্রীতির ভিতর দিয়ে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়।'

এই উত্তরের সঙ্গে আরও জুড়ে দিলেন ঃ এই যে ভারত-বিভাগই হলো, এটা সত্যযুগের বিপরীত।

প্রশ্ন হলো ঃ মুক্ত আত্মা কি আর নতুন দেহ নিয়ে ফিরে আসে না?

উত্তর ঃ প্রয়োজন হলে আসে। মুক্ত আত্মারা থাকে ঈশ্বরকে ঘিরে।

এই সিং-জি শ্রীশ্রীঠাকুরের সৎনামে দীক্ষা গ্রহণ করলেন ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের বাইশে অক্টোবর শুক্রবারে। দীক্ষাগ্রহণান্তর আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন ঠাকুরের।

ঠাকুর উত্তরে বললেন, 'আশীর্বাদ আছেই। পরমপিতা সবাইকে দেখেন। তাঁর প্রতি যার যত প্রেম, সে ততই মঙ্গলের অধিকারী হয়।'

২৫শে অক্টোবর সোমবার, ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দ। বিদেশী ভক্ত অ্যান্টনি অ্যালেঞ্জি মিট্‌টাম এলো ঠাকুরের কাছে— কিছু দিন বাদে।

ঠাকুর তাকে দেখে খুব খুশি হলেন। অ্যালেঞ্জি দেওঘরে এসে ওঠে পুরাণদহের আশ্রম-সংলগ্ন গোলাপবাগে। কথাপ্রসঙ্গে অ্যালেঞ্জি বললে, গোলাপবাগ-বাড়িটা আমার দেশের নিজের বাড়ির মতো ঠেকে। গোলাপবাগে এসে বাইরে কোথাও এসে আছি বলে মনে হয় না।

উত্তরে ঠাকুর বললেন, 'তোমাকে দেখে আমারও তেমনি মনে হয়। তুমি আমার খুব কাছের জিনিস। আমার বড় খোকা, আমার মণি— এরা বাইরে থেকে আশ্রমে ফিরে এলে আমার যেমন নিশ্চিন্ত খুশির ভাব আসে, তুমি আশ্রমে ফিরলেও আমার তেমন নিশ্চিন্তির ভাব আসে। নিজের আত্মজের সঙ্গে তোমাদের কাউকে আলাদা মনে হয় না।'

তাই তো তিনি পরমপিতা— সকলের আদিপিতা। কারও সম্বন্ধেই কোন প্রকার ভেদবুদ্ধি নেই। একেবারে আত্মবোধ, সকলের সম্বন্ধেই সকলের সঙ্গে এই একাত্মভাবোধ নিয়েই যুগপুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র।

॥ সাতাশ ॥

একদিন আকাশের ভগবান এবং মানুষরূপী ভগবান সম্বন্ধে তুলনামূলক একটা প্রসঙ্গ উঠলো। ঠাকুর বললেন, 'আকাশের ভগবানকে মানা সহজ কিন্তু মানুষ-ভগবানকে মানা বেশ কঠিন। আকাশের যে ভগবানকে কল্পনা করা যায়, সে ভগবান কথা কয় না, কোন নির্দেশ দেয় না; পথ দেখায় না— তাঁর খুশি-অখুশির কথা টের পাওয়া যায় না। কিন্তু যে ভগবান কথা বলে, আদেশ করে, নির্দেশ দেয়, খুশি হলে আশীর্বাদ করে, গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়, বুকে টেনে নেয়, সেই মানুষ-ভগবানকে মেনে চলা অবশ্যই কঠিন। আকাশের ভগবান খুশিও হন না, রুষ্টও হন না। তাঁকে নিয়ে মনের মধ্যে যেমন ইচ্ছে ছবি আঁকো—তাঁতে তাঁর কিছুই এসে যায় না। এতে করে আকাশের ভগবানকে মেনে চলারও কোন প্রশ্নই আসে না— তাঁকে মেনে চলে ধর্মের পথে লাভবান হওয়ারও কোন প্রশ্ন আসে না। তাই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েও আকাশের ভগবানকে সুখী বা বিবর্তিত হওয়া যায় না। প্রবৃত্তির চাহিদাপূরণ মাত্র করা যায়।

নাস্তিক্যবাদ সম্বন্ধে কথা উঠতে ঠাকুর বললেন, 'নাস্তিক্য কথাটা সোনার পিতলে ঘুঘুর মতো। আমি আছি আমার এই অস্তিত্ব নিয়ে। আমি চলছি, ফিরছি, কথা বলছি, খাচ্ছি, বাঁচতে চাইছি অনন্তকাল— অথচ বলছি, আমি নাস্তিক। তা

হয় কী করে? ভগবানের অস্তিত্ব না মানলেও নিজের অস্তিত্ব তো অস্বীকার করার উপায় নেই। নাস্তিকতা কথাটা অনেকটা অন্য-নিরপেক্ষতার সমার্থক। যেখানে জন্ম নিতেই লাগে দুইজন, সেখানে অন্য–নিরপেক্ষতার কোন অর্থ হয়?'

এক সময়ে বললেন, 'পুরুষের জীবন মা-ছাড়া মরুময়।' বললেন না যে, বউ ছাড়া মরুময়!

একদিন প্রবুদ্ধ ভক্ত শরৎ হালদার মশাই-এর কথা ধরে বললেন, সদাচার তিন রকম। আধ্যাত্মিক সদাচার, মানসিক সদাচার এবং শারীরিক সদাচার। সত্তাস্পর্শী ইষ্টানুরাগ হলো আধ্যাত্মিক সদাচার। সৎচিন্তন, সৎকথন সকলের কল্যাণকামনা, সকলের সঙ্গে সদ্‌ব্যবহার— এই সব মানসিক সদাচার। আর অশন, বসন, স্নানপান সর্বকর্মে শুচিতা রক্ষা ইত্যাদি শারীরিক সদাচারের মধ্যে পড়ে। তিন রকমের সদাচারে অভ্যস্ত হতে পারাটাই ভালো।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বললেন, 'মনের মধ্যে কখনও কোন কুৎসিত চিন্তা এসে গেলেই যে মানুষ পচে গেল, তা কিন্তু নয়। প্রবল ইষ্টানুরাগ থাকলে ওসব ধুয়েমুছে যায়।'

বললেন, 'তবে কুচিন্তাকে প্রশ্রয় দিতে নেই। তাকে উপেক্ষা করতে হয়— বাধা দিতে হয়। তা'হলে ওটা আপনা থেকেই বিদায় নেয়।'

এই প্রসঙ্গে আরও বললেন, 'যতি-আশ্রমের কয়েকটা মানুষ যদি ঠিকমতো গড়ে ওঠে, তবে সৎসঙ্গীদের ভোল ফিরে যাবে। তাদের প্রভাবেই ভারত আবার দেবভূমি হয়ে উঠবে। আর তার ঢেউ ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীর সবখানে।'

ব্রাহ্মণোচিত চলনা প্রসঙ্গে একদিন বললেন 'ব্রাহ্মণোচিত আচার-চলনের প্রয়োজন সকল বর্ণের মানুষের জীবনেই আছে। কারণ, ব্রাহ্মণোচিত চলনে সবাই পরিপূরিত হয়। বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সকলেরই আচরণ হতে হবে ব্রাহ্মণোচিত। ব্রাহ্মণ মানে ব্রহ্মজ্ঞ— আদ্যন্ত জ্ঞানাধীশ। তবে এটা হতে হবে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের উপরে দাঁড়িয়ে— বর্ণহরণ করে নয়।'

একদিন এক ভক্ত বললেন, 'আপনি যে কখন নাম করেন তা আমাদের পক্ষে বোঝা মুশকিল।'

সেই প্রসঙ্গে নামাধীশ অনুকূলচন্দ্রের জবাব হলো, 'নাম আমাকে ছাড়েনা। নাম করতে করতে তা নিঃশ্বাসের মতো সহজ হয়ে যায়। স্বতঃ নাম চলতে থাকে, তাকে কষ্ট করে জপ করতে হয় না।'

তবে শুধু নামই সব নয়। নামীর প্রতি টান থাকা চাই। নামী-পুরুষকে ইষ্ট করে তদ্‌গত হয়ে তাঁর ইচ্ছা পূরণ করে চলার সঙ্গে নাম করতে হয়।'

এক সময়ে এক ভক্ত বললেন, 'ভালো-মন্দ যাই করি, তার ইচ্ছাতেই তো করি। যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি। এ কথার মানে তো তা'ই।'

'হ্যাঁ, কিন্তু কথাটা দুর্যোধনের। দুর্যোধনের চরিত্র যার, সে ঐ রকম কয়।'

খাবার জিনিস তৈরি করা, ভাত-ডাল-তরকারি রান্না করা প্রভৃতি নিয়েও আলোচনা হয় মাঝে মাঝে। একটি মা বললেন, জলখাবারটা তৈরি করা একটা বড় সমস্যা— এতে বৈচিত্র্য আনা বেশ কঠিন। মোটামুটি একঘেয়ে হয়ে পড়েই। বরং প্রধান আহার প্রস্তুততিতে বৈচিত্র্য আনা সম্ভব।

শুনে ঠাকুর বললেন, 'সব খাবারেই বৈচিত্র্য আনা সম্ভব। একটু মাথা খাটালেই ফরমুলা বেরিয়ে আসে। যেমন ধরো, খইই কত রমের আছে— যেমন, সাধারণ খই, ঢ্যাপের খই, ভুট্টার খই, ভুরোর খই, কাওনের খই ইত্যাদি। একটা জলখাবার মুড়ি। নানা রকম মশলা-যোগে। আউস চালের মুড়ির যে কী স্বাদ, যে খেয়েছে, সেই জানে। আবার সরু সরু ক'রে মানকচু কেটে শুকিয়ে রাখা এবং প্রয়োজনমতো সেটা ভেজে ভাতের সঙ্গেই খাও আর মুড়ির সঙ্গেই খাও— তার স্বাদ কি কম। মচমচে আলুভাজা, কাঁঠলের বীচি-ভাজা বা কাঁঠালের বীচি দিয়ে মুগের ডাল কি কম সু-স্বাদু!'

বললেন, 'সাধারণ সহজলভ্য জিনিস দিয়েই সুস্বাদু জলখাবার বা প্রধান আহারের ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করা সম্ভব। চাই শুধু একটু রুচিবোধ এবং পুষ্টি জ্ঞান ও সেবার মনোভাব।' রন্ধন একটি রমণীয় শিল্প, এ বিষয়ে বহু গৃহিণীকে এবং বহু মেয়েকে ঠাকুর নানা পদ্ধতিতে নানাবিধ ব্যঞ্জন, শুক্ত, ঝোল, বড়া, ভাজা প্রস্তুত করার কৌশল শিক্ষা দিয়েছেন।

জনৈকা সুশীলা বিশ্বাসের একমাত্র ছেলে একান্ত অকালে মারা গেছে। সুশীলা মা ঠাকুরের কাছে বসে কান্নাকাটি করে শোক প্রকাশ করছে। সব ব্যাপারটাই ঠাকুরের জানা। 'কারও সম্বন্ধে কোন অমঙ্গলের আভাষ পেলেই তাকে বাইরে না যেতে দিয়ে আমার কাছে ধরে রাখতে চাই— যাতে তার দুষ্টগ্রহ কেটে যায়। কিন্তু মানুষ আমার কথা শোনে না। তোর ছাওয়ালের ব্যাপারও তো তাই। আমি চাইলাম ও আমার কাছে থাক, কিন্তু তোমার ছাওয়াল তার প্রবৃত্তির বশে ঘুরছে, আর তুমিও তার প্রবৃত্তি-পূরণে সুখী হতে গিয়ে তাকে সমর্থন করতে

লাগলে। আমি তখন অসহায়। তাই রুনুর জন্যে আমি কিছুই করতে পারলাম না। সকলের সব ফাঁড়াই এই ভাবে তাদের পেয়ে বসে। একটু গুরুগত হয়ে না চললে কি চলে?'

বললেন, 'পরমপিতা আমার মুখ দিয়ে যা বলান তা তো তোমরা শোনো না। ফলে যা হবার তা'ই হয়। আমি মৃত্যুকে রোধ করে দিতে পারি, কিন্তু তার জন্যে তো আমার কথা শোনা লাগে।'

একুশে নভেম্বর, ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দ, মঙ্গলবার সকাল বেলা। নতুন যতি-আশ্রম চালু হয়েছে। এদিকে-ওদিকে দাঁড়িয়ে থাকা শাল-সেগুন গাছের পরিবেশে সত্যি-সত্যি আশ্রমের দৃশ্যই ভেসে ওঠে চোখের সামনে। সব মিলে সুন্দর মনোরম দৃশ্য। ঠাকুর তার কাজকর্ম দেখা-শুনা করছেন। ওরই মধ্যে এক সময়ে কথা উঠলো প্রাদেশিকতা-সম্পর্কে। মন্তব্য করে ঠাকুর বললেন, 'আমি ও-সব প্রদেশ-ট্রদেশ বুঝি না— আমি বুঝি মানুষ। আমি বুঝি সব সম্প্রদায়ের এবং সব প্রদেশের মানুষের পরমপুরুষকে কেন্দ্র করে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। আমরা নিজেরা মারামারি করলে অন্যের আহার হয়ে পড়বো।'

'আমাদের স্বার্থ হলো বাঁচা এবং বাড়া। তার কায়দা-কৌশলের উপরেই জোর দিতে হবে। এর মধ্যে প্রাদেশিক মনন-বিলাসের কোন স্থান নেই। একজন অসমিয়া যদি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন, তিনিও বাংলার উন্নতিতে গর্বান্বিত হবেন। একজন বাঙালি প্রধানমন্ত্রী হলেও অসমবাসীর গৌরবান্বিত হওয়া উচিত। সবারই লক্ষ্য এক— সবাই মিলেমিশে বড় হওয়া। কাউকে বাদ দিয়ে কেউ একা বড় হতে পারে না।'

এই রকম সময়ে একদিন যতি-আশ্রমে বসে বললেন— 'তিন-চার তোলা কৃষ্ণ তিল ও চার-পাঁচটা কাঠবাদাম একটু কাঁচা লংকা দিয়ে মিহি করে বেঁটে রোজ ভাতের সঙ্গে খেলে সাধারণ স্বাস্থ্য ও দাঁতের পক্ষে খুব ভালো। এতে প্রোটিন ও ফ্যাট দুইই প্রচুর আছে।'

একদিন প্রদেশগুলির ভাষা-সম্পদ নিয়ে কথা উঠলো। এই প্রসঙ্গে ঠাকুর বললেন, 'সংস্কৃতই মূলভাষা। ভারতের রাষ্ট্রভাষা যদি করতে হয়, তবে সংস্কৃতকে করাই ঠিক। প্রধানতঃ সংস্কৃত থেকেই ভারতের প্রধান প্রধান প্রাদেশিক ভাষাগুলির জন্ম।' আবার বললেন, 'প্রত্যেক রাজ্যের বা প্রদেশের সরকারী কাজকর্ম নিজেদের প্রাদেশিক ভাষাতেই করা উচিত। তাতে লোকের সুবিধাও হবে এবং ঐ আঞ্চলিক ভাষার বিধিমতো উন্নতিও হবে।'

একদিন নির্মীয়মাণ যতি-আশ্রমে বসে বললেন, 'সিকিতোলা অশ্বগন্ধার মূল ঋতুস্নানের স্নানান্তে ভিজেকাপড়ে ভিজে-চুলে পরিষ্কার শীল-পাটায় দুধ দিয়ে বেঁটে মাসে একবার করে খেলে মেয়েদের নাড়ি ভালো হয়, জরায়ু সবল হয়, স্নায়ু-দৌর্বল্য সারে— ফলে, সন্তানও সুস্থ-সবল হয়। যাদের কন্যা-সন্তান বেশি— পুরুষ-সন্তান কম বা একেবারেই নেই, সেই সব মায়ের পক্ষেও এটা খুব ভালো।'

ঐ সময়ের মধ্যেই যিশু খ্রিষ্টের ভারত-আগমন সম্পর্কে কথা উঠতে ঠাকুর বললেন, 'আমার তো মনে হয় না যে, তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছিলেন। তাঁর পুনরুত্থানের কথা আছে। আমার মনে বলে, তিনি যোগবলে কবর থেকে উঠে সেখান থেকে ভারতের দিকে চলে এসেছিলেন। তাই, তাঁর ভারতে আগমনের গল্প একেবারে হাল্‌কা করে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এ বিষয়ে গবেষণা চাই। তাঁর স্বভাব, প্রকৃতি, ক্ষমতা প্রভৃতি সম্পর্কে সঠিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি চাই। মহাপুরুষকে বুঝে ওঠার মরকোচই তো এইটা। মনগড়া রকমের চলতি ধারণা তাঁকে সর্বপ্রকারে বুঝে ওঠার অন্তরায় ছাড়া আর কিছু নয়। সাধারণ কাজকর্মের মধ্যেও তাঁদের কাজকর্ম অসাধারণ। সেই সব মেনে নিয়েই মহাপুরুষদের বুঝতে হবে।'

আর বর্তমান প্রফেট বা দ্রষ্টা-পুরুষকে ধরা না থাকলে পূর্বতন কোন দ্রষ্টা-পুরুষের ক্রিয়াকলাপ যাকে আমরা তাঁর লীলা বলি, তা তত্ত্বতঃ বোঝা যাবে না। বর্তমান পরমপুরুষকে চিনলে তাঁর আলোতে পূর্বতনদের সহজে চেনা যায়— তাঁদের ক্রিয়াকলাপের সঠিক ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। বর্তমান যুগ-পুরুষই বর্তমানের সূর্য। তাঁর আলোতেই সকল প্রাক্তন আলোকিত হয়ে ধরা দেন।

॥ আটাশ ॥

নবগঠিত দেওঘর সৎসঙ্গ-আশ্রমে এসেছেন প্রখ্যাত কংগ্রেসনেতা জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী। তাঁকে সঙ্গে করে এনেছেন কাশীশ্বর রায়চৌধুরী এবং চিত্ত দত্ত। জ্ঞানাঞ্জনবাবু ঠাকুর প্রণাম করে তাঁর জন্যে রাখা বেঞ্চিতে বসলেন। ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে রায়চৌধুরী বললেন, 'উনি আমাদের প্রতিষ্ঠান এবং তার কর্মসূচী সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনেছেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি সব রকমের সহযোগিতা করার আশ্বাসও দিয়েছেন। এখন আমাদের সেগুলোর দিকে লক্ষ্য রেখে করিয়ে নেবার দায়িত্ব বর্তেছে।'

শুনে ঠাকুর একটু আবদারের সুরেই নিয়োগী-মশাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি কাশীর প্রতি নজর রাখবেন, ভালো কাজ করার ব্যাপারে ওর খুব উৎসাহ আছে। আপনাকে দয়া করে ওকে দিয়ে সব করিয়ে নিতে হবে।'

নিয়োগীমশাই প্রত্যুত্তরে বললেন, 'আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে, আমার দ্বারা যা-যা সম্ভব, তা করবো।'

নিজের থেকেই বললেন, 'কিছু দিনের মধ্যেই আমি পাটনা যাবো, ওখানে বিহারের মন্ত্রীদের সঙ্গে আমার বৈঠক আছে। দরকার হলে তাদের কাছেও আপনার বক্তব্য পেশ করবো। যা-যা দরকার আমাকে খেয়াল করিয়ে দেবেন। দেওঘরে যাতে কোন অসুবিধা না হয়, সেদিকে তাদের লক্ষ্য থাকবে।'

নিয়োগী-মশাইয়ের এই সহযোগিতামূলক প্রস্তাব শুনে ঠাকুর তাঁর দিকে স্মিতিসুন্দর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন, 'দেখুন দাদা, আমার কাজ মানে সৎসঙ্গের কাজ। আর সৎসঙ্গের কাজ হলো সব মানুষের সর্বাত্মক মঙ্গল-সাধনের কাজ। সকলের প্রকৃত ভালো না হলে আমি শান্তি পাই না। আর এ কাজে আপনারাই আমার ভরসা। আমার চাহিদা আর আপনার চাহিদা এক। আপনারা করার অধিকার রাখেন— ক্ষমতা রাখেন। আপনাদের করাই আমার করা। সবাই মিলে লোক কল্যাণের ব্রতে-ব্রতী হতে পারলে, আমার কাছে তা অসাধ্য বলে মনে হয় না। পরমপিতার দয়ায় আপনাদের মতো কাজের লোকদের সঙ্গে আমার দেখা হয় আর আমি সকলের দরবারেই এই আরজি রাখি। পরমপিতার মঙ্গলেচ্ছা তো আপনাদের হাত দিয়েই রূপায়িত হবে। তাই, কাজের লোক পেলেই আমি আমার আবদার পেশ করি।'

উত্তরে নিয়োগী মশাই বিনম্র বচনে বললেন, 'বিকেল পাঁচটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়ের বৈঠকখানায় থাকি। তাঁকে যদি কিছু বলার দরকার হয় তাহলে আপনার যে কোন লোক সেখানে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারেন। আমার পক্ষে যা সম্ভব, আমি করবো।'

যতি-আশ্রমের নির্মীয়মাণ ঘরদোর দেখতে আসেন ঠাকুর প্রায়শই। অনেক সময়ে এদিক-সেদিক ঘুরে দেখেন আবার অনেক সময়ে চেয়ারে বসে মিস্ত্রীদের কাজকর্ম দেখেন, তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। আবার ঐখানে বসে অধ্যাত্ম বাণীও দেন মাঝে মাঝে।

ঠাকুর-সম্বন্ধে একটি স্মরণীয় খবর জানা দরকার সকলেরই। ঠাকুরপ্রদত্ত নানা বিষয়ের উপরে নানা ছন্দের বাণীগুলি কিন্তু সবই এসেছে কর্মব্যস্ততার মাঝখানেই। এ জন্যে পৃথক ভাবে কোন ধ্যানধারণার প্রয়োজন হয়নি। কর্মের মধ্য দিয়েই ধর্মচেতনা এসে গিয়েছে স্বতঃ উদ্দীপনার পথ ধরে।

যতি-আশ্রমের কাজ দেখতে দেখতেই একদিন বললেন, 'কাজ হলো একটা তপস্যা। কাজের লক্ষ্য থাকবে ইষ্টের মুখে হাসি ফোটানো। এরই নাম নিষ্কাম কর্ম। এই ভাবে ইষ্টের কারণে নিষ্কাম কর্ম করতে করতে মানুষ অনাসক্ত, কৃতী এবং মুক্ত হয়।'

ঠাকুর কোন দিনই চাকরির পক্ষপাতী ছিলেন না। যাদের কর্মশক্তি প্রায় নিবুনিবু, স্বাধীনভাবে কিছু করার উৎসাহ উদ্দীপনা নেই— কোন দায়িত্ব বহন করতে রাজি নয়, চিন্তাশক্তি নিথর, যারা দারিদ্র্যব্যাধিগ্রস্ত, নিস্তেজ, গুরুহীন— তারাই ঝোঁকে সহজ চাকরির দিকে। দাসত্ব-প্রবৃত্তির বশে চললে, বুদ্ধি খোলে না, দারিদ্র্যও ঘোচে না, স্বাধীন সত্তার বিকাশও ঘটে না। ওটা একটা সংস্কার গত ব্যাধি। এর ফল হয় মারাত্মক। জেনো, ব্যক্তিত্ব এবং আনন্দ-লাভের প্রকৃষ্ট রাস্তাই হলো স্বাধীন কর্মের দ্বারা জীবিকা-অর্জনের রাস্তা। ব্যক্তিত্বকে বিকিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে আত্মানন্দের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব। আর আনন্দবিহীন জীবন তো মৃত্যুরই গুরুভাই।

একদিন এক ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বলেই ফেললেন, 'যত বড় মহাপুরুষই হন-না কেন, অপ্রীতিকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে জীবনের প্রতি একটা মারাত্মক অনীহা এসে হাজির হয়ে যায়। শুরু হয় বিসর্জনের বাজনা। যে মানুষের কল্যাণের জন্যে তাঁর নর-দেহ-ধারণ তাদের অসহযোগ এবং বিরোধের কারণে তখন তাঁর জীবনটাই হয়ে পড়ে দুর্বিসহ— দেহের প্রতি আর কোন মমত্বই থাকে না।'

ঠাকুর একদিন বললেন, 'এই দুঃখেই ভগবান রামচন্দ্রকে সরযুর জলে ঝাঁপ দিতে হয়েছিল।'

এঁরা কখনো নিজেকে ভালোবাসতে শেখেন নি— নিজেকে বাঁচাতে শেখেন নি। যাদের জন্যে এঁদের আগমন তারাই যদি এঁদের বিরোধে অবতীর্ণ হয়, তখন এদের আর আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি থাকে না— আত্মবিসর্জনের দিকে ঝুঁকে পড়েন। মনে রাখতে হবে, পরিত্রাতা যখন মানুষ হয়ে আসেন, তখন তিনি পুরোপুরি মানুষের স্বভাবে থেকেই কাজ করে যান। মানবিক সুখদুঃখ এবং মানবিক আচার-আচরণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন না। এই দিক দিয়েও এঁরা অনন্য।

একদিনের এক দুঃখের কথা। সময়— সন্ধ্যা। শ্রীশ্রীঠাকুর বসে আছেন বড়াল বাংলোয় নিজের ঘরে। সেখানে দর্শনে এলেন জ্যেষ্ঠপুত্র অমরেন্দ্রনাথ। প্রণাম করে বসলেন পায়ের কাছে। কথাক্রমে বললেন, 'আমাদের সৎসঙ্গের প্রেসের মতো প্রেস ছিল না। ঐ প্রেস এবং কারখানার যন্ত্রপাতি যদি কলকাতায় এনে বসানো যেতো, তাহলে কী যে হতো! কত লোকের কর্মসংস্থান হতো— ব্যবসাও চলতো কত রমরমা। সব দিক দিয়েই একটা কাজের কাজ হতো।'

'করা তো যেতো অনেক কিছুই। আর আমি যে তেমন ভাবিনি, তাও নয়। কিন্তু কর্মীদের রকম দেখে সাহস পাইনি। যখনই ভেবেছি, তখনই মনে হয়েছে— মানুষ কোথায়! আমি তো ঠকতেই আছি। যখনই দেখলাম, মর্যাদাসম্পন্ন লোক আমার জিনিস চুরি করে অস্বীকার করে, তখনই আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম! ভাবলাম, আমি যদ্দিন আছি, খেতে পারবে, পরমপিতার নাম ভাঙায়ে। আমি সরে গেলে এমনতর এক-এক জনের দাম পঞ্চাশ টাকা কি পনেরো টাকা হয় কিনা সন্দেহ!'

আবার কর্ম সম্পর্কে বললেন, 'আমার পরিকল্পনা মতো কিছু কাজ যদি সবাই মিলে করতো, তবে তো অনেক সমস্যারই সমাধান হয়ে যেতো। আমার পরিকল্পনা ছিল মানবজাতির কল্যাণ ও উন্নয়ন। কারণ, সকলের ভালো না হলে আমি নিজের ভালো করি না। নইলে, আমার নিজের জন্যে আবার ভাবনা কী! আমার কতটুকু লাগে। আমি ক পয়সাই বা খাই! পরমপিতার দয়ায় সেটুকু জুটবেই। যা করতে চাই বা করি, তা সকলের জন্যে— মানবজাতির জন্যে। কারণ, সবাই বাঁচলে তবে আমি বাঁচি। সকলের জীবন নিয়েই আমার জীবন। সকলের সত্তার মধ্যেই যে আমি আছি।'

বললেন, 'মানুষের জন্যে করতে গিয়ে প্রকৃত মানুষের অভাবে অর্থের অপচয়ও হয়েছে অনেক, তবু মানুষের সম্বন্ধে বিশ্বাস হারাইনি। মানুষকে যদি পুরোপুরিই হারিয়ে ফেললাম, তবে আমার অস্তিত্ব কোথায়? কাজেই খোঁড়া মানুষও একদিন দৌড়বে— এই আশা নিয়েই কাজ করে গিয়েছি।'

১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ২১শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার। সকাল বেলায় ঠাকুর বসে আছেন বড়াল বাংলোর হাতায় গোল তাবুতে। ঋত্বিগাচার্য কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য কাছে এসে দাঁড়াতেই বললেন, 'আপনি আমার জ্ঞান-বৃদ্ধির জন্যে যেভাবে পড়াশোনা করেন, তাই'ই আপনাকে বহু ব্যাপারে মহাজ্ঞানী করে তুলেছে। অন্যের প্রতি ভালোবাসার ফলেই এই ভাবে মানুষ কৃতী, কৃতবিদ্য এবং জ্ঞানময়

হয়ে ওঠে। আপনি তার বাস্তব উদাহরণ। আমার মনে হয়, আগের দিনের মুনি-ঋষিরাও এই ভাবে লোকশিক্ষার তাগিদে এক-এক জন বহুবিষয়ে মহাজ্ঞানী ও বাস্তব-বুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষ হয়ে উঠতেন। তাঁদের গুরুর জন্যে জ্ঞানবর্ধন—গুরুর জন্যে জ্ঞানাহরণ। আপনি এ যুগে তার উদাহরণ। দরকার হলে, গুরুকে জিজ্ঞেস করে প্রকৃত অর্থও উদ্ধার করে নিচ্ছেন।'

জনৈক বিহারবাসী শিষ্য এসেছে ঠাকুরের কাছে তার নানাবিধ বৈষয়িক অসুবিধার কথা জানাতে। আর কথা শুনে ঠাকুর বললেন, 'মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে, যাতে তোমার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা জন্মায়। আর যে নাম পেয়েছো, সেই নাম করে যাও কষে। মনে রাখবে, নামের মতো অস্ত্র নেই। নামই রক্ষাকর্তা। আর ইষ্টের প্রতি টান বাড়াতে হয়। ইষ্টের ঈপ্সিত কর্ম করে করে তাঁকে জীবনসর্বস্ব করে তুলতে হয়। এই গুলিই তো পরিত্রাণের পথ। এমন অমোঘ বস্তু পেয়েছো, ভয় কিসের?'

এমন সময়ে হাউজারম্যান আশ্রমে ফিরলেন। তাঁর কাছে খবর পাওয়া গেল, স্পেনসরের বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

ঠাকুর শুনে বললেন, 'বউ কেমন হয়েছে?'

হাউজারম্যান বললে, 'বউ খুব ভালো হয়েছে। আপনি যেমন চান, তেমনি হয়েছে। আমার মা বলেছে, এমন মেয়ে পাওয়া যায় না।'

শুনে ঠাকুর খুব খুশি হলেন।

কথা উঠলো সত্যযুগ সম্বন্ধে।

এক ভক্তের প্রশ্নোত্তরে ঠাকুর বললেন, 'যে যুগে মানুষ বিহিত পদ্ধতিতে কর্ম ক'রে উপলভ্য বস্তু পেতে চায়, সত্তা পোষণী কর্মে আনন্দ পায়, না করে কিছু পেতে চায় না, অলস হয়ে বসে থাকতে চায় না এবং কর্মোজ্জ্বল শুভপ্রসূ জীবনযাপন করে, সেইটাই সত্যযুগ।'

এক ভক্তের জিজ্ঞাসাঃ নাম কি মনে মনে নিঃশব্দে উচ্চারণ করতে হয়, না কি সশব্দে জোরে জোরে করা ভালো?

উত্তর ঃ মনে মনে নাম করলেই ফল বেশি হয়। শব্দ করে নাম করলে ততটা ফল হয় না। নাম তাই মনে মনে জপ্য।

অন্য এক ভক্তের প্রশ্নঃ দৃষ্টিশক্তি বাড়ে কিসে?

উত্তর ঃ নামধ্যান করলে চোখের দৃষ্টিশক্তি বেড়ে যায়। নামধ্যান করার পর দূরের সবুজ গাছ পালার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে দৃষ্টি-শক্তি বাড়ে। হঠাৎ একদিন দু'দিন করলে তেমন কিছু হয় না, নিয়মিত করলে দৃষ্টিশক্তি বাড়ে।

খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের আলোচনা উঠলো একদিন। সেটা হলো ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারি রবিবার। লগ্ন—প্রাতঃকাল। ঠাকুর বড়াল বাংলোর হাতায় গোল তাঁবুতে শুভ্র শয্যায় উপবিষ্ট। অন্যান্য ভক্তদের মধ্যে ব্রহ্মদেশ-প্রত্যাগত ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-মশাই আছেন সেখানে।

কথায় কথায় ব্রজেন চট্টোপাধ্যায়-মশাইয়ের জিজ্ঞাসা ঃ দেখা যায়, একজন অবতারকে ব্যাখ্যা করতে পরবর্তী কালে আর একজন অবতারের আগমন ঘটে। এখন আপনি যা দিয়ে যাচ্ছেন, তাকে দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা করার জন্যেও আপনার পরবর্তী পরমপুরুষ আসবেন তো?

ঠাকুরের সোজা সরল উত্তর ঃ হ্যাঁ, আসাই তো সম্ভব। তবে বহু বহু দিনের খোরাক দেওয়া থাকলো।

আবার কত বছর বাদে শ্রীশ্রীঠাকুরের পরবর্তী যুগ-পুরুষোত্তম আসবেন, তা নিয়ে গাণিতিক বছর নির্ণয়ের প্রয়োজন নেই। বিচার-বিবেচনা এবং ফলা-ফল লক্ষ্য করে অনুমান করতে হয়।

একটা গাছের জীবন নিয়ে আলোচনা করা যায়। বীজ থেকে নতুন চারা বেরুলে— সেই চারা ক্রমে বড় হতে লাগলো। তারপর একদিন সেই গাছ বড় হয়ে ফুলফল দিতে লাগলো। তার ফল থেকে তার দ্বিতীয় বংশধরের অভ্যুত্থান হলো। সেই গাছ বড় হয়ে ফল দিলো— নতুন ফল-চক্রের বংশ চলতে লাগলো।

এই স্তর কয়টি ধর্মচক্রের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। পরমপুরুষ তাঁর যুগে যুগানুপাতিক যা-যা দিয়ে গেলেন, সেগুলি মানুষের মধ্যে চারিয়ে যেতে বেশ অনেক বছর কেটে যায়। প্রথমে তো সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে বেশ অনেকগুলি বছর লাগছেই। সেইগুলি লোকাচারে প্রতিষ্ঠিত হবার পরে বেশ কিছুকাল তার স্থিতাবস্থা বজায় থাকছে। তারপর প্রাকৃতিক নিয়মে তাতে গলদ ঢুকছে, সে সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে। তখন পুনরায় ধর্ম স্থাপনের প্রয়োজন হচ্ছে। একে বলা যায়, ধর্মাধর্মের চক্র অর্থাৎ ধর্মের পর অধর্মের পুনরাগমন। তখন আবার যুগ-পুরুষোত্তমের পুনরাগমনের প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। সঠিক গণনায় এই পুনরাগমণের কোন কাল-সীমা নির্ণয় সম্ভব নয়। তবে, বলা যায়, কোন একজন

যুগ-পুরুষের সমাজ সংস্কার যত বেশি গভীর এবং ব্যাপকভাবে ঘটে। তার ফলও চলে বহু বছর ধরে এবং তাঁর পরবর্তীও সেই কারণে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন দীর্ঘকালের ব্যবধানে।

তাই বলা চলে, শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র যা-যা দিয়ে গেলেন, তা সংখ্যায়, ব্যাপকতায় এবং গভীরতায় অভূতপূর্ব। মানবজীবনে এগুলির ব্যাপক প্রতিষ্ঠা হতেও যেমন সময় লাগবে তেমনি সুপ্রতিষ্ঠার পর তাতে গ্লানি ঢুকতেও সময় লাগবে। বৃদ্ধি স্থিতি ও ক্ষয়—এই তিনটি পর্বের প্রত্যেক পর্বেই যাবে বহু বহু বছর। তাই বলা চলে, পুরুষোত্তম অনুকূলচন্দ্রের দ্বিতীয় বারের আগমন এখনও চিন্তার বাইরে। যা দিলেন, তা প্রতিষ্ঠা হতে এবং প্রতিষ্ঠার পর খরচ হয়ে যেতে লেগে যাবে বহু বহু বছর। পাঁচ থেকে সাত হাজার বছর হতেই পারে।

বন্ধু, এখন এটা অনুকূলচন্দ্রের কেবল যুগারম্ভ। এখন নিশ্চিন্তে তাঁর কর্ম করে যাও। এখন তোমার সর্বোচ্চ সুরক্ষার কাল। সংসার সমুদ্রে নিশ্চিন্ত মনে পাড়ি জমাও। এখন তুমি পুরো নির্ভয়।

॥ উনত্রিশ ॥

ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত–কর্মী প্রমথনাথ দে আশ্রমে এসে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। শুধু রক্তবমন হচ্ছে। ঠাকুরের ডাক্তার প্যারীচরণ নন্দী তাঁকে দেখছেন। ঠাকুর ঘন ঘন খোঁজ নিচ্ছেন। রক্তবমন বন্ধ করার জন্যে দেশী মতে আয়াপান-সেবনের ব্যবস্থা করেছেন। ডাক্তার প্যারী চরণের ব্যবস্থামতো কোলকাতা থেকে মূল্যবান ওষুধপত্র আনিয়ে রোগীকে সেবন করানো হচ্ছে। কিন্তু দে-মশাইয়ের জন্য ঠাকুরের সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি ঐ দিনেই অপরাহ্ণে মরদেহ ত্যাগ করে চলে গেলেন। সময় হচ্ছে ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি সোমবার। দারুণ শোকে এবং বিহ্বলতায় ঠাকুর বোবা হয়ে রইলেন।

আশ্রমের এবং পরিবারের শোক একটু থিতিয়ে এলে ঠাকুর একদিন বললেন, 'কতদিন থেকে পিছনে লেগেছিলাম, কিন্তু ঠেকানো গেল না।'

পরমপুরুষ তখনই কোন ভক্তকে ঠেকাতে পারেন যখন সেই ভক্ত আত্মরক্ষার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেন। নতুবা, ইচ্ছা থাকলেও তিনি কারও জন্যে কিছু করে উঠতে পারেন না। এখানে বিধাতা নিজেই অসহায়। ভগবান দু'পা এগিয়ে এলে ভক্তকে অন্ততঃ এক পা এগিয়ে আসতে হবে। গরজহীন ব্যক্তির জন্যে তাঁর করার কিছুই থাকে না। ঈশ্বর আত্মনিবেদনকারীর পক্ষে যেমন দয়াময়, পলায়নপর ব্যক্তির পক্ষে তেমনি নির্মম।

বিধাতা যদি এই বৈধানিক কঠোরতাটা না মেনে চলতেন, তবে তাঁর সৃষ্টি থেকে প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস, নিষ্ঠা, আত্মনিবেদন কবে লোপাট হয়ে যেতো।

দে-মশাই গত হয়ে যাবার পর একদিন কথা উঠলো তাঁর সম্বন্ধে। সেই প্রসঙ্গে কবুল করে বললেন, 'প্রমথদার ব্যাপারটা আমি আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম। সেই জন্যেই তাঁকে চোখছাড়া করতে চাইতাম না। কিন্তু আমি চাইলেই তো তা হয় না, যার জন্যে এটা চাচ্ছি, তারও সহযোগিতা থাকা চাই। এই জন্যেই বলা হয়, বিধাতা অসহায়। চোখের সামনে যে এই রকম কত ঘটে গেল— আমি অসহায় হয়ে শুধু দ্রষ্টা হয়ে রইলাম।'

পুরুষোত্তম কৃষ্ণ যে বলেছেন— ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি। এ কথার তবে অর্থ কী?

মনে রাখতে হবে, যে ষোল-আনার জায়গায় সাড়ে ষোল-আনা ইষ্টানুগত, সেই ব্যক্তিই ভক্ত। এই ভক্তের নিজস্ব কোন পৃথক সত্তা নেই। ইষ্ট-সত্তার সুখই সে আত্মসুখ হিসাবে মনে করে। ইষ্টদেব খুশি হলেই সে খুশি হয়— সে বাঁচে। ইষ্টকে অখুশি দেখে সে স্থির থাকতে পারে না। ইষ্টের দুঃখ মোচন তার জীবনের ধ্যান জ্ঞান। ইষ্টের জীবনই তার জীবন। ইষ্টের সত্তাই তার সত্তা, ইষ্টার্থেই তার জীবনধারণ। তার সকল কর্ম ইষ্টসুখার্থে। ইষ্টেচ্ছা-পরিপূরণে।

দে-মশাইয়ের অকাল মৃত্যুতে তাঁর সম্বন্ধে একদিন কথা উঠলো।

এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের প্রশ্ন হলো ঃ মানুষের আয়ু কি পূর্বনির্দিষ্ট?

উত্তর দিলেন ঠাকুর ঃ জন্মগত সম্ভাব্যতা অনেকটা সীমিত। প্রবল সক্রিয় ইষ্টনেশা থাকলে অনেক সময় পরমায়ু বর্ধিত হয়।

প্রশ্ন হলো ঃ আকস্মিক মৃত্যুর ব্যাপারটা কি এড়ানো যায়?

উত্তর হলো ঃ প্রবৃত্তির উপর টানের চেয়ে ইষ্টের উপরে বেশি টান থাকলে সেটাও কাটিয়ে ওঠা যায়।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে বললেন, 'আমার স্বভাব হলো, কারও চরিত্রের ভালো এবং মন্দ দু'টি দিকই আমার জানা হয়ে গেলে তার ভালো দিকটা নিয়েই চর্চা-চিন্তা করি— মন্দ দিকটা মনেই আসে না। কারও ভালোটা নিয়েই মত্ত থাকতে চাই। মন্দটার কথা মনেই আনতে চাই।'

মানুষের ভালো দিকটা দেখতেই তিনি অভ্যস্ত। আমরা সাধারণ মানুষ অন্য একজনের চরিত্রের কোন দোষের সন্ধান পেলে তার চর্চাতেই ব্যস্ত হয়ে গেলাম। তাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে নানা রকম রোচ্য ভাষায় অন্য পাঁচ জনের কানে তুলে দিতে লাগলাম।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র হলেন গুণগ্রাহী— গুণদর্শক— গুণচর্চাকারী। এতে সেই মানুষটির কল্যাণ হয়। সে যে গুণের জগতে আরও বর্ধিত হয় এবং অন্য মানুষের চরিত্র নির্মিত হয়। দোষ দেখলে সেই দোষ দ্রষ্টার অন্তরে বাসা বেঁধে ফেলে এবং ক্রমে সে সেই দোষের বিশেষ শিকারে পরিণত হয়।

তাই, দোষদর্শন মহাপাপ। গুণদর্শন এবং গুণগ্রাহিতা চরিত্র গঠনের সহায়ক।

পাবনা থেকে দু'জন মুসলমান ভাই এসেছে দেওঘর আশ্রমে, ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে। ঠাকুরকে অনেক দিন দেখতে পায় না, তাই এসেছে কাছে বসে কথা বলতে, মতামতের বিনিময় করতে— হৃদয়ের ক্ষুধা মেটাতো। দীর্ঘ দিন ঠাকুরকে চোখের আড়ালে রাখলে কষ্ট হয়।

সন্ধ্যার দিকে এই পরিচিত অতিথি দু'জনের সঙ্গে কথাচ্ছলে বললেন, 'দ্যাখো, যারা খেটে খায়, তারা মানুষ হয়। যারা ধাপ্পা দিয়ে খায়, তাদের হওয়ার সুফল খোদার খাতায় নেই।'

মুসলমান ভাই দু'জন বললেন, 'এ দেশে কাজও কিছু আছে আর আপনি এবং আমরা বুড়ো হতে চলেছি। আবার দেখা হয় কিনা— তাই চলেই আলাম। তা, আপনার কি আবার দেশে ফিরে যাবার ইচ্ছে আছে?'

প্রীতিবিগলিত হয়ে ঠাকুর উত্তর দিলেন, ভালো কামই করিছ। আর দেশে ফেরার কথা কতিছো, তা সে রকম পরিস্থিতি হলি এবং তোমরা নিবের পারলি তো যাবো না ক্যা, চাও তো, না যাবার কী আছে? আমার মন-তো দেশেই পড়ে আছে। তোমাদের সবাইকে নিয়ে সেইসব ভালোবাসা আর আনন্দের দিনগুলো কি ভোলা যায়?

ওখানকার কয়েক জন লোকের বিশ্বাসঘাতকতার কথা তুলে ওরা দুঃখ প্রকাশ করলো— অন্তরের বেদনা জানালো।

সব কথা শুনে ঠাকুর বললেন, 'দ্যাখো, আমি তো কোন ব্যাপারে কোন কৃপণতা করি-নি। বিপদে-আপদে আমি তো সর্বদাই ওদের পাশে দাঁড়িয়েছি। আমার সাধ্যের চেয়েও বেশি করেছি। কেউ অভাবে পড়লে তার জন্যে ভিক্ষেও করেছি— চেয়ে-চিন্তে অর্থ সংগ্রহ করে তার ঘর-দোর বানিয়ে দিয়েছি। সবার কথা মনে হলি প্রাণ আনচান করে ওঠে। ওদের সবাইকে আমার কথা বলবা— আমার দোয়া জানাবা।

ওদের মধ্যে একজনের নাম আসাব মিয়া। ঠাকুর আসাবকে বললেন, 'দুর্গানাথ সান্যালকে তো জানো— ওর দিকে একটু নজর দিবা। দুর্গানাথ বড় উপকারী মানুষ আর আমার একান্ত পিয়ারের লোক। ও আমার জন্যে এবং তোমাদের সকলের জন্যেও অনেক করেছে— ওর দিকে লক্ষ্য রাখবা। ওর এখন খুব দুরবস্থা চলছে। তোমাদের সাহস-ভরসা পেলে ও শান্তি পাবে।'

সব শুনে আসাব কথা দিলে, সান্যাল মশাইয়ের দিকে ওরা লক্ষ্য রাখবে।

এই দুর্গানাথ সান্যাল কিছুকাল মুসলমান ভাইদের সহযোগিতায় সপরিবারে দেওঘর আশ্রমে চলে এসে নতুন করে বসবাস শুরু করেন। দুর্গানাথ সান্যাল ছিলেন সকলের শ্রদ্ধার পাত্র।

ঠাকুর আসাবকে জিজ্ঞেস করলেন, আর সব খবর কী?

আসাব মিয়ার উত্তর ঃ যাতে কেউ ফাঁকি দিতে না পারে, শোষণ করতে না পারে, ভালো মানুষি দেখা।়ে সেই সুযোগে অনিষ্ট করতে না পারে, সে দিকে লক্ষ্য রাখছি। আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে খোদা-তালার দয়ায় এই সবগুলো দেখছি।

গল্প শুনে ঠাকুর বললেন, 'এ সবই ভালো কথা, তোমরা তোমাদের কাজ করছো, আশা করি ফল ভালোই হবে।'

এরপর ওরা বিদায় নিয়ে স্থান ত্যাগ করলো।

একদিন প্রশ্ন উঠলো– অনাসক্ত হয়ে কর্ম করা যায় কেমন করে? মানুষ কি আসক্তিবিহীন হতে পারে?

'হতে পারবে না কেন? নিজের স্বার্থ আর নিজের প্রতিষ্ঠার বদলে ইষ্টের স্বার্থ আর ইষ্টের প্রতিষ্ঠাই যদি প্রধান হয়ে ওঠে, তা হ'লেই হয়ে গেল। যা করছো, সবই ইষ্টকে খুশি করার জন্যেই। এই তুকটা ঠিক থাকলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।'

আরও বললেন, 'ফলতঃ কী হয় জানো?'

'ইষ্টার্থী হলে নিজের স্বার্থ আরও ভালোভাবে পূরণ হয়। তাঁর মঙ্গলেচ্ছা পূরণ করার জেদ যদি কারও মধ্যে প্রবল হয়, তবে ফলস্বরূপ মঙ্গলের স্রোত তার মধ্যে প্রবল হয়ে বইতেই থাকে। সে মঙ্গলের অধিকারী না হয়ে পারেই না। এটাই তো প্রকৃতির বিধান।'

মূল জিনিস ইষ্টকে ভালোবাসা— তাঁর স্বার্থ নিয়ে চলা। সতী স্ত্রী যেমন তার স্বামীর জন্যে করে।

লেখকেরও মনে হয়েছে, এই দৃষ্টান্ত সব চেয়ে প্রাকৃতিক। ইষ্টপুরুষে আত্ম-সমর্পণ মেয়েদের পক্ষে জন্মগতভাবেই স্বাভাবিক। জন্মগতভাবেই নারীর প্রবণতা থাকে আত্ম-নিবেদনে। সে নিবেদনটা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে পুরুষের প্রতিই। আর পরমপুরুষ পুরুষ হিসাবেও সকলের শ্রেষ্ঠ— এই কারণেই নারীর পক্ষে পরমপুরুষের প্রতি সর্বাত্মক আত্মনিবেদন অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে ওঠে।

নারী জন্ম সেই হেতু সার্থক। ঈশ্বর লাভ নারীর পক্ষে সহজ এবং স্বাভাবিক। পরমপুরুষে নিবেদিতপ্রাণ হওয়ার জন্যেই তার জন্ম।

পুরুষ যখন ইষ্টার্থগত হয়, তখন সে আর পুরুষ থাকে না, সে নারীত্বই প্রাপ্ত হয়। তাই বলা হয়, শ্রীবৃন্দাবনে পুরুষ একজনই— তিনি গোপীগণের হৃদয়ধন-পুরুষোত্তম কৃষ্ণ। অন্য পুরুষ সবাই নারী।

হে মাতৃজাতি, তুমি ধন্য!

॥ ত্রিশ ॥

বিশিষ্ট ভক্ত আইনজীবী মন্মথনাথ দে'র মৃত্যুতে ঠাকুর একেবারে ভেঙে পড়েন। তাঁকে সামলানোই মুশকিল। তাঁর সকল নিকট আত্মীয়ের শোক ও বেদনা তিনি একা তুলে নিলেন নিজের অন্তরে। সে দৃশ্য সহ্য করাও কঠিন। তখন প্রয়াতের নিকট-জনেরাই সান্ত্বনা দিতে লাগলেন তাঁকে— তারা নিজেদের শোক প্রকাশের আর সুযোগই পেলো না। সকলের শোক থিতালে ঠাকুরের শোক থিতলো। এই স্বভাবেই তিনি জ্বালাহর, দুঃখহর, বেদনাহর, শোকহর— সংসারের বিষহর।

তাই তিনি সংসারের সর্বশরণ। তাঁকে পেলে লোকে সব কষ্ট ভোলে।

তাঁকে পাওয়া মানে, তাঁতে গত হওয়া। তাঁর প্রিয় কর্মে আত্মনিযুক্ত হওয়া। তদ্‌গত হয়ে তাঁতে ভরপুর থাকা।

এক তত্ত্বজিজ্ঞাসু ভদ্রলোক একবার জিজ্ঞেসা করলেন ঃ শাস্ত্রে আছে— হরেণামৈব কেবলম্। তা এই হরিণাম কিভাবে করতে হবে— কোন্ পদ্ধতিতে করলে এই নামের ফল পাওয়া যাবে।

উত্তরে হরিস্বরূপ ঠাকুর বললেন— 'নাম ঠিকই আছে। ঐ নাম সদ্‌গুরুর কাছ থেকে পেয়ে সাধন করতে হয়, সদগুরুর নির্দেশ-মতো। গুরু না ধরে কোন সাধন-ভজনই করা ঠিক হয় না। সব-কিছুরই মরকোচ আছে। নতুবা আপন প্রবৃত্তিমাফিক করলে ভালোর বদলে মন্দও হতে পারে। তাই, আগে যোগ্যগুরু, পরে সাধনা।'

তর্ক-প্রিয় ভদ্রলোকটি বললে, সংসার ছেড়ে বনে-পর্বতে গিয়ে সাধন-ভজন করলে কেমন হয়?

'সংসারের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে মুক্তির চেষ্টা করলে সব সময় ভালোই যে হবে, তার কোন গ্যারান্টি নেই— উলটোটাও হতে পারে। মনের সংযমটাই বড় কথা। মন ও কর্ম ইষ্টে সংন্যস্ত করতে পারলে তবেই তা নিয়ন্ত্রিত হয়— সংযত হয়। নচেৎ, নিজের ভিতরে নিজের ঝগড়া বাধিয়ে কোন লাভ হয় না— সে অশান্তির আর শেষ নেই। জোর করে কোন প্রবৃত্তিকেই নিরোধ করা যায় না। সব প্রবৃত্তিকেই ইষ্টে সংন্যস্ত করতে হয়। তখনই ঐ অকাম্য প্রবৃত্তিগুলিই জগতের অনেক কল্যাণকর্মে লাগতে পারে। যে-সব সমস্যার কথা ভেবে দুর্বল হয়ে পড়ছো, সেগুলিই তোমার বলভরসার কারণ হয়ে দাঁড়ায়— জীবন্ত সদ্‌গুরুর সাচ্চা বাচ্চা হয়ে চললে।'

তোমার বলে যদি কিছু না থাকে, সবই যদি তাঁর হয়, তখন তোমার চিন্তা কিসের?

সখেরই হোক আর সাচ্চাই হোক, একটি কঠিন বাস্তব প্রশ্ন রাখলেন আগন্তুক ভদ্রলোক। জিজ্ঞেস করলেন। 'পুনর্জন্ম কি এড়ানো যায়?'

'জীবন্ত ইষ্টে কেন্দ্রায়িত হয়ে তাঁর স্বার্থকে নিজের স্বার্থ করে তুলতে পারলে জন্মান্তর এড়ানো যায়। তখন তাঁর স্বার্থে তাঁর ইচ্ছায় আবার আসার ইচ্ছা হয়। আবার জন্মগ্রহণটা বড় কথা নয়, তিনিই শেষ কথা। ভক্তের আত্মা তখন ভগবানের আঁচলে বাঁধা থাকে।'

ঈশ্বরই সব। ঈশ্বর আসেন মানুষ হয়ে। তখন তাঁকে গুরু বলে গ্রহণ করে তাঁর ইচ্ছা পূরণ করে তাঁর পিছনে পিছনে চলতে হয়। এ ছাড়া কোন সমস্যা-সমাধানের অন্য কোন পথ নেই। এ সর্ব দেশের সকল সাধকের পরীক্ষিত সত্য।

একদিন সাম্যবাদ প্রসঙ্গে— শ্রেণীদ্বন্দ্ব নিয়ে কথা উঠেছে।

কথা শুনে ঠাকুর বললেন, 'আমি কই— মানুষ আপন টাকা পর। যত পারিস মানুষ ধর।' ধনিকই হোক আর শ্রমিকই হোক, চাষাই হোক আর জমিদারই হোক, মানুষ ছাড়া কারও চলার উপায় নেই। মানুষ যদি মানুষ-স্বার্থী না হয়, মানুষের মধ্যে যদি পারস্পরিকতা না বাড়ে, সমাজে যদি স্বার্থ-বিরোধ প্রবল হয়ে ওঠে, তাতে কারও ভালো হবে না। সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

প্রসঙ্গতঃ একজন বললেন, সাম্যবাদী রাষ্ট্রে সব সম্পত্তিই রাষ্ট্রের— ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছু নেই— রাষ্ট্র সকলকে দেখে। এখানে সকলের কর্ম্মমূল্য সমান।

প্রসঙ্গ নিয়ে ঠাকুর বললেন, 'নিজের ইচ্ছামতো কাউকে যদি কিছু না দেওয়া যায়— অর্থাৎ, ব্যক্তি স্বাধীনতা বলে যদি কিছু না থাকে, তাহলে মানুষের চিৎ-প্রগতি ক্ষুণ্ণ ও দুর্বল হয়, সে ক্রমে জড় হতে থাকে। এ রকম আইন ঠিক হয় না। সত্তাপোষণী স্বাধীনতা না থাকলে মানুষের সোয়াস্তি নেই।'

যতিদের নিয়ে জানার ইচ্ছে। এক যতি বললে, ঠাকুরকে নিবেদন করে দিলে তো সব ভোগই গ্রহণযোগ্য হবে?

উত্তরে ঠাকুর রায় দিলেন— 'ঠাকুরকে নিবেদন করে যদি বিষ্ঠা এনে দেয় আর তা যদি তুমি নির্বিকারচিত্তে খেয়ে নিতে পারো, তখন বোঝা যাবে, তোমার অন্তর ভক্তিতে প্লাবিত, সেই অবস্থায় তুমি যে কোন প্রসাদ খেতে পারো। কিন্তু তা সবার পক্ষে নয়। যতিদের যদি কোন কিছু খেতে মানা করা থাকে, তবে তা তার পক্ষে গ্রহণ-যোগ্য নয়।'

এক সময়ে জাতিস্মর-সন্ধানের কাজ চলছিল সারা ভারত জুড়ে। ঠাকুরের ইচ্ছায় তাঁর একান্ত ভক্ত সুশীলচন্দ্র বসু জাতিস্মরের সন্ধানে ঘুরছিলেন ভারতের বিভিন্ন স্থানে। তিনি অক্লান্ত চেষ্টায় ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে কয়েক জন মহিলা ও পুরুষ জাতিস্মরের সন্ধান পেয়েছিলেন এবং এদের ইতিকথা পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করেন।

এই জাতিস্মরতা প্রসঙ্গে ঠাকুর বলেছেন, অনেকজন্ম ধরে যদি এক মৃত্যুপরবর্তী স্মৃতি বাস্তব ভাবে ধরে রাখা যায়, তবে সে এক রকম মৃত্যুকে জয় করার মতোই হয়। তবে এটা মোটামুটি ভাবে গণসাধ্য সাধনা হিসাবে যতক্ষণ

গণ্য না হচ্ছে, ততক্ষণ এর মূল্য অতি সামান্যই। আমি, আপনি বা আর দু-চার জন এ কর্মে পারগ হয়েছে— এইটুকু জেনে কোন সর্বজনীন সত্য জেনেছি, এমন বলা যায় না। নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যতক্ষণ না কোন ধোঁয়াশা-সত্যকে নিয়ে সত্যে পরিণত করা যাচ্ছে, ততক্ষণ তা বৈজ্ঞানিক সত্যে পরিণত হয় না। কয়েক জনের ধরা-ছোঁয়ার মধ্যেকার এই সত্য অকাল্ট বিদ্যামাত্র হতে পারে। প্রত্যেকটি বৈজ্ঞানিক সত্যকে সর্বসাধ্য করে তুলতে হবে।

একদিন আমেরিকান ভক্ত হাউজারম্যান প্রশ্ন করলো, আমরা তো সমকালীন জীবন্ত সদ্‌গুরুর কথা বলে থাকি— তাঁর সাহচর্যে ধর্ম পালনের কথা বলে থাকি, তো যারা অনেক দূর দেশে থেকে সদ্দীক্ষা লাভ করে, তাদের এই সদ্‌গুরু সাহচর্যের সুযোগ কোথায়— এমন কি অনেক সময়ে চোখে দেখাও নাও ঘটতে পারে। এ সমস্যার সমাধান কোথায়?

প্রশ্ন শুনে ঠাকুর বললেন, 'তার দীক্ষাদাতা ঋত্বিক্ যদি ইষ্টগুরুদেবকে দেখে থাকে এবং যে ইষ্টানুজ্ঞায় ঋত্বিকতা করছে ও সাধনপরায়ণ থাকছে, তার ভিতর ইষ্টদেবের কিছু না কিছু ছাপ থাকবেই। দীক্ষিত ব্যক্তি যদি তেমনতর ঋত্বিকের সান্নিধ্যও লাভ করতে পারে তবে তার মাধ্যমেও ইষ্টের কিছু-না-কিছু উপস্থিতি বোধ করতে পারে। নিষ্ঠাবান এবং সাধন পরায়ণ ঋত্বিকের মধ্যে ইষ্টদেব জীবন্ত হয়েই বিরাজ করেন। এই ধারাবাহিকতা বড় কম জিনিস নয়।'

একদিন এক বহিরাগত ভক্ত জিজ্ঞেস করলে, 'বাবা, আমার এবং আমার স্ত্রীর রাহুর দশা চলছে, এ অবস্থায় কী করা উচিত?'

শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, যাগযজ্ঞ, কবচ-মাদুলি-এ সব রাস্তায় গেলেন না ঠাকুর। বললেন, 'নাম চালাও আরও জোরে। নামময় হয়ে থাকো। আর বিহিত নিষ্ঠায় ভক্তিভরে ইষ্টভৃতি করতে থাকো। আর রোজ সকালে ঠাকুরকে ফুলজল নিবেদন করে পরিবারের সবাই একটু একটু সেই নিবেদিত জল পান করো। দেখবে, ওসব আপদ পালিয়েছে। ইষ্টানুরাগই সব চেয়ে বড় রক্ষাকবচ। নামানুস্যূত চরণামৃত জীবনদায়ক। এক সময়ে তো এই নামোদকেই বহু দুরারোগ্য ব্যাধি সেরে গিয়েছে। করে দ্যাখো।'

একদিন আর পাঁচজনের সঙ্গে কথাবার্তাক্রমে ঠাকুর বললেন, 'বিপ্ররা ছিল শিক্ষক শ্রেণী। তাই, তাদের এত সম্মান। অবশ্য প্রত্যেক বর্ণই স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে প্রধান। বিপ্ররা ভিক্ষা করে খেতো দক্ষিণাই ছিল তাদের সম্বল।'

স্বতঃ প্রবৃত্তি থেকে শিক্ষকশ্রেণীর দক্ষিণাদানকেই ঠাকুর ভিক্ষাগ্রহণের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এর মধ্যে সেবা দিয়ে পরিবর্তে স্বতঃস্ফূর্ত সেবা গ্রহণের ব্যাপারটি জড়িত আছে। এই হিসাবে ঠাকুর এই আদান-প্রদানের ব্যাপারটাকে ভিক্ষাদান এবং ভিক্ষাগ্রহণের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ভিক্ষা অর্জন এবং ভিক্ষা গ্রহণের মধ্যে কোন উঞ্ছবৃত্তির মানসিকতা নেই। সবটাই সেবার বিনিময়।

একদিন কথাচ্ছলে এক ভক্ত বললেন, 'গুরুও নেই, গুরুকরণও নেই। তারই ফল— এই দুরবস্থা।'

কথাটা সত্যিই দুঃখের। যে সমাজে গুরুরাই ছিলেন জনগণের অনুসরণীয়— সমাজের শাসক, সেই সমাজ আজ গুরুর প্রয়োজনীয়তাকেই বিস্মৃত হয়েছে। ফলে, নিজের নিজের বৃত্তিপ্রবৃত্তিই হয়েছে জীবনের নিয়ন্তা। যথেচ্ছাচারই তার ফসল।

সময়টা হলো ২রা ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দ। আলোচনা প্রসঙ্গে ঠাকুর বললেন, আগের দিনে দেশে ছিল কুলপতি, গোষ্ঠিপতি, গ্রামাধিপতি, দশগ্রামাধিপতি ইত্যাদি শাসনক্রম। সব বর্ণের প্রাজ্ঞ মানুষকে নিয়েই এই সমাজ ব্যবস্থা ছিল। আর সবার উপরে থাকতেন বশিষ্ঠ— অর্থাৎ বৈশিষ্ট্যপালী রাষ্ট্রপতি। বশিষ্ঠ কোন একজন ব্যক্তির নাম নয়। বশিষ্ঠ একজন এমনই রাষ্ট্রপতি যিনি সকলের মাথার মণি হয়ে বর্ণ বৈশিষ্ট্য রক্ষাকারী রূপে মানুষের স্বয়ং সংবর্ধনকে জিইয়ে রাখতেন। বশিষ্ঠ শব্দটি ভারতের রাষ্ট্রপতির অভিধা। যিনি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করতেন, তাঁকেই বলা হতো বশিষ্ঠ।

ঠাকুর একদিন ভক্তদের বললেন, 'আগের দিনে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাখিদের ভাষা শেখানো হতো। খুব মজার বিদ্যা এটা। প্রত্যেক প্রাণীরই যে ভাব প্রকাশের ভাষা আছে এবং তাদের মতো করে মতামতও বিনিময় করে, এটা জানা কত মজার ব্যাপার। এই বিদ্যা যে আয়ত্ত করতে পারে, তার কত আনন্দ, কত সুবিধা। যতই শিখবে ততই তো জ্ঞানের পরিধি বাড়বে। এই ভাবেই তো বহুজান্তা হওয়া যায়।'

ঠাকুর একদিন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বললেন, 'বড় বউয়ের মতো মানুষই দেখি না, আমার খুব শ্রদ্ধা হয়।' আরও যোগ করলেন, 'রামকৃষ্ণদেবের স্ত্রী মা–ঠাকরুন যেমন ছিলেন অনেকটা সেই রকম। এজন্য সারা জীবনে আমাকে কোন ব্যথাই দেয়নি। একবার শুধু বাড়ির ভিতরের একটা গাবগাছ যে কার কথায় কেটে ফেলা হয়েছিল। বড় বউয়ের ইচ্ছায় কিনা তাও জানিনা। তথাপি তার ইচ্ছাতেই কাটা হয়েছিল— এই রকম ধারণা থেকে আমার একটু রাগ হয়েছিল তার উপরে।'

এবার তুলনা করো তোমার জীবনের সঙ্গে। সারা জীবনের দাম্পত্য-সম্পর্কের মধ্যে মাত্র একদিনের একটা অতিতুচ্ছ মতান্তর ছাড়া জীবনে আর দ্বিতীয় কোন দিন কোন মতভেদ, মনোবেদনা বা সম্প্রীতির বিন্দুমাত্র অভাব ঘটেনি, এমন এক জোড়া স্বামী-স্ত্রীর নাম-ঠিকানা কারও জানা আছে কি? সবাই আমরা নিজের জীবনের দিকেই তাকাই না। জীবন যাত্রার দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে নানাস্থানে সৃষ্টি হয়েছে নানা মাপের ক্ষত। এমন ক্ষতও অনেক আছে যার জ্বালা কোন দিন মনকে বিষিয়ে না তোলে।

এইবার দুটো চিত্র আঁকা যাক— একটি ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের দাম্পত্য জীবনের, আর একটা অন্য যে-কোন একজন দম্পতির। অনুকূলচন্দ্রের জীবনধারার সঙ্গে অন্য কোন এক জোড়া নর-নারীর দাম্পত্য জীবনের তুলনাই চলে না। অনুকূলচন্দ্র তাই ব্যক্তি হিসাবে তুলনাহীন, তাদের দাম্পত্যজীবনের এই মধুরতার রহস্য গভীর গবেষণা-সাপেক্ষ। পৃথিবীর নর-নারীদের জীবনে এ-ব্যাপারে প্রশ্ন আসবে কবে? ব্যক্তি-জীবনে এবং সমাজ-জীবনে শান্তি, সুখ এবং নিরুপদ্রবতা আর একটি মিলবে কি? সমাজ-চেতন আত্মবিশ্লেষণ পরায়ণ আধ্যাত্মিক গবেষকরা এ বিষয়ে কিছু ভাবছেন না?

একদিন এক ভক্তের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন, 'শরীরটা গোটা মানুষ নয়কো। চিৎশক্তির বলে মানুষ চেতন থাকে— সাড়া তৈরি করে এবং সাড়া ধরে। এইটাই মানুষের প্রধান সম্পদ। এইটা না থাকলে তো মানুষ মৃত। রকমারি সাড়ার সৃজন, গ্রহণ এবং বিন্যাসের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির অজস্র রকমের সূক্ষ্মযন্ত্র আবিষ্কার করা যায়।' ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি শনিবার সন্ধ্যার দিকে কথাটা উচ্চারিত হয়েছে।

একদিন বললেন, 'বিদ্যা পড়ার মধ্যে নেই, বিদ্যা আছে করার মধ্যে। করার মধ্যেই বিদ্যার প্রয়োগ থাকে। করার পারগতার জন্যেই বিদ্যার প্রয়োজন। যে কিছুই করবে না, যে কিছুই হবে না, তার বিদ্যার কি প্রয়োজন? করা হওয়ার মধ্যে বিদ্যার স্ফূর্তি।'

'যাজন মানে তোমার ঠাকুরের দীক্ষা নিতে হবে— এই বলা নয়। তোমার আলাপ-আলোচনা এবং ব্যবহারে মানুষের মনে যেন তোমার প্রতি অনুরাগ জন্মে— তোমার ক্রমোন্নতি ও সততার সম্বন্ধে সে কারণানুসন্ধানী হয়ে ওঠে। তা'হলে সেও ঐ রকম হওয়ার জন্যে রাস্তা খুঁজবে। সে নিজেই প্রস্তাব দেবে, তুমি তাঁর জন্যে কী করতে পারো। তোমার গুরু সম্বন্ধে সে আরও জানার জন্যে আগ্রহী হবে এবং সর্বদা তোমারও সঙ্গ চাইবে। শুভ সরণিতে আসার এইগুলিই অমোঘ লক্ষণ।'

একদিন কথাপ্রসঙ্গে ঋত্বিগাচার্যকে বললেন, 'আমার একটা স্বাভাব কী জানেন? কোন মানুষকে খারাপ বলে বুঝতে পারলেও আমি তা স্বীকার করতে চাই না। তাকে খারাপ জানলেও সে আমার কাছে অগ্রহণযোগ্য নয়। সে অগ্রহণ যোগ্য বিবেচিত হলে আমিই তো হেরে গেলাম। কোন মানুষকেই আমি বাতিল বলে মনে করতে পারি না। কোন মানুষ কোন কু-অভ্যাসের দরুন বা কোন কৃত অপরাধের কারণে মানুষের তালিকা থেকে নাম কেটে দেওয়ার যোগ্য হয় না। সবাইকে সংশোধন করে নেওয়া সম্ভব। যে তা করতে পারে, সেই মানববন্ধু— লোকশিকক্ষ। সকলের কর্তব্য এই লোকশিক্ষককে মানুষের সামনে তুলে ধরা।'

তুমি কাউকেই বাতিল করতে পার না। তা যদি করতে পারতে তা'হলে দেখা যাবে, তুমিও অন্যের বিচারে বাতিল হতে পার। কাজেই, ও রাস্তায় চিন্তা করবে না। মানুষকে ভালোবেসে তাকে আপন করার চেষ্টা করবে। আর তাকে সদ্‌গুরুর সঙ্গে যুক্ত করে দেবার চেষ্টা করবে। এই কর্মটি যদি করতে পারো, তবে দেখবে, সেও একদিন মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এ সবই হচ্ছে, স্নেহ-ভালোবাসা, দরদ এবং সয়ে-বয়ে নেবার জিনিস। অন্যের জন্যে কিছু করলে অন্যকে পাওয়া যায়। সে আপন হয়ে ওঠে। জনকল্যাণটা এইভাবে আসে।

ঐ কালের মধ্যেই একদিন কথাপ্রসঙ্গে তাঁর তিন কর্মযোগীর কথা বললেন। এঁদের নিয়ে– ত্রিরত্ন। এই তিনজন হলেন মহারাজ অনন্তনাথ রায়, কিশোরী মোহন দাস এবং সতীশচন্দ্র গোস্বামী। এই তিন রত্নের মধ্যে অনন্তনাথ এবং কিশোর-কিশোরীমোহন ছিলেন অল্প শিক্ষিত সাধারণ মানুষ। গোঁসাই বাবা ছিলেন উপাধিধারী সংস্কৃত পণ্ডিত– বিধানদাতা। বহুবার ঠাকুর এঁদের মান্য কর্মী হিসেবে স্মরণ করেছেন এবং ভক্তদের কাছে সম্মান দিয়ে এই তিন রত্নের নাম উচ্চারণ করেছেন এবং এঁদের চরিত্র থেকে শিক্ষা নিতে বলেছেন।

॥ একত্রিশ ॥

একদিন এক শিষ্যের জিজ্ঞাসা ঃ জ্যোতিষ বলেছে, আমার গ্রহদোষ চলছে। তা, কী করবো?

ঠাকুরের জবাব ঃ সব গ্রহই তো ভগবানের অধীন, অনুরাগের সঙ্গে ভগবানের নাম করলে সব গ্রহই কেটে যায়। আমার তো বলাই আছে— যজন যাজন ইষ্টভৃতি, করলে কাটে মহাভীতি। তাঁকে নিয়ে থাকলে গ্রহ তোমার নাগাল পাবে না।

একটি মায়ের তরতাজা স্বামীটা স্বল্পকালীন রোগ-ভোগের পর হঠাৎ গত হয়ে গিয়েছে। মা-টি আকস্মিক শোকে মর্মাহত হয়ে আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছে। নিজের প্রতি সংসারের প্রতি এবং ছেলে-মেয়েদের প্রতি কোন দায়িত্বই পালন করতে পারছে না। সবটাই তছনছ হয়ে গেছে। মা-টি ঠাকুরের কাছে শুধুই কান্নাকাটি করে। ঠাকুর কত দুঃখ পাচ্ছেন, সেকথাও ভাবে না। পরিস্থিতিটাই যন্ত্রণা-থমথমে।

ব্যাপার দেখে ঠাকুর একদিন নিজেই বললেন, 'তুই এমন করে কেঁদে কেটে তাকে কষ্ট দিচ্ছিস কেন? সে তো তোর এই অবস্থা দেখে শান্তি পাচ্ছে না। সে তো তোর কাছাকাছিই আছে। তোর দশা লক্ষ্য করে কত কষ্ট পাচ্ছে; তা কি বুঝতে পারছিস? পারলে এমন করতিস না। নিজের শান্তি অটুট রেখে, পরিবারের শান্তি বজায় রেখে, ছেলেমেয়েদের প্রতি দায়িত্ব পালন করে তাকে বুঝতে দে যে, তুই তার কেমন জীবন-সঙ্গিনী ছিলি। নতুবা, সবই যে ভেস্তে যাবে। তোর ভালোবাসাই যে নিষ্ফল হয়ে গেল। সারা জীবনের সাধনা একদিনে ভাসিয়ে দিবি?'

ঠাকুর বহুরকম ভাবে তাকে সুস্থির করার চেষ্টা করলেন। তার কষ্ট দেখে তিনি নিজে যে কত কষ্ট পাচ্ছেন, তাও বললেন। শেষ পর্যন্ত মা'টি কিছুটা শান্ত হলো এবং ঠাকুর-প্রণাম করে বিদায় নিলো।

এই ভাবে যে ঠাকুর কত শোকাহত মানুষকে সান্ত্বনা দিয়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই। তিনি নিজের স্বার্থেই অন্যের স্থৈর্য এবং শান্তির জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। কারও দুঃখ-যন্ত্রণা তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। মানুষের দুঃখ যন্ত্রণার জন্যে তিনি নিজেকেই দোষী সাব্যস্ত করতেন। নিজের শান্তি ও স্বস্তির জন্যই তিনি অন্যের শান্তি ও স্বস্তির জন্যে উঠে পড়ে লাগতেন।

একদিন একজনকে বললেন, 'তুমি ভালোই হও আর মন্দই হও গুরুতে নিবিড় হও। ঐটা হতে পারলেই সব হয়ে গেল। যেমন ছিল গিরীশ ঘোষ। তোমার ভালোমন্দ সবই তাঁর হাতে তুলে দাও। মনে রেখো। তুমি আজ রত্নাকর থাকলেও একদিন বাল্মীকি হবে।'

দুলালী মা বলে এক মা একদিন জিজ্ঞেস করলো, ভগবানের ইচ্ছা কি এক-এক যুগে এক-এক রকম ভাবে প্রকট হয়? এই রকমারি ভাবটা আসে কোত্থেকে?

উত্তর হলো ঃ ভগবানের ইচ্ছে বাঁচতে চাওয়া— তা সব যুগেই। কালের ইচ্ছা— মারতে চাওয়া। ঈশ্বর বাঁচাতে চান। কিন্তু যারা ঈশ্বরকে ভুলে কালের দিকে ঝুঁকে পড়ে, কালই তাদের গ্রাস করে। ঈশ্বরগত হলে বাঁচা আর কালগত হলে মরা। কাল মানে বৃত্তি-প্রবৃত্তির আকর্ষণ— মৃত্যুর প্রতি বশ্যতা।

এক ভক্ত একবার আপদ-বিপদের মধ্যে পড়ে নাস্তানাবুদ হয়ে ঠাকুরের কাছে এসে তার প্রতিবেদন নিবেদন করলো। ঠাকুর শুনে বললেন, এর মধ্যেও যে এখানে এসে পড়েছো, সেইটাই তো ভাগ্য। ঠিকমতো চলো, সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে একটু সময় নেবে— এছাড়া কিছু না।

'সময় লাগবে কেন?' ভক্তটির প্রশ্ন।

'হ্যাঁ, সময় একটু লাগবে। নামতে দেরি লাগে না, উঠতে দেরি লাগে। তোমার ভাগ্য ভালো, তুমি ঠিক সময়মতো এসে পড়েছো।'

উত্তর দিলেন ঠাকুর।

পুত্রশোকগ্রস্ত ভক্ত সুশীলা-মা এসে তাঁর এই অপ্রত্যাশিত বেদনার কথা জানালে ঠাকুর বললেন, 'যেমন করছিলে, তেমন করতে তো আমি নিষেধই করেছিলাম— তুমি তো শুনতে চাইলে না। আমি তোমার সঙ্গে পেরে উঠলাম না। কাজেই কিছু করতেও পারলাম না। যমই জিতে গেল।'

পুত্রহারা রুনুর মা কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'পট করে যে কী ঘটে গেল।'

'পট করে ঘটে গেল না, তুই ঘটালি! ওর থেকে বেশি আর কী করতে পারতাম!'

'মোদ্দা কথা হলো, হয় আমরা ইষ্টাধীন হই, নয় কালের অধীন হই। মধ্যপন্থা কিছু নেই।'

মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার যতীন দাসকে ঠাকুর এবার মানুষের ইঞ্জিনিয়ার রূপে গড়ে তুলতে চান। ঋত্বিগাচার্য কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে যতীন দাসকে সামনে পেয়ে ঠাকুর জিজ্ঞেস করে বসলেন— 'যতীনদা, নাম-টাম কেমন চলছে?'

একটু কাচুমাচু করে যতীন্দ্র দাস উত্তর দিলেন, 'ঐ এক রকম, তেমন না।'

'সে কি কথা!' পালটা প্রশ্ন ঠাকুরের। 'জোরসে নাম চালায়ে যান।' আর কেষ্ট ভট্টাচার্যের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শোনেন, কেষ্টদা, যতীনদা কষে নাম করবে তার পরেই ওঁকে ভজন দিয়ে দেবেন।'

তখনকার দিনে নাম সাধন-পদ্ধতিতে ভজন বলে একটি উন্নত স্তরের ক্রিয়া—দীক্ষার প্রচলন ছিল। যাঁরা নামযজ্ঞ-সাধনে একটু এগিয়েছেন, তাঁরা ভজনদীক্ষা পেতেন। ভজনদীক্ষাপ্রাপ্ত সাধক অন্য ভজনভিক্ষু সাধককে ভজনে দীক্ষা দিতে পারতেন। এজন্য ভজনপ্রার্থী ব্যক্তিকে নামে স্বতঃসিদ্ধ হতে হয়। যতীন দাস-মশাইয়ের প্রতি ঠাকুরের এই ইচ্ছারই প্রকাশ।

তদুত্তরে ঋত্বিগাচার্য বললেন, 'তাহলে, যতীন-দাকে যতি-আশ্রমে এসে থাকা লাগে।'

'থাকা লাগে কথার মানে কি? যতীনদা তো এসেই আছেন। যতীনদা, এখন হতেই যতি আশ্রমের মেম্বর হলেন— এখন থেকই এখানে কাটাবেন। বাড়ি থেকে থালা-বাটি-মগ-বিছানা-মশারি সব আনাবার ব্যবস্থা করেন। আপনি নিজে যাবেন না। সব ভালো কাজের শুরু তন্মুহূর্তেই।'

এই ঘটনার অল্পদিন পরেই এক ভক্ত এসে একবার তার বহুবিধ সমস্যার কথা বলে সমাধান প্রার্থনা করলো। ঠাকুর সব শুনে বললেন, 'ইষ্টনিষ্ঠ হয়ে নাম চালাও। পড়ার সময়ে মানুষ তাড়াতাড়ি পড়ে, কিন্তু ওঠার জন্যে সময় লাগে। এটাই নিয়ম। আমার তো সব কথা বলাই আছে। জানাও আছে সব। এবার করার পালা— করে যাও। তোমাকে দেখে আরও পাঁচজনে শিখুক।'

ভজন-নামক বিশেষ সাধন সম্পর্কে একদিন ঠাকুর বললেন, 'বাঁদিক থেকে যে-সব ধ্বনি শোনা যায়, সেগুলি সব প্রবৃত্তির এলাকার। সে-সব শব্দে মন দিতে নেই। ডানদিক থেকে উত্থিত শব্দে মন দিতে হয়। ঐ শব্দ ঊর্ধ্বদিকে নিয়ে যায়। বামের থেকে আসা শব্দে মন দিলে চলন নিম্নমুখী হয়— কামবৃত্তিও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। নামসাধনে সদ্‌গুরু হলেন খুঁটি, তাঁকে ধরে বিশুদ্ধ নাম সাধন-কৌশল জেনে নিয়ে সনিষ্ঠ প্রক্রিয়ায় এগিয়ে যেতে হয়। নামসাধন হলো ক্রিয়াযোগ। সেইজন্যে সিদ্ধ সদ্‌গুরু ছাড়া এ-পথে অগ্রসর হওয়া যায় না আর তা করতেও নেই। তাতে ক্ষতিও হয়ে যেতে পারে।'

সব সাধন প্রসঙ্গই ঘুরে ফিরে চলে আসে ঐ সাক্ষাৎ ইষ্ট প্রসঙ্গে। ইষ্টে কেন্দ্রায়িত হয়েই সাধনার আরম্ভ এবং নিষ্ঠাযুক্ত হওয়ার মধ্যেই সকল সার্থকতা। শুরুও ইষ্টকে নিয়ে, গতিও ইষ্টে। ইষ্ট ছাড়া সবই অনিষ্ট।

ঠাকুর ছোট বেলা থেকেই ইষ্ট বলতে বুঝতেন তাঁর মায়ের গুরু হুজুর-মহারাজকে। তাঁর মা তাঁকে গর্ভে নিয়ে যে সত্য–নামের সাধনা করতেন, সেই পবিত্র নাম তিনি স্পষ্ট শুনতেন। ভ্রূণাবস্থায় সেই মহানামই তাঁর স্বতঃজপে পরিণত হয়েছিল। কাজেই দেহ যখন বীজাকারে তখন থেকেই তিনি নাম শুনছেন এবং মায়ের জপের সঙ্গে একতানে তা চলতো। সাধনজগতের ইতিহাসে এই ঘটনা বিরল।

প্রায়শঃই নানা কথার মধ্যেও বলতেন ঐ ইষ্টকেন্দ্রিকতার কথা। নিজের গুরুঠাকুর সরকার–সাহেব এবং মায়ের গুরু পরমপিতা হুজুর-মহারাজকে ঠাকুর অভিন্ন দেখতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকেও দেখতেন তাঁদেরই এক স্বরূপ হিসাবে। সরকার সাহেব, হুজুর মহারাজ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখতেন না। এই স্বভাববোধ ছিল তাঁর জন্মগত বোধ। এ ছিল তাঁর নিজস্ব সত্তা–চেতনার বীজজাত অনুভূতি।

ভগবানের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, 'ভগবান কোন অব্যক্ত ব্রহ্ম নয়— ভগবান হলেন জীবন্ত মানুষরূপী সাক্ষাৎ প্রভু। ভগবান তাই ধরা ছোঁয়ার সত্তা— তাঁর সঙ্গে কথা বলা যায়, কর্মের দ্বারা তাঁকে খুশি করা যায়, বেকায়দা চলনে চলে তাঁকে দুঃখ দেওয়া যায়, তাঁকে বিপদে ফেলা যায় আবার তাঁর নির্দেশ মেনে তাঁকে খুশি করা যায়, জগতের কল্যাণ করা যায় ইত্যাদি। তিনি পুরোপুরি সকর্ম আদর্শ মানুষ। তিনি নিরাকার ভাব বিলাসের বস্তু নন। তিনি যদি ভক্তের কাছে নিরাকার ব্যক্তিত্বের ধারণা মাত্র হয়ে থাকেন, তবে সেই নির্বিকার, অনিরেট ভগবানের ধারণা মানুষের পক্ষে সর্বনাশেরই কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাই শ্রীভগবান যখন সাক্ষাৎ নিরেট মানুষ হয়ে আসেন, তখনই তিনি মানুষের জীবন্ত ঈশ্বরবিগ্রহরূপে গণ্য হয়ে থাকেন। অন্য সময়ে তিনি ধারণার অতীত— অনুসরণ যোগ্য নন, পাল্য নন। তাঁর মানবরূপই মানুষের অনুসরণীয় গুরু— সর্বময় ব্যক্ত প্রভু। তাঁকে খুশি করে চলা যায়। আর তাই করতে হয়। তাঁর অব্যক্তরূপ মানুষের গুরু হতে পারেন না— ধরে চলা যায় না। ফলে, মানুষের পক্ষে ঈশ্বর লাভও সম্ভব হয় না। অথচ ঈশ্বর লাভের জন্যেই মানুষের দেহধারণ।'

॥ বত্রিশ ॥

একদিন দেশের দুরবস্থা নিয়ে কথা উঠলো। 'দেশে যাতে দুরবস্থা ঘটানো যায় নেতারা তো এতদিন ধরে তাই করেছেন। দুরবস্থা এড়ানোর জন্যে তো কিছু করেন নি। সেই হিসেবে তারা খুবই সফলকাম হয়েছেন। তারা যে কী করে চলেছেন, সে-সম্পর্কেই তাঁদের বোধ ছিল না। একে বলা যায়, অজাতপ্রসব। একটা ঘটে গেলে তার ফল ভোগ তো করতেই হবে। যারা ঘটিয়েছে, তারাও ভোগ করছে, যারা অসহায় ছিল— শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে, তারাও মার খাচ্ছে। দুষ্কর্ম সহ্য করাও তো পাপ।'

একদিন কথাচ্ছলে ঠাকুর উপস্থিত ভক্তদের দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে বললেন, 'একটা মজার কথা শুনি যে, মৃত্যুর পরে আবার দেহপ্রাপ্তি না ঘটা পর্যন্ত মুক্তি নেই। আবার মানুষ হয়ে না জন্মানো পর্যন্ত রেহাই নেই। ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই সহজ নয়। জন্মাতে গেলে আগে যাওয়া লাগবে বেটাছেলের কাছে— তার পাছে পাছে ঘুরতে হবে। তার শুক্র ছাড়া নারীগর্ভে আশ্রয় পাওয়া যায় না। আবার পুরুষের স্খলিত অজস্র শুক্রকীটের মধ্যে মাত্র একটিকে আশ্রয় করে প্রবেশ করতে হবে মায়ের ডিম্বকোষে। ব্যাপারটা বড় জটিল এবং বড় কষ্টময়। কারণ, এ সবই তো সূক্ষ্মদেহের কষ্টানুভূতির মধ্যেই থাকে। জন্মগ্রহণের এই দারুণ কষ্টকর পদ্ধতি স্মরণে থাকে বলেই বোধ হয়, মানুষ মৃত্যু পছন্দ করে না। কারণ, জন্মগ্রহণ করতে চাইলেই করা যায় না। দুয়ারে-দুয়ারে অনেক ঘুরতে হয়। সেই সময়ের কষ্টটা তো তাকেই পোয়াতে হয়।'

একজনের প্রশ্ন ঃ সূক্ষ্মদেহের কি মন থাকে? সে সুখ-দুঃখ সব বুঝতে পারে?

'সূক্ষ্মদেহের সূক্ষ্মমন থাকে— তার মতো করে সে সুখ-দুঃখ সবই বোঝে।' উত্তর দিলেন ঠাকুর।

একটি মায়ের প্রশ্ন ঃ মানুষ মরে কি মানুষই হয়?

'সাধারণতঃ মানুষই হয়। তবে কখনো কখনো যে অন্য রকম হতে পারে না, তা নয়। কথায় আছে— মুনি জড়ভরত মরে হরিণ হয়েছিল। অবশ্য তার হরিণ যোনি থেকে মুক্তি লাভও হয়েছিল। সব কিছুই কর্ম এবং মননশীলতার উপর নির্ভরশীল। সাধারণতঃ হঠাৎ করে যোনিবদল হয় না। মৃত্যুকালে কোন মানুষের পাশব ভাব প্রবল হলে সে অশুভ ভাবাপন্ন নিকৃষ্ট মানুষ হয়েই জন্মায়। যনি-পতন একটা মারাত্মক ধরণের পতন, সাধারণতঃ এমনটা ঘটার কথা নয়।'

একদিন কথাপ্রসঙ্গে বললেন, 'আমরা করেছি যেমন, পেয়েছিও তেমন। দেশ-বিভাগ রুখতে আমাদের করা ছিল ঘোড়ার ডিম, পেয়েছিও ঘোড়ার ডিম। বিধাতা না-করা ওয়ালাদের কিছু পাইয়ে দেন না।'

বললেন, 'আমাদের আরও স্বভাব আছে, না-করে পাওয়ার জন্যে বিফল হয়ে পস্তাই, আবারও সেই না-করার রাস্তাতেই চলতে থাকি। আমাদের মাথার ঘিলুর মধ্যে কোন সংকল্প দানা বাঁধে না। আমাদের স্মৃতি বড় দুর্বল।'

'এর কারণ কী?'

'জানাটা ইষ্টের প্রতি তেমন ভাবে যুক্ত নয় বলেই এমনটা হতে থাকে।'

একদিন কমল কুণ্ডু নামক এক ভক্ত ঠাকুরকে প্রশ্ন করলেন, 'মেয়েদের সোডি-বাই-কার্ব খাওয়ালে নাকি পুত্রসন্তান হয়ে থাকে। এটা কি ঠিক?'

উত্তরে ঠাকুর বললেন, 'হ্যাঁ, মেয়েদের রাজোনিবৃত্তির পূর্ব থেকে রক্তে ক্ষারধর্মের সৃষ্টি করে দিতে পারলে গর্ভে পুত্রসন্তান হওয়ার সম্ভাবনা বেশি হয়।'

আরও বললেন 'আমি এটা পরীক্ষা করে দেখেছি। যে সব মহিলার রক্তে ক্ষারধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তারা পুত্রসন্তানের মা হয়েছে। অম্ল-ধাতু-প্রধান মেয়েদের কোলে সাধারণতঃ কন্যা সন্তান আসে।'

এই গ্রন্থকারও এটা পরীক্ষা করে দেখেছেন। বহু মাতৃত্বকামী মহিলাকে যথাসময় থেকে পরিমাণমতো সোডি-বাই-কার্ব খাইয়ে তাদের কোলে পুত্র সন্তানের আগমন সম্ভব করতে পেরেছেন। অনেক অনাগত পুত্র সন্তানের নাম করণও আগে ভাগেই করে দিয়েছেন। তারা সেই নামে বড় হয়ে এখন সংসার জীবন যাপন করছে।

সেটা ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ, মঙ্গলবার। বিকাল বেলায় ঠাকুর রেহিণী রোড ধরে বেড়াতে বেড়াতে ভক্তগণের সঙ্গে কথা বলতে বলতে চলেছেন। এমন সময়ে বলতে লাগলেন, 'রামচন্দ্র যেমন বীরভক্ত হনুমানকে পেয়েছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ যদি তেমন একজনকে পেতেন, তবে সহজে অনেক কাজ সেরে ফেলতে পারতেন।'

ঐ ব্যাপারে আর কেউ কোন কথা না বলায় ওটা আর এগুলো না।

যতি-আশ্রম যখন মোটামুটি গড়ে উঠেছে, সেই কালে ঠাকুর যতিদের প্রকৃত ইষ্টচেতন মানুষ হয়ে ওঠার জন্যে অনেক কথা বলতেন। বলতেন, আজকের এই যতিরাই একদিন সৎসঙ্গের দৃষ্টান্ত-পুরুষ হয়ে দাঁড়াবে। এই কৃতী যতিরাই একদিন সনাতন ভারতের ঋষিকুলের ধরণ প্রাপ্ত হয়ে সমাজের শীর্ষে বসে মানুষকে ধর্মের পথ দেখাবে। বলতেন, যতিদের দায়িত্ব অনেক। এক একজন যতি হবে এক একজন সিদ্ধ পুরুষ। মানুষকে পথ দেখানোর ক্ষমতা থাকবে তাদের।

সময়টা হলো ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দিক। একদিন বলেই দিলেন, যতি-আশ্রম জায়গাটা এমনই যে, এখানে থাকলে মনের উত্তাল বীচি-মালা এখানে থিতিয়ে আসে। এখানে থাকলে এর প্রভাবে মনে স্থিতি আসে, মন শান্ত হয় এবং কর্মদক্ষতা ও ইষ্টচিন্তা বাড়ে। এ বড় দারুণ জায়গা। এ হলো মণিস্থান। সাধনার জায়গা। তোমরা যতিরা এক-একজন দারুণ মাল! তোমরা যে কী করতে পারো, তাঁর ঠিক নেই। তোমরা এক-একজন কৃষ্ণের রথ।

একদিন যতি-আশ্রমে বসে ঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে পারস্পরিক সেবা-সহায়তার প্রসঙ্গে বললেন, তোমরা প্রত্যেকে অন্যের সেবা-সহায়তা ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখবে। হয়তো দেখলে, কারও গেঞ্জিটা খুব ময়লা হয়েছে— তোমার ময়লা গেঞ্জিটার সঙ্গে তার গেঞ্জিটাও একসঙ্গে ধুয়ে ফেললে। ধরো, একসঙ্গে দু-তিন জন খাওয়া-দাওয়া করলে, শেষে অন্যের থালাবাটিটাও মাজার জন্যে নিয়ে গেলে।

এক যতি বললেন, এ ব্যাপারে বর্ণ বিধিটা মানতে হবে তো?

উত্তরে ঠাকুর বললেন, 'সেবাধর্মের মধ্যে বর্ণের বিচার নেই। তুমি বামুনের ছেলে বলে অব্রাহ্মণের এঁটো থালা মাজতে পারবে না— এ কথা কে বললে? ঐ সব বিচারগুলো এই খানে চলে না।'

যতি-আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর থেকে ঠাকুর বেশির ভাগ সময় সেখানেই কাটাতেন। কখনো তাঁর জন্যে রাখা চেয়ারে গিয়ে বসতেন আবার কখনো মাটির বারান্দায় মাদুরে গিয়ে বসতেন। যতিদের নিয়ে গল্পগুজবে, আলোচনায়, উপদেশে সময় কাটতো। যতি-গড়ার একটা সর্বময় ধান্ধা তাঁকে পেয়ে বসেছিল। যেন, যতিরাই হবে তাঁর মনের মতো নির্মিত মানুষ—যারা ভবিষ্যতে তাঁর আদর্শকে ধরে রেখে তা জগতের সামনে ছড়িয়ে দিতে পারবে। সৎসঙ্গের যতি তাই ঠাকুরের হাতে পেটা মানুষ। তিনি তাদের জন্যে সময় দিয়েছেন অঢেলভাবে।

বারবার বলেছেন, 'আমি যে-ভাবে চলতে বলি, সেই ভাবে যদি চলো, দেখবে, তোমাদের দিয়ে কত লোক উপকৃত হবে। তাই বলি, তোমরা আমার মতো করো, আমার মতো বলো, আমার মতো হয়ে ওঠো। জানা ও করার মধ্য দিয়েই হওয়া। অন্য রাস্তা নেই।'

একদিন বললেন, স্রষ্টার কোন সৃষ্টির বন্ধন নেই। তাঁর কর্মের কোন কর্মফল তাঁকে স্পর্শ করে না। তিনি সৃষ্টিকর্তা হয়েও সদামুক্ত। তাঁর সৃষ্ট বস্তুতে তাঁর কোন মোহ বা অভিভূতি নেই।

বারবার ঘুরে ফিরে একটা কথার উপরেই জোর দিয়েছেন। বলেছেন, ইষ্টই হওয়া চাই সব কিছু। তিনিই জীবন, তিনিই ধন, তিনিই চালক, তিনিই প্রভু— তিনিই মালিক। সব-কিছুই তাঁর জন্যে। যা তাঁর কাজে লাগে না, যা তাঁর সেবায় লাগে না, এমন জিনিসে আমার দরকার নেই। আমার সত্তাটাই তাঁর। আমার সব মালেরই একমাত্র মালিক তিনি।'

অনুভব দিয়ে করা দিয়ে, চলা দিয়ে অর্থাৎ সাধনা করে এই রকমটা করে তুলতে হবে। তা হলেই তো আসল কাম হয়ে গেল।

একদিন ভক্তসঙ্গের উপকারিতা সম্বন্ধে কথা উঠলো।

ঠাকুর তাঁর কথায় বললেন, 'প্রকৃত ভক্ত ভগবানকে ছাড়া আর কাউকে চায় না। সে তাঁকে ছাড়া আর কাউকে বোঝেও না। সে তাঁর বিরহ সহ্য করতে পারে না। ইষ্টবিগ্রহেই সে তৃপ্ত— খুশি। তাঁকে পেয়েই সে পরিপূর্ণ।

এক শেষচৈত্রের ঘটনা। ঠাকুর বড়ালের গেটের কাছে চেয়ারে এসে বসেছেন। সামনের সেগুনগাছ থেকে একটা একটা করে শুকনো পাতা ঝরে পড়ছে। ঠাকুর একদৃষ্টিতে তাকিয়ে তা দেখছেন। একবার বললেন পাতাগুলো কেমন একটা একটা করে ঝরে পড়ছে।

এক ভক্ত সেই কথা শুনে প্রশ্ন করলো— এতে গাছের কষ্ট হচ্ছে না? ওর বেদনা লাগছে না?

উত্তরে ঠাকুর বললেন, 'গাছেরও তো প্রাণ আছে। ওর পাতারও জীবন আছে— বোধ আছে। ওরাও ওদের মতো করে সব অনুভব করে। কাজেই, বেদনা ওদেরও হবে। তবে পত্রকুল থেকে একটি যাবে, আর একটি আসবে। একটি আসার ব্যবস্থা হলে তবে আগেরটি পড়ে। এই রকমই ব্যবস্থা করা আছে।'

একদিন দিনলিপিকার প্রফুল্ল দাস- মশাই কথাচ্ছলে ঠাকুরকে শুধোলেন, 'আমার ছোটবেলা সম্পর্কে যা শুনেছি, তাতে তো মনে হয় না, আমার এমনটা হওয়া উচিত ছিল— এমনটা বদ্ধজীব নাকি আমার হওয়ার কথা নয়।'

'হওয়ার কথা না হলে— হলে কী করে? যা চেয়েছিলে, তাই হয়েছো। এর পেছনেও তো তোমার করা আছে। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আর করার বিরুদ্ধে তো কিছু হয়ে ওঠেনি। চাওয়া আর করা মিশেই তো মানুষ যা হবার তা হয়ে উঠেছে। সবটাই একেবারে বাস্তব।'

একদিন শরৎ হালদার-মশাই প্রশ্ন করলেন, 'এই যে, আপনি এখানে আমাদের মধ্যে বসে আছেন, ঠিক এই মুহূর্তেই হয়তো অন্য কোথাও কোন ভক্ত আপনাকে স্মরণ করার ফলে সেখানে গিয়ে হাজির হলেন, সেটা কেমন করে হয়?'

উত্তরে ঠাকুর বললেন, 'হ্যাঁ, এরকম তো হয়ই। আমি শারীরিক ভাবে উপস্থিত থেকেও হয়তো মনের দিক দিয়ে ব্রহ্মদেশে চলে গেলাম। সেখানে যারা আমার সঙ্গে সমভাবাপন্ন তারা আমাকে দেখতে পাবে। আবার যারা অত্যুৎসাহী নয়— অর্থাৎ নির্লিপ্ত প্রায়, তারা দেখতে পাবে। তবে যারা প্রবৃত্তি-অভিভূত, তারা দেখত পাবে না। এসব বৈজ্ঞানিক নিয়ম মেনেই ঘটে। ধরুন, আপনার রেডিও-সেট যদি সঠিক ঈথারতরঙ্গের সঙ্গে খোলা থাকে, তবে যথাকালে অনুষ্ঠান-সূচী তাতে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করবে।'

যতিদের গতিবিধি লক্ষ্য করে একদিন ঠাকুর তাঁদের বললেন, 'তোমাদের কোন ব্যাপারই আমার চোখ এড়ায় না। মানুষের বৃত্তিদাসত্ব সব চেয়ে বড় শত্রু। ও পথে চলতে নেই। যেমন ধরো, যতির ঘরে মেয়েলোকের ঢোকা নিষেধ। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি, যতির ঘরেও একপা-দুপা করে মেয়ে লোক ঢুকছে। ঢুকে একেবারে চৌকির উপরেও গিয়ে বসছে। সব কাণ্ডই আমার চোখে পড়ে যায়। এ সব ভালো নয়। আমি যা বলি, তা কাঁটায় কাঁটায় পালন করা ভালো। আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে চলার ইচ্ছা ভালো নয়। ওতে ইষ্ট-কেন্দ্রিক হওয়া যায় না। তোমাদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে, আমার কথা শুনে চলা।'

॥ তেত্রিশ ॥

১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারি বুধবার। প্রাতঃকালে সুধামা কন্যা সম্বিতাকে সঙ্গে নিয়ে এসে প্রণাম নিবেদন করে দাঁড়িয়েছেন ঠাকুরের পাশে। সম্বিতাকে ভালো করে নিরীক্ষণ করে বেশ খুশি মনে ঠাকুর বললেন, দ্যাখো, সম্বিতার চোখেমুখে কেমন বুদ্ধির দীপ্তি— চলনে-বলনে কেমন প্রাণোচ্ছল ব্যঞ্জনা। একটু তাকিয়ে থেকে বললেন, 'অনুলোমে যে ঝাঁজ বাড়ায়, তার প্রমাণ পাওয়া যায় সম্বিতাকে দেখে।'

সম্বিতা হলো ঋত্বিগাচার্য কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের ক্ষত্রিয়া স্ত্রী সুধামার গর্ভজাত অনুলোমক্রমিক কন্যা।

ঠাকুরের মন্তব্য শুনে মা ও মেয়ে একই সঙ্গে আনন্দোৎফুল্ল হয়ে ঠাকুরের প্রতি কৃতজ্ঞতাভরা প্রাণোচ্ছলতায় পূর্ণ হয়ে উঠলো। ঠাকুরের সন্নিধানে বাসক্রমেই এই সব সম্ভব হয়েছে।

এই সব কথাবার্তার মধ্যে এক সময়ে এক মা জিজ্ঞেস করলো, 'ঠাকুর, মানুষের মধ্যে কেউ খাটো হয় আবার কেউ লম্বা হয়। এরকম হয় কেন?'

'সবই মা-টির গুণ।' উত্তর দিলেন ঠাকুর।

বললেন, 'এক বেগুনের বীজ বিভিন্ন রকম মাটিতে বুনে বিভিন্ন রকম বেগুন পাওয়া যায়। মানুষের ক্ষেত্রেও তাই হবে। মাটি হলো মা। এক-এক মায়ের পেটে এক-এক রকম সন্তান আসাই স্বাভাবিক। বীজ এক রকম হলেও মাটিরূপিনী মায়ের দোষে বা গুণে তার গর্ভে তদনুপাতিক সন্তানই হয়ে থাকে। কোন সন্তান বেশ স্বাস্থ্যবান হয়, হৃষ্টপুষ্ট হয়, দীর্ঘজীবী হয়। বীজটা গ্রহণের সময়ে মায়ের মানসিক প্রস্তুতির ভূমিকাই প্রধান ভূমিকা পালন করে। অবশ্য নির্দোষ বীজের ভূমিকাও তার দায়িত্ব পালন করে। তবে, ঐ মাটির স্বভাব মায়ের উপরেই সুসন্তান আমন্ত্রণের দায়িত্ব সর্বাধিক। মাটিরূপী ঐ মায়ের হাতই থাকে বেশি। তাই, বলা যায় মাটির গুণে ফল।

ঐ দিনেরই রাতের দিকের কথা। ঠাকুর মাঘের শীতে একখানা কাঁথা গায়ে জড়িয়ে বসে আছেন। বসে বসে সমবেত ভক্তদের নানাবিধ জিজ্ঞাসার জবাব দিচ্ছেন।

দিনলিপিকার প্রফুল্লকুমার দাসের মনে প্রশ্ন এলো— প্রাণহীন দ্রব্যেরও কি চেতনা আছে? তিনি শ্রীগুরুর মুখ থেকে সঠিক জবাবটা জানতে চাইলেন।

ভক্তিমান শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর উত্তর দিলেন— 'হ্যাঁ, সব কিছুর মধ্যেই চেতনা আছে। প্রাণ থাক আর না থাক, চেতনা থাকবেই। যার কাছে আত্ম-পর বলে কোন পার্থক্য নেই— যে সকলের প্রতি সমান চেতন, সে এটা খুব ভালো ভাবেই টের পায়। চেতনা বিহীন কোন বস্তু সম্ভব নয়। একটা কাঠের খুঁটিতে যখন ঝড় লাগে এবং ঝড়ের দাপটে সে কাঁপতে থাকে, তখন তার কষ্ট কিন্তু বেশ বুঝতে পারি। তার কষ্ট আমার অনুভূতিতে ধরা পড়ে। এটা কল্পনার কথা নয়— একেবারে জলজ্যান্ত সত্য।

আরও বললেন, 'আমি যখন বুঝতে পারি, তুমিও নিশ্চয় বুঝতে পারবে। একাত্মতার জাগরণ ঘটলেই এ সব সহজভাবেই ধরা দেয়।'

আরও যোগ করলেন, 'চেতনাবিহীন কোন বস্তু হয় না, আর আমি নিজে চেতন বলেই আমার পক্ষে তার চেতনার সঙ্গে যুক্ত হতে কোন কষ্ট হয় না।'

ঐ শীতের মরশুমেই একদিন হাউজারম্যান ঠাকুরকে প্রশ্ন করলো— যে-সব ভক্ত আপনাকে কাছে না পেয়েও দূরবর্তী ঋত্বিকের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে, তাদের কাছে তো আপনি নিকটবর্তী কিংবা চোখে দেখা জীবন্ত সদ্‌গুরু নন, তারা তবে দেখা-দৃষ্টান্ত জ্যান্ত সদ্‌গুরুকে পেলো কী করে? তাদের কাছে তো ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে।'

উত্তরে ঠাকুর বললেন, 'না, তুমি যতটা হতাশ হচ্ছো, ব্যাপারটা কিন্তু ততটা হতাশাব্যঞ্জক নয়। ইষ্টানুগ নামধ্যান পরায়ণ ঋত্বিকের মধ্যে গুরুদেবের জীবন্ত ছাপ থাকেই। সে গুরুকেই বহন করে বেড়ায়। তার কাছে যারা দীক্ষিত হয়, তারা ঠাকুরকে কিছুটা পায়ই। ওর জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। যোগ্য ঋত্বিকের কাছে দীক্ষা নিলে দীক্ষা তাই ব্যর্থ হয় না।'

তবে তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে এইটুকু যোগ করে দিতেও ভুললেন না— 'যদি সময়টা এটাই হয়ে থাকে যে, যুগপুরুষোত্তম তখন আর স্বদেহে নেই তবে সদ্দীক্ষা নিয়ে তাঁর পুনরাগমনের জন্য তপঃপরায়ণ হয়ে অপেক্ষা করে থাকাটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। দেহধারী যুগপুরুষোত্তমই হলেন প্রকৃত গন্তব্য এবং একমাত্র সাধ্য। তাঁকে পাওয়া মানেই ঈশ্বরকে পাওয়া।'

এই সময়ের মধ্যে একজন ভক্ত এলেন বিদেশ থেকে। তিনি কিছু দুঃখের কথা শুনাতে এসেছেন ঠাকুরকে। খুব দুঃখিত মনে নির্বাক হয়ে বসে থাকলেন ঠাকুরের সামনে। ঠাকুর সবই দেখলেন, বুঝলেন। একটু পরে বললেন, 'কী বলবে, বলো।'

কিছুক্ষণ বিমর্ষ থেকে লোকটি বললেন, 'ঠাকুর, আমার বড় দুঃসময় চলছে। আমার এবং আমার স্ত্রীর রাহুর দশা চলছে। এর প্রতিকার করা যায় কিসে?'

'নামের তেজ বাড়িয়ে দাও। জোরসে নাম চালিয়ে যাক আর ভালো করে ভক্তিভরে ইষ্টভৃতি করতে থাকো।'

একটু থেমে এর সঙ্গে আর একটু যোগ করে বললেন, 'আর রোজ সকালে ইষ্টভৃতি নিবেদন করার পরে ইষ্টকে যথাবিধি পাত্রে করে ফুলজল নিবেদন করো। করার পরে বাড়ির সবাই মিলে ঐ ফুল সম্পৃক্ত জল কিছুটা করে পান করো। দেখবে, সব রাহুফাহু কোথায় পালিয়েছে।'

শেষে বললেন, 'তোমরা শুনেছোও অনেক, জেনেছোও অনেক, তৎসত্ত্বেও বোঝোনি ততো। শুনে, জেনে, বুঝে থাকলে ঐ সব ব্যাপারে আমার মুখ থেকে আর একবার শোনার জন্যে এত প্রত্যাশা নিয়ে আসবে কেন? আমার বলাগুলোকে শাস্ত্রসম্মত বৈজ্ঞানিক বিধান বলে স্বীকার করে নিতে পারো না। যে ক্ষেত্রে যে পাঁতি দেওয়া আছে, সেই ক্ষেত্রের সেই পাঁতিই তো আমার শেষ কথা।'

হাজার কথা বলেও কথা ফুরোয় না। কতবিধ যে প্রশ্ন আর তার কতবিধ যে উত্তর— তার ঠিক ঠিকানা নেই। শেষমেষ হিসাব করলে দেখা যাবে, নানা দিনে নানা ঘটনাক্রমে ঐ সব সমস্যার কথা বহুবার আলোচিত হয়েছে। ফলতঃ, নানা ঢঙে নানা দিন ঐ সব প্রশ্ন আসে আবার নানা ভাষাশৈলীতে মানুষ তার উত্তরও পায়।

ঠাকুর এ ব্যাপারে নিজেই বলেছেন, 'কোথা থেকে যে এত কথা এসে জোটে তা আমি নিজেই ঠাওর পাই না। জোগানদার একজন থাকেন। ঠাকুরের দেওঘরে থাকাকালে যে কখনো স্থানীয় অনুন্নত প্রতিবেশীদের নিয়ে কোন ঝামেলায় পড়তে হয়নি, তা নয়। ঐ সব অনুন্নত অশিক্ষিত মানুষেরা মাঝে মাঝে নেশাগ্রস্ত হয়ে আশপাশের নিরীহ সৎসঙ্গীদের সাথে অনেক রকম দুর্ব্যবহার করেছে— সামাজিক পরিবেশকে দূষিত করার চেষ্টা করেছে। ঠাকুর তখন বাধ্য হয়েই বৈদ্যনাথধামস্থ বিশিষ্ট পাণ্ডামহোদয়দের কাছে শালিশের আবেদন জানিয়ে তাঁদের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন। বুদ্ধিমান্ বয়স্ক পাণ্ডাবংশের নেতৃবর্গ ঠাকুরের আবেদনে সাড়া দিয়ে আশ্রমে এসে ঠাকুরের মুখ থেকে সব শুনে অপরাধীদের শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং প্রয়োজনমতো দুষ্কৃতিদের শাসনের ব্যবস্থাও করেছেন।

নিরপেক্ষ এই সব সমাজরক্ষক বয়স্ক পাণ্ডাগণের সামাজিক ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করে ঠাকুর প্রায়ই বলতেন— এই রকম গণ্যমান্য সামাজিক ব্যক্তিরাই সমাজের প্রকৃত শাসক। আগে এইটাই ছিল, এখনও যেখানে যেখানে এই ব্যবস্থা আছে, সেখানে সমাজচিত্র ঠিকই আছে। এঁরাই হলেন সমাজের সহজ এবং স্বাভাবিক শাসক।

একদিন কথাক্রমে বললেন, 'বিপ্ররা ছিল শিক্ষক শ্রেণী। তাই, তাদের এত সম্মান। বিপ্ররা ভিক্ষা করে খেতো, দক্ষিণাই ছিল তাদের সম্বল। বিপ্রদের সেবায় উচ্ছল হয়ে সাধারণ মানুষ অর্জনপটু হয়ে উপার্জিত অর্থের যে অংশ তাদের দিতো, তাই নিয়েই তাঁদের চলে যেতো। এই প্রাপ্তিই ছিল তাঁদের জীবিকা। একেই বলা হতো উঞ্ছবৃত্তি। এর মর্যাদা ছিল অনেক। বিপ্রদের মানুষ গড়ার গরজ থেকে সমাজ যে সর্বোত্তম পরিসেবা লাভ করতো, তার ফলেই সমাজের প্রতি বর্ণের মানুষেরা হয়ে উঠতো আপন কর্মে সমর্থোত্তম ব্যক্তিত্ব। তাই তখন সমাজের ছিল এত রমরমা— দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যেতো। পল্লীতে পল্লীতে বিপ্রগণ যেতেন এবং প্রতি বর্ণের মানুষদের বৈশিষ্ট্যপালী স্বনির্ভরতায় উজ্জীবিত করে সমাজকে চাঙ্গা রাখতেন। তাঁরা মানুষকে সর্বসমর্থ করে তুলে তাদের উপার্জিত অর্থের কিয়দংশ মাত্র গ্রহণ করেই উৎফুল্লচিত্তে জীবন যাপন করতে পারতেন। এই উঞ্ছবৃত্তিজীবিত বিপ্রগণ ছিলেন ভাগ্যবান্ মানুষ। তাঁরা ছিলেন কত নির্লোভ, কত সেবাপরায়ণ, কেমন স্বল্পসুখী ব্যক্তি। এই রকম বিপ্রের প্রাধান্য ছিল বলে দেশ ছিল সুজলা সুফলা এবং সকল সম্প্রদায়ের পক্ষে সুভূমি।'

একজন ভক্ত বললেন, 'ঠাকুর চীনদেশে বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট প্রভাব আছে। কিন্তু বৌদ্ধমতের শূন্যবাদটা বোঝা যায় না। এ শূন্যবাদের তাৎপর্য কী?'

উত্তরে ঠাকুর বললেন, দ্যাখো, বুদ্ধমত অত্যন্ত বাস্তবমুখী মতবাদ। শূন্যবাদ হলো নেতিবাচক মত। কাজেই বৌদ্ধমতে শূন্যমতের কোন স্থান নেই। শূন্যবাদের দোহাই পাড়া মানে বুদ্ধমতবাদকে বুঝতে না চাওয়া। বুদ্ধদেবের কথা হলো— ঠিকমতো চলো, বলো, করো। সেইটেই তোমার চলার পথ, তাতেই তোমার জীবন সার্থক হবে। অন্যপথ নেই।

আর বললেন, 'বুদ্ধদেবের ত্রিশরণ মন্ত্র কি কম কথা? ঐটেই তো মোদ্দা জিনিস।'

'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি,

ধর্মং শরণং গচ্ছামি,

সংঘং শরণং গচ্ছামি।

এই ত্রিসংকল্প নিয়েই বুদ্ধের পথে চলার কথা। প্রত্যেক বুদ্ধ-শিষ্যের কাছে এই ত্রিশরণই জীবন পথ। প্রথমেই আসছেন পুরুষোত্তমরূপী শ্রীবুদ্ধদেব, তারপরই আসছে তার প্রবর্তিত ধর্মচর্যার প্রতি আনুগত্য। অতঃপর ইষ্টদেবের প্রতিষ্ঠিত সংঘানুগত্য। এই ত্রিশরণতত্ত্বের উপরে আর কিছু কায়দা থাকতে পারে না। এটা বৌদ্ধদের শরণমন্ত্র হলেও এর উপরে আর নীতি থাকতে পারে না। এতে প্রথমেই পুরুষোত্তমের গুরুরূপী নররূপ স্বীকার করে নেওয়া হলো। তারপরে তাঁর প্রবর্তিত ধর্মাচরণ পদ্ধতির প্রতি আনুগত্য স্বীকৃত হয়েছে। এই দুইয়ের সমন্বয়ই যে সংঘের প্রাণ তাও মেনে নেওয়া হয়েছে এবং সেই সংঘ যতক্ষণ ইষ্ট ও ইষ্টের ব্যবস্থা-কেন্দ্রিক, ততক্ষণ সেই সংঘই শিষ্যের আপন সংঘ— কর্মজগতের সাধন ভূমি।

॥ চৌত্রিশ ॥

সময়টা মাঘ মাসের মাঝামাঝি, ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দ। সকাল বেলায় শীতের রোদ পিঠে নিয়ে ঠাকুর গোল তাঁবুর নিচে একটা পাতলা আদ্দির চাদর গায়ে জড়িয়ে বসে আছেন। নারী-পুরুষ ভক্তগণ তাঁকে ঘিরে বসে বা দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গসুখ উপভোগ করছেন। এমন সময়ে এক বহিরাগত ভক্ত ঠাকুরের জন্য অতি উত্তম সুঘ্রাণযুক্ত বেশ কিছু খেজুরে পাটালি গুড় নিয়ে এসে ঠাকুরকে নিবেদন করে দাঁড়ালেন। পাটালিটা বেশ ভালো করে দেখে নিয়ে—

বাঃ বেশ তোফা মাল তো— যাও বড় বউয়ের হাতে দিয়ে এসো।

কাছেই কালীষষ্ঠীমা দাঁড়িয়ে ছিলেন। কালীষষ্ঠীর দিকে তাকিয়ে বললেন, এই কালীষষ্ঠী, পাবনার পাটালির কথা মনে পড়ে তো— এক বাড়িতে সেই পাটালির পায়েস রান্না হলি পাড়াসুদ্ধ সুবাসে ম-ম— করতো।'

আশাবাদী কালীষষ্ঠী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আপনার দয়ায় আবার যখন সবাই দেশে ফিরে যাবো, তখন সবই আবার ভোগ করা যাবে।'

কালীষষ্ঠীর আশাবাদ লক্ষ্য করে ঠাকুর বললেন, 'তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক— তাই যেন ঘটে।'

নরেন সরকার নামক এক ভক্তের সঙ্গে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে। ঠাকুর প্রশ্ন করলেন, তা, নরেন, তোমরা এসব দেখেশুনে কিছু করছো, না, চুপ করে আছো? তোমাদের তাই বলে কি কিছুই নেই? তোমরা অবস্থা সামাল দেবার মতো কিছুই কি পাও নি? যে ছক্ পেয়েছো, তাঁ পকেটে পুরে রাখলেই হবে— না তা বুঝে দেখে কাজে লাগাতে হবে? বুঝলে কোন্‌টা?

'আজ্ঞে, গুরু নেই, পথ প্রদর্শকও নেই। ইষ্টবিহীন সমাজে এই রকমই হয়।' উত্তর দিলেন সরকার মশাই।

'ও সব ছোঁদো কথা ছাড়ো। গুরু নেই কথাটা কেমন হলো? গুরুর খোঁজ করো, গুরু বের করো— গুরু ধরে চলে মানুষকে দেখাও, তাতে কী সম্ভব হয়। আর কাউকে যদি গুরুরূপে না দ্যাখো, নিজেই গুরু হয়ে গুরুর মতো চলো, দেখবে, সবই বেনো জল— আজ আছে, কাল নেই। অনেক কিছু পেয়েও তোমরা তা স্বীকার করো না, মানুষকে করে দেখাও না— এইটাই আমার বড় দুর্ভাগ্য।

কেউ স্বীকার করতেও রাজি না। সেই যে যীশুর কথা আছে— ঊষাকালে তিনবার কুকড়া ডাকার আগেই তোমাদের মধ্য থেকে আমাকে অস্বীকার করা হবে, এও দেখছি, সেই রকম কথাই হলো। এত চট করে ভুলে যাও কেমন করে? অনেক অনেক জিনিস পেয়েছো, এবার কাজে লাগাও। রাজার ছাওয়াল হয়ে দৈন্য প্রকাশ করো ক্যা? ওতে কি বাপের মান বাড়ে? না, দুই পক্ষই খাটো হও?

একদিন যাজন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বললেন, 'যাজনে যেমন অপরের ভালো হয়, তেমনি নিজেরও ভালো হয় প্রভূত। এতে অনেক কিছু বোধ নতুন করে পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে। এতে করে জ্ঞান হয়, বিবেক বাড়ে, ধারণাশক্তি তুখোড় হয়— সব রকম বাড়-বাড়ন্তে মানুষ সুবিধা পায় অনেক। অবশ্য যাজন করতে গেলেই যজনটা চালিয়ে যেতেই হয়। যজন হলো, নিজেকে ইষ্টের রঙে সর্বদা রঙিন করে রাখা— মুখে এবং ব্যবহারে ইষ্টরতি ফুটে ওঠে যজন কর্মের জৌলুষে। তদনুগতিতে চলা এবং তাঁর রতিতে মেতে থাকাই যজন। এক কথায় যজন হলো তচ্চিন্তা-পরায়ণতা। তন্মনা হয়ে থাকা। এই অবস্থা চলতে থাকলে মুখে ও ব্যবহারে যাজন এসেই পড়ে। যজন হলো, তদ্ভাবনায় ভাবিত থাকা এবং যাজন হলো মুখের কথায় এবং ব্যবহারে অন্য সকলের চিত্ত জয় করে তাকে ইষ্টে সংলগ্ন করে দেওয়া। তিনটি কর্ম একসঙ্গে চালিয়ে যেতে হয়। যজন, যাজন এবং ইষ্টভৃতি। এই ত্রিকর্ম একসঙ্গে চালিয়ে গেলে আর দেখতে নেই— মানুষ হয়ে জন্মানোর উদ্দেশ্যসিদ্ধি হতে বাধ্য। সেই জন্যেই যজন, যাজন, ইষ্টভৃতির উপরে এতো জোর দেওয়া আছে। বুঝেও যদি না করো তো বলার কিছু নেই।

একদিন ভক্ত সমাবেশে কথাপ্রসঙ্গে ডাক্তার সুবোধ সেনকে লক্ষ্য করে বললেন, 'নিজের ক্ষতি না করে বর্ণ ভাঙা যায় না। প্রত্যেকটা বর্ণের বিধিমাফিক উৎকর্ষ সাধন করতে হয়। জানবে, কোন বর্ণেরই তেজ কম নয়। আর কোন বর্ণকে বাদ দিয়েও সমাজ চলে না। সবগুলোর সুষ্ঠু সমন্বয়ে মানবজাতির সার্বিক কল্যাণ। তিন বর্ণের সুষ্ঠু সমন্বয় এবং সম্বন্ধেও উৎকর্ষসাধনই মানবজাতির সামগ্রিক উন্নয়নবিধানের মূল কথা। কোন একটি বর্ণকে বাদ দিয়ে চলার চিন্তা মারাত্মক আত্ম-বিস্মৃতির পরিণতি। প্রতি বর্ণের সংরক্ষণমুখী পরিচর্যা এবং উৎকর্ষসাধনের মধ্য দিয়েই আসে সমাজের ত্রিমুখী উৎকর্ষের চরম বিকাশ। আদর্শ সমাজ আদর্শ বর্ণচর্যারই আকাঙ্ক্ষিত জাতক।

সময়টা ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি বুধবার। শ্রীশ্রীঠাকুর কথাচ্ছলে প্রাচীন ভারতের সংবিধান সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। ঐ প্রসঙ্গে ঠাকুর বললেন, আগের দিনে ছিল কুলপতি, গোষ্ঠিপতি, গ্রামাধিপতি, দশগ্রামাধিপতি ইত্যাদি নামধারী সমাজপতিগণ। প্রতি গ্রোষ্ঠীতেই সকল বর্ণের লোকজন থাকতেন। আর সকল গোষ্ঠীর উপরওয়ালা হিসেবে থাকতেন বশিষ্ঠ অর্থাৎ বৈশিষ্ট্যপালী একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি— তিঁনিই ছিলেন রাষ্ট্রপতি। একজন রাজা বা দেশশাসক অবিশ্য থাকতেন, কিন্তু তাঁকে রাষ্ট্রপতি বা ঐ বশিষ্ঠকে মেনে চলতে হতো। আর রাজাকে হতে হতো চরিত্রধর, গুণগ্রাহী এবং নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণ। এখানে আজেবাজে লোকের গলাবাজির কোন সুযোগ ছিল না। আর রাজাকে আর একটা কাজ করতে হতো। রাজা ছিলেন বর্ণাশ্রমের ধারক, বাহক এবং রক্ষক। আর এই বর্ণব্যবস্থার ফল শিক্ষা, দীক্ষা, জীবিকা, ব্যবসা, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও সামাজিক শাসন প্রভৃতি সব কিছু চলতো শোভন মাত্রা মেনে।

সেদিন ঐ বছরে সরস্বতী পূজা। ঠাকুর তাই সরস্বতী শব্দের অর্থ দেখতে বললেন। অভিধান খুঁজে দেখা গেল, সরস্বতী শব্দ এসেছে সৃ-ধাতু থেকে। সৃ-ধাতুর অর্থ গতি। অর্থাৎ সরস্বতী মানে গতিতে যার বাস। গতির পরম নিবাস ব্যোম। ব্যোমবাসিনী দেবীই সরস্বতী। ব্যোমে যার বিহার, তিনি হলেন বাক্। কাজেই বাগ্‌দেবী হলেন ব্যোমনিবাসিনী দেবী বা ব্যোমাধীকর্ত্রী। তাঁর হাতে বীণা অর্থাৎ বাদ্যযন্ত্র। তাই, তিনি হলেন ব্যোমবাসিনী আদিধ্বনি। আদিতে যে বাক্ ছিলেন বলে বাইবেলে বলা আছে, বাগ্‌দেবী হচ্ছেন তিনিই।

ঠাকুর সেই দিনই সতীশচন্দ্র গোস্বামী প্রভুকে ডেকে বললেন, সুবোধ ব্যানার্জীর উপনয়নের ব্যবস্থা করতে। ওর উপনয়নের দেরি হয়ে যাচ্ছে। তাতে গোসাঁই বললেন, ওর তো এখন পয়সাকড়ি নেই— বাড়িতে চুরি হয়ে গেছে। এই কথা শুনে ঠাকুর বললেন, ওর পয়সা নেই তাতে কী হয়েছে? ওর আমরা তো আছি। আপনি আছেন, আমি আছি— চিন্তা কিসের? আপনি উদ্যোগী হোন। ঠাকুরের এই মন্তব্য শুনে সুবোধ ব্যানার্জী বললেন, ঠাকুর এ ব্যাপারে আপনি দয়া করে কিছু দেবেন না।

সে আবার কী কথা রে? তুই কি আমার ছাওয়াল না? তুই কি পর? এমন কথা কস ক্যা? আর ওসব কথা ভাবিস্ না। তোরই কি লোক বল কম? তোর কি ভালোবাসার মানুষ নেই?

একদিন কথাপ্রসঙ্গে বললেন, নামধ্যানে স্নায়ুগুলি গ্রহণক্ষম ও সাড়াপ্রবণ হয়ে ওঠে। তাই, নামধ্যান এত জরুরি। নামধ্যানের মধ্য দিয়ে দেহমন দুইই সুস্থ ও সবল হয়ে ওঠে, কর্মক্ষমতা অনেকগুণ বেড়ে যায়। বললেন, 'আমাদের সকলেরই আগমন আদিধ্বনি থেকে— ঐ বীজই আমাদের আদিসত্তা। কাজেই ঐ বীজ কেন্দ্রিক জীবনই উৎসমুখী জীবন। আর সেই জীবন-আদর্শ জীবনরূপ। সেই জন্যই নাম-ধ্যান এত প্রয়োজনীয়। এই কেন্দ্রমুখিনতাই আমাদের আদি সম্বেগ। কাজেই, যে নামধ্যান পরায়ণ হয়ে চলে, সেই জিতে যায়। সেই স্বস্থ হয়।

এক সময়ে বললেন, শরীরটাই মানুষ নয়। চিৎশক্তি হলো মূলকথা। আবার, চিৎশক্তি এসেছে চৈতন্যরূপী আদিধ্বনি থেকে। শেষ মেষ গিয়ে দাঁড়ায় ঐ আদিধ্বনির অস্তিত্ব। নামজপ মানে তাই আমার আদি স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতনার চর্চা। আদিতে ঠিক থাকলে সবই ঠিক আছে। তাই ধ্বনিমুখী চলনই ভক্তের চলন।

গুরুর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এক সময়ে ঠাকুর বললেন, 'আমার সত্তা আছে— পারিপার্শ্বিক তা ভেঙ্গে দিতে চায়। আমার যদি একজন গুরু থাকে, তবে তাঁর নির্দেশে চলে সেই বিরোধী পারিপার্শ্বিককে আপন করে নিয়ে তা থেকে জীবনবর্ধনের উপযোগী মালমশলা সংগ্রহ করে আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারি।'

ঐ প্রসঙ্গে আরও বলেছেন, 'হিসেবী ভালোবাসা ভালোবাসাই নয়। সহজ ভালোবাসাই যোগ,— আর তা থেকেই সব আসে। কোন কিছুর আশায় ভালোবাসলে হয় না।'

কথাকে টেনে আরও বলেছেন, তাঁকে ভালোবাসো, তিনি রসগোল্লা ভালোবাসেন— তাই, তাঁকে খাওয়াবার জন্যে কোথা থেকে কত কষ্ট করে রসগোল্লা বয়ে নিয়ে আসছো— কোন কষ্ট তো নেইই, তিনি দয়া করে খাবেন, সেই আহ্লাদে মশগুল হয়ে আছো— এমনটা হয়। তার ঐ ভোগের বস্তু না আনতে পারলেই বরং বড় কষ্ট বড় দুঃখ হতো। ভালোবাসা জিনিসটাই এমন। তাঁর সঙ্গে এই রকম যোগ চাই। সেই যোগই কষ্টানুভূতিকে ভোতা করে দেয়। তার জায়গায় স্থান নেয় সুখানুভূতি— প্রিয়পরমে আত্মনিমজ্জন।

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারি রবিবার। ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের মাঘ মাস। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। এক মা বললেন, 'যদি বর্ষে মাঘের শেষ, ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।'

মা'টির মুখে খনার বাণী শুনে রসিকতা করে ঠাকুর বললেন, 'সেই পুণ্য দেশে যদি শীত জাঁকায়ে বসে, তবে তো এই বামুনের অবস্থা কাহিল।'

একটু পরে ঠাকুর কথাচ্ছলে ভক্ত হাউজারম্যানকে বললেন, 'একজনের স্বাভাবিক চরিত্র কেমন, তা বোঝা যায়, সে বাড়িতে মা-বাপ, ছোট ভাইবোন, চাকর-বাকর ইত্যাদির সঙ্গে কেমন ব্যবহার করে— তাই দেখে। বাড়ীটাই পরীক্ষাগৃহ— ওখান থেকেই যোগের শুরু।'

একটু থেমে সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, 'যেমন যেমন বলা আছে, তেমন তেমন করতে থাকো। দেখতে দেখতে অমৃতের সন্তান হয়ে উঠবে।'

এই মন্ত্রেই তো কেল্লামাত।

তুমি যদি ইষ্টের হও, তোমার জগৎটাও তাহলে ইষ্টের হবে।

কায়মনোবাক্যে তাই ইষ্টের হও।

'তখন দেখবে, তোমাকে নিয়ে লোকের মধ্যে টানাটানি পড়ে গিয়েছে। এই প্রসঙ্গে বললেন, আগের দিনে আমি যখন মাঝে মাঝেই কুষ্টে যেতাম, তখন কোন্ বাড়িতে আমাকে নিয়ে তুলবে, তাই নিয়ে লোকের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেতো। সবাই চাইতো, আমি যেন তার বাড়িতেই উঠি। আমি যে-বাড়িতে উঠতাম, সে বাড়িতে যে কত রকম খাদ্য সামগ্রী— চাল-ডাল, ঘি-তেল-মিষ্টি-মিষ্টান্ন ভোগ্য সামগ্রী পড়তো, তার ঠিক নেই। সে এক ভোগ নিবেদনের সমারোহ লেগে যেতো। যাদের বাড়িতে থাকতাম, সে এক ভোগবাড়ি হয়ে উঠতো।'

একদিন অকালবার্ধক্য–সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল।

ঠাকুর বললেন, 'যদি বিয়েটা ঠিকমতো হয়ে না থাকে, স্ত্রী যদি স্বামীর প্রতি সশ্রদ্ধ সেবাভাবাপন্না না হয়ে থাকে— ঝগড়া-বিবাদ যদি লেগেই থাকে, তবে পুরুষের অকাল-বার্ধক্য তো নির্ধারিত ঘটনা। আর অকাল বার্ধক্য থেকেই তো অকাল মৃত্যু— অর্থাৎ স্ত্রীলোকের বৈধব্যযন্ত্রণা অবধারিত হয়ে ওঠে। তাই, অকাল বৈধব্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা মায়েদের হাতেই থাকে বেশীর ভাগটা। মা-ই নিজের পরিবারের ভাগ্য নির্মাণ করে থাকে। সব-কিছুর মাপের যন্ত্র মায়ের হাতে থাকে বলেই সে মা। এই কথার ফাঁকে এক সময়ে বলে নিলেন, 'নিয়মিত ইসবগুল খেলে অনেক কিছু বদ মাল বের করে দেয়। ওতে বার্ধক্যও কিছুটা আটকায়।'

আবার বললেন, 'থানকুনির কথাও বলা আছে। থানকুনিও এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করে। এগুলো করে দেখো।'

ঐ আসরে রোগারোগ্য সম্পর্কে অনেক কথাই আলোচনায় এসেছিল। সেই ব্যাপারে ঠাকুর বললেন, 'ওষুধপত্র টোটকা-টুটকীর কথা তো আছেই, সবার উপর হলো নাম। অসুস্থ রোগীর অঙ্গস্পর্শ করে নির্ভঙ্গ নাম চালিয়ে গেলে, তার ফল হাতে-নাতে পাওয়া যায়।'

বললেন, 'কুষ্টিয়ার লোকেরা একসময়ে বাজারের মধ্যে বড় রাস্তার ধারে একটা পাকা বাড়ির দোতলায় ২৫/৩০ শয্যার এক নাম হাসপাতালই বানিয়ে ফেলেছিল। সেখানে কঠিন রোগগ্রস্ত মৃতপ্রায় রোগীকে রেখে কেবল অঙ্গ-স্পর্শ করে নামের জোরে ঢের লোককে সুস্থ করে তুলে এক অসাধ্য সাধন কর্মে মেতেছিল।'

তবে নামের শক্তি পরীক্ষা না করে নামকে নামযজ্ঞের সাধ্য বিষয় করে তুলতে হয়। আদিধ্বনির উপরে আর কোন শক্তি নেই। নাম তাই সদাজপ্য ও সদাসাধ্য।

উদাহরণ দিতে গিয়ে ঠাকুর কতবার গল্পচ্ছলে তাঁর দেখা মৃত তেলাপোকা আর এক মৃত গুবরে পোকাকে নামের জোরে সম্পূর্ণ সুস্থ এবং সতেজ করে স্বাভাবিক জীবনের ফিরিয়ে আনার গল্প দুটো শুনিয়েছেন।

একদিন কথাচ্ছলে বললেন 'কোন মানুষকে বাতিল করে দেওয়া ভালো না। তাকে সংশোধন করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। আর এটা করতে গেলে চাই ইষ্টনিষ্ঠাসম্পন্ন ভালোবাসা, সহ্য, ধৈর্য ও অধ্যবসায়। এ ছাড়া ফাঁকিবাজিতে কিচ্ছু হয় না।'

এক সময়ে বললেন, 'মানুষকে শুধরাতে গেলে ইষ্টপ্রতিষ্ঠাপন্ন ভালোবাসা নিয়ে নিজে ঠিক থেকে তার পিছনে লাগতে হয়— নতুবা আমরা নিজেরাই সেই মানুষটার খোরাক হয়ে যাই। সেও মরে, আমরাও মরি। দু'তরফা বদ কেচ্ছার সূচনা করি।

ঠাকুর খুব জোর দিয়ে বলেছেন, ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন হওয়া লাগে কঞ্জুষের মতো। বিকল্প কোন রাস্তা নেই। অনেকে বলে, বিশ্বাস করে ঠকলাম। সে ঠকেছে ঠিকই, কিন্তু বিশ্বাসটা করলো কবে? নিজেও ঠকেছি, অন্যকেও ঠকিয়েছি— এর বেশি কিছু করিনি।

ঠাকুর একদিন কথাপ্রসঙ্গে বললেন, কোন কাজে সাফল্যের মুখ দেখে যদি মনে অহংকার আসে, তা হলেই কিন্তু সব গেল। উদাহরণ দিতে গিয়ে বললেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুন যখন বুঝলেন, জয় প্রায় তাঁদের হাতের নাগালে, তখন মনে এলো একটু অহংকার। পরপর জয়ের কয়েক দিনের যুদ্ধে জয়ের মুখ দেখে অর্জুনের মনে এলো অহংকারের ভাব। ভাবলেন, তিনি বেশ যুদ্ধপটু— যুদ্ধে সবাইকে হারাতে পারেন। ঐ আনন্দ ভাবনায় অহংকৃত হয়ে একদিন কৃষ্ণের শিবিরে আসার সময়ে হাসতে হাসতে প্রভুর মুখের দিকে তাকিয়ে ঢুকছেন। শ্রীকৃষ্ণ তা লক্ষ্য করলেন এবং তার মানেও বুঝলেন। শ্রীকৃষ্ণ সবটা বুঝে যুদ্ধের পুরো দায়িত্ব অর্জুনকে দিয়ে নিজে দ্বারকায় চলে গেলেন। অর্জুনও কোন আপত্তি করলেন না, তিনি তখন নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে প্রচণ্ড রকমের আস্থাশীল। তিনি জেনে বসে আছেন, তিনি একাই বহু সেনাপতিকে পরাস্ত করতে পারেন— তাঁর তুল্য যোদ্ধা নেই। তখন একা যুদ্ধে গিয়ে অর্জুন প্রায় দিনই হারতে লাগলেন। কৃষ্ণহীন তৃতীয় পাণ্ডবের অবস্থা তখন কাহিল। অবস্থা বুঝে অর্জুন পুনরায় প্রভুর শরণাপন্ন হলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের দয়ায় বিপদমুক্ত হলেন। যতক্ষণ কৃষ্ণ ছিলেন জীবন রথের সারথি, ততক্ষণ তিনি ছিলেন অজেয়। কৃষ্ণের করুণার অনুশোচিত অর্জুন পুনরায় ফিরে পেলেন তাঁর পূর্ণ শৌর্য এবং একের পর এক জয়।

ঠাকুর তাই সব সময়ে জোর দিয়েছেন, বলেছেন— কঞ্জুসের মতো ইষ্টপ্রাণ হও। ইষ্টপ্রাণতার যেন এক পয়সার খাক্‌তিও না ঘটে। হাড়কিপ্পণ যেমন এক পয়সার জন্যেও জীবনপণ করতে পারে, তেমনি ইষ্টের জন্যে জীবন বাজি রেখে চলো। প্রাণ যাক, তবু ইষ্ট থাক।

সদাচার সম্বন্ধে কথা উঠেছে। ঠাকুর বললেন, তোমরা হয়তো লক্ষ্য করেছো— মেথর অন্যের গু টেনে মরে, তাই বলে যে বেশি পেটের রোগে ভোগে, তা কিন্তু নয়। কিন্তু একজন সদাচারী মানুষ যদি হঠাৎ অসদাচারী হয়ে চলতে থাকে, তাহলে সে হঠাৎই দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়ে। সদাচারী মানুষের প্রতিরোধক্ষমতা তুলনামুলকভাবে অনেক কম হয়ে থাকে। তার অভ্যান্তরীণ ক্ষমতা অন্যের থেকে বেশি হওয়া সত্ত্বেও রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা তার বেশিই থাকে। নির্দিষ্ট একটা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তার বেশি থাকলেও সাধারণভাবে তার চট্‌করে রোগে পড়ার ভয় একটু বেশিই থাকে। আপাত দৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হলেও তাই কিন্তু ঘটে থাকে। যেমন বলা যায়, ধবধবে সাদা কাপড়ে বাজে রকমের দাগটা একটু যেন বেশি করেই চোখে লাগে। যে কাপড়ে অনেক ময়লা লেগেই আছে, সে কাপড় সামান্য দাগের কারণে অত বেশি বিশ্রী দেখায় না।

ভক্তদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে একদিন বললেন, আগের দিনে কিশোরীমোহন, অনন্ত মহারাজ এবং গোসাঁইদার কি তুলনা ছিল? তারা যে কর্মনিষ্ঠায় পাগল হয়ে কী করেছে আর না করেছে, তার ঠিক নেই। এক পণ্ডিত মানুষ বলতে ছিলেন গোসাঁই— অনন্ত আর কিশোরী তো বিদ্যার দিক দিয়ে তেজোয়ান ছিল না। কিন্তু ওদের তুলনা হয় না। ঠাকুর এই তিন জনকে একত্রে বলেছেন— ত্রিরত্ন।

একবার রায়সাহেব পুলিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়মশাই ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'সঠিক উত্তম বিয়ের শর্ত কী? কী রকম বিয়ে আপনি চান?'

উত্তরে ঠাকুর বললেন, 'যে রকম বিবাহের ফলস্বরূপ সমাজে উত্তম সন্তান-সন্ততির আবির্ভাব স্বাভাবিক ও সহজ হয়ে ওঠে, সেই বিয়েকেই সঠিক এবং বিজ্ঞানসম্মত মনে করি। বিয়েটা কোন ছেলেখেল্লা ব্যাপার নয়। একটা উত্তম বিবাহ যেমন পারে সমাজে কার্তিকের মতো দেব-সেনাপতির জন্ম দিতে, তেমনি একটি কুবিবাহের ফসলও পারে কালা-পাহাড়ের মতো উন্মত্ত হয়ে সমাজকে জাহান্নামে পাঠাতে। দুটো জাতকই বিবাহের ফল।'

এক সময়ে পুলিনবাবু প্রশ্ন করলেন, শান্তির পথ কী?

উত্তরে ঠাকুর বললেন, 'শান্তির পথ হলো ইষ্ট বা সদ্‌গুরুতে কঞ্জুষের মতো একরোখা নিষ্ঠা— সর্ব শরীর মন ও অভ্যাস দ্বারা ইষ্টস্বার্থকে নিরন্তর প্রতিষ্ঠা করে চলা। প্রত্যেকটি শ্বাসপ্রশ্বাস যেন ইষ্টস্বার্থে নিযুক্ত থাকে। লিবিডো অর্থাৎ অন্তস্থ মিলন-সম্বেগ অর্থাৎ সুরত সংযোগ যেন থাকে ইষ্টের সেবানুগত্যের মধ্যে। তাহলেই সব স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ঘটে চলতে থাকে। ইষ্টানুগত্যের কসরতটা তখন আর মক্‌সো করে করতে হয় না— তা হয়ে চলে ঐ সুরতসম্বেগ থেকে— আপনা আপনি।'

॥ ছত্রিশ ॥

রায়সাহেব পুলিনবাবু আবার প্রশ্ন করলেন, সদ্‌গুরু বোঝা যাবে কী করে?

উত্তরে ঠাকুর বললেন, টান থাকলে মানুষ যেমনটিই করে, তেমনটি করতে করতে টান হয়। টানের কথা কইতে হয়, করতে হয়, ভাবতে হয়। তাহলে টান না এসে পারে না। আর তাঁর সঙ্গ করা লাগে। সঙ্গাৎ সঞ্জায়াতে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধয়া দৃষ্টিশুদ্ধতা, দৃষ্টিশুদ্ধতা থেকে বিশ্বাস, বিশ্বাস থেকে নির্বিচারতা। নির্বিচার হলে আসে প্রেম। আর প্রেম এলেই চলে আসে আত্মসমর্পণ।

বললেন, প্রভুকে দেখলে নিজের দুর্বলতা ধরা পড়ে। তাঁর প্রতি ভালোবাসা থাকলে নিজেকে শোধরাবার প্রবৃত্তি আসে। বললেন, এই সদ্‌গুরুর প্রতি ভালোবাসা, মূর্ত হওয়া চাই চলনে, চরিত্রে, ভাবে, ভঙ্গিতে, কর্মে, বাক্যে প্রতিটি শ্বাসে-প্রশ্বাসে। সদ্‌গুরুর প্রতি টান ফুটে ওঠা চাই প্রতিটি পদক্ষেপে। সদ্‌গুরুর গন্ধ বেরোবে শিষ্যের গা দিয়ে। তবে বোঝা যাবে ইষ্ট ভক্তের মধ্যে জীবন্ত রয়েছেন— ইষ্ট তাঁর ভিতর জীবন্ত হয়ে তাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন।'

পুলিন বাবুর পুনঃ প্রশ্ন— ভালো বুঝেও তা করা যায় না কেন?

উত্তর দিলেন ঠাকুর— ধরেন আপনি বেশ্যাসক্ত, লুচ্চা, মদ্যপ কিন্তু আপনার উপর অন্য কেউ জোচ্চুরি করে, আপনার সুন্দরী যুবতী স্ত্রীর উপরে লোভ করে তাকে কেউ টেনে নিয়ে যায়— তা কিন্তু আপনি চান না। আর আপনি নিজেও বোঝেন যে, আপনি যা করেন, তা ভালো না। দশজনে মন্দ বলে, তাতেও মনে কত কষ্ট হয়, কিন্তু ঐ মন্দপথ আর ছাড়তে পারেন না— এতখানি অভিভূত আপনি। কিন্তু এ টানটা যদি ওসব থেকে ঘুরিয়ে সদ্‌গুরুতে স্থাপন করতে পারেন, তবেই কিন্তু চলন বদলে যায়। সব চলাটা ধীরে ধীরে ইষ্টমুখী হয়।

বললেন, সেই জন্যেই তো বলি, সাঁতার শিখতে হলে আগে জলে নামা লাগে। দিই শালা ঝাঁপ, যা থাকে কপালে— এইবলে। তখন সাঁতার না শিখে আর যাবেন কোথায়?

বললেন, মনটা তাতে রাখতে হয়। তখন অন্যগুলো ঢিলা মারে।

বললেন, মূলকথা ইষ্ট। তিনি মাথায় ঠিক থাকলে সব ঠিক আছে। তাঁকে চালে, চলনে, আচারে, ব্যবহারে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারলে একেবারে নিশ্চিন্ত। মূল জীবন-সম্বেগটা যদি তাঁর পোষমানা হয়ে যায়, তা'হলে সব অবস্থায় নিশ্চিন্তি। পাঁকে পড়ে গেলেও উদ্ধার পেতে দেরি হয় না। মানুষের জীবনে ইষ্টের অবস্থান এমনই জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ।

কথা বলতে বলতে ঠাকুর বললেন, 'ইষ্টের পথে চলে ইচ্ছে ক'রে জীবনটা উপভোগ করার স্বাধীনতা যখন আমাদের আছে, তখন সে সুযোগ আমরা গ্রহণ করবো না কেন? আমরা তো শেষ পর্যন্ত বাঁচতেই চাই— জীবনটা পুরো মাত্রায় কাজে লাগাতে চাই— উপভোগ করতে চাই। কাজেই যে ভাবে তা হয়, সেটাই আমাদের করণীয় হয়ে ওঠে। আমরা ভগবানের সন্তান— সত্তায় স্বস্থ থেকে যাবতীয় সুভোগের পূর্ণ অধিকার আমাদের জন্মগত। তাই, যা সত্তাসম্বর্ধনার প্রতিকূল, তাকে ত্যাগ করে চলাটা আমাদের স্বাভাবিক প্রবণতা হতে বাধ্য।'

কথা চলাকালে পুলিনবাবু হঠাৎ করে বলে ফেললেন, 'গুরুগিরির তো অনেক খারাপ দিকও আছে।'

ঠাকুর এই মন্তব্য শুনে প্রতিবাদের সুরে বলে উঠলেন, 'আমরা খারাপটা খুব দেখতে পাই— কিন্তু তাদের জন্যে করেছি কিছু? তাদের তো খেতেও দিইনি। এই ধরণটা কি চিরদিন ছিল? গুরু-ব্যক্তিদের মান্য করেই তো আমরা চলেছি। আগেকার সামাজিক শাসন-ব্যবস্থায় কারও পক্ষে বেচাল কিছু করার উপায় ছিল না। আজ শ্রদ্ধা গেছে, সম্ভ্রম গেছে। শ্রদ্ধা থাকলে সম্ভ্রমও ঠিক থাকে । কারও কথা শুনে চলার অভ্যাস থাকলে সমাজের পক্ষে কল্যাণকর আদব-কায়দাগুলো ভেঙ্গে ফেলার প্রবৃত্তি আর কাউকে পেয়ে বসে না। খুঁটি ঠিক আছে তো ঘরও ঠিক আছে।'

আর সকল বর্ণের সকলের কাজ ঠিক করাই থাকতো। বামুন জুতো বানানো শিখে নিয়ে অন্যকে শেখাতেও পারেন, কিন্তু কারও জন্যে জুতো বানিয়ে দিয়ে তিনি পয়সা নিতে পারেন না। কারণ, জুতো বানানোকে তিনি জীবিকা করতে পারেন না। আগের দিনে বৃত্তি-অপহরণ ছিল মহাপাপ। আজ বৈশ্যেরা চামারের কারখানা খুলে চামারের ভাত মারছে, বৈশ্য কর্ম আর করছে না— এই তো অবস্থা। একজন ক্ষত্রিয় বর্ণের লোক অন্য একজন বৈশ্যের বর্ণ হরণ করছে। যার যা ইচ্ছে, সে তাই করছে— সমাজের কোন শাসন নেই, অপরাধীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ নেই! এভাবে সমাজ–শৃঙ্খলা টিকতে পারে না, আর টিকেও নেই। সব ভেঙে-চুরে খানখান হয়ে গেছে। মজার কথা সর্বনাশের এমন রমরমা ভাব দেখেও আমরা বিচলিত হচ্ছি না— ভাবছি বেশভালোই তো আছি! অথচ, এই দেশেই একদিন বৃত্তি-অপহরণ মহা অপরাধ বলে গণ্য হতো। বৃত্তি চোর মহাপাতকী বলে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নিতে বাধ্য থাকতো।

কথার পৃষ্ঠে পুলিনবাবু বললেন, ' আমিও তো ব্রাহ্মণ, কিন্তু সেই বৃত্তিতে পেট ভরে না।'

'ক'ন্ কী? কথা শুনে ঠাকুর চেঁচিয়ে উঠলেন। বামুনের কী বিরাট আয় ছিল— তবে সেটা উঞ্ছবৃত্তি। দক্ষিণা কি মেরে পাওয়া পয়সা।'

ঐ দিনই কথাচ্ছলে বললেন, 'কৃপণের যেমন টাকা পয়সা ধনরত্নের প্রতি লোভ, আমার তেমনি মানুষের প্রতি লোভ। এক-একটা মানুষকে আপন করে পাওয়ার জন্যে প্রাণটা ছটফট করতে থাকে। কারণ, আপন করে না পেলে তো তাকে দিয়ে মঙ্গলের আবাদ করানো যায় না। মানুষের মঙ্গল ছাড়া আমার প্রাণে যেন কিছুতেই শান্তি আসতে চায় না। মানুষ অসুখী থাকলে, দুঃখে কষ্টে থাকলে বেদনা নিয়ে বেঁচে থাকলে আমি খুব কষ্ট পাই। তাই নিজের বেদনা মোচনের জন্যেই ঐ রকম অন্যকে আপন করে পাওয়ার ফন্দিফিকির খুঁজতে থাকি।'

আবার কী খেয়াল হলো, ভক্তদের কাছে বললেন, 'মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ বিভাগ আছে। একটা একটা সাড়া মস্তিষ্কের ঐ কোষগুচ্ছকে এক-এক ভাবে উত্তেজিত ক'রে এক-এক রকম চেতনা সৃষ্টি করে।

আবার এক-এক গ্রহের প্রীতিপ্রদ শব্দ, রং, নাম, গন্ধ ইত্যাদি আছে যা সেই গ্রহের প্রীতি উৎপাদন করে তার-তার কল্যাণ বিচ্ছুরণ আদায় করে নিতে পারে।'

বললেন, 'সৎনাম এবং সদগুরুর সঙ্গে ঐ সত্তা–সংবর্ধক যাবতীয় সরঞ্জাম নিহিত আছে। তাঁর প্রদত্ত নাম জপ এবং তার শ্রীরূপের ধ্যান ভক্তকে তার স্বাভাবিক অধিকারী করে তোলে।'

ঐ আসরে উপস্থিত একটি মা জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, মানুষের আয়ু কি নির্দিষ্ট করা থাকে, না তাকে ইচ্ছামতো বাড়ানো যায়?'

উত্তরে ঠাকুর বললেন, 'হ্যাঁ, কিছুটা বাড়ানো যায়, তবে যত ইচ্ছা বাড়ানো যায় না।'

মা'টির মুখে সত্যবানের নবপরমায়ু লাভ এবং লখিন্দরের পুনর্জীবন-লাভের কথা উঠায় তার জবাবে বললেন, 'তাদের মৃত্যুটা ছিল দুর্ঘটনার ব্যাপার। নির্দিষ্ট আয়ুর অন্তে স্বাভাবিক মৃত্যু ছিল না । তাদের জীবনীশক্তি ঐ পর্যন্ত বাঁধা ছিল; তা নয়। কাজেই সেই মৃত্যুর আগমনকে বানচাল করে দিয়ে তাদের প্রাণ–প্রবাহে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল। এগুলি সবই বিজ্ঞান-বিধানেরই অনুসারী— আজগুবি যাদু নয়।'

আবার বললেন, ' জীবনী শক্তি দুর্বল থাকলে অনেক সময়ে বড় শক বা ধাক্কা সহ্য করতে পারে না—মৃত্যুতেই ঢলে পড়ে। জন্মগত জীবনী-শক্তির উপরে এ-সব অনেকটাই নির্ভর করে।'

কথাচ্ছলে ঠাকুর আরও বললেন,' আমার বলে দেবার তো বিশেষ কিছু বাকি রইলো না। আপনারা কেউ বলতে পারবেন না যে, ঠাকুর এই ব্যাপারে কিছু বলে যাননি। সব যেন অভিধানের মতো সাজানো আছে। কখন কেমন অবস্থায় পড়লে কী করতে হবে, সব গুছিয়ে বলা আছে।'

জুঁই-মা নামক এক মা বললেন, 'গীতাতেও সব-কিছু বলা আছে, মানুষ সে-সব নিয়ে লাভবান হচ্ছে? কিছু ফয়দা তুলছে?'

'বইতে তো কিছু করে না, করে মানুষে। যারা করতে চায়, বই তাদের সাহায্য করে মাত্র।' উত্তরে বললেন ঠাকুর ।

একজন ভক্ত প্রশ্ন করলেন 'ঠাকুর আমার নাকি গ্রহদোষ চলছে, তা, কী করবো?'

উত্তরে ঠাকুর বললেন,'সব গ্রহই তো ভগবানের অধীন। ভগবানের নাম করলে, সব গ্রহই কেটে যাবে।'

আরও বললেন, 'আমার তো বলাই আছে, যজন যাজন ইষ্টভৃতি করলে কাটে মহাভীতি।'

আবার বলি, 'তাঁকে নিয়ে থাকো, গ্রহ তোমার কিছু করতে পারবে না। ঈশ্বরের অনুরাগী হয়ে চললে, তুমি গ্রহের নাগালের বাইরে।'

ঠাকুর এক সময়ে পাঞ্জাধারী ঋত্বিকদের জন্যে সাধারণ বেশ হিসাবে ধুতি, হাফহাতা সাদা পাঞ্জাবি এবং সাদা দোপাট্টা চাদর ব্যবহারের কথা বলেন। সেই সূত্র ধরে যতি যতীন দাস জিজ্ঞেস করলেন, ' আপনি যে সাদা দোপাট্টা চাদরের কথা বলেছেন, সেটা কি শুধু ঋত্বিকদেরই জন্যে?'

উত্তরে বিপ্লবী ঠাকুর বললেন, 'তা, কেন, যার খুশি সেই পরতে পারে।'

একদিন ঋত্বিগাচার্য কৃষ্ণপ্রসন্ন জিজ্ঞেস করলেন, একজন হয়তো সদগুরু পেয়েছে—কিন্তু টান নেই, তাঁর জন্যে করেও না কিছু। আবার আর একজন শুধু মাত্র মাকে ভালোবেসেই অনেক কিছু করছে এবং বড় হয়ে উঠছে। তো, ভালো কোন্‌টা?

'সদ্‌গুরুকে ধরলেই কিছু-না-কিছু হতেই হবে— একটুখানি ছোঁয়াতেই খানিকটা সোনা হয়ে যাবে। ও জিনিস এমনই।'

কৃষ্ণপ্রসন্ন আবার জিজ্ঞেস করলেন, একজন হয়তো সঙ্গ করেছে অনেক বছর, আর চুরি-জোচ্চোরিও করছে— বাইরের একজন সাধারণ মানুষের চেয়েও খারাপ। একে কী বলা যাবে?

'এরই মধ্যে সে যা, অন্যে তা নয়'। আরও বলে চললেন, 'দ্যাখেন না, গিরীশ ঘোষের কেমন টান ছিল রামকৃষ্ণের উপরে। তার অন্তরে বিশ্বাস ছিল— তার নাম একবার করলেই একজনের কৃত পাপের পাহাড় তুলোর মতো উড়ে যাবে। তাঁর নামে এত পাপক্ষয় হয়, যা মানুষ সারা জীবন ধরে করেই উঠতে পারে না।'

আরও বললেন, 'গুরুর কাছে পাওয়া নামের জোরে তুমি রত্নাকর হলেও কালে বাল্মীকি হতে পারবে।' বললেন ইষ্টনিষ্ঠা নিন্দা, তাঁর প্রতি টান, তাঁর নামের প্রতি আসক্তি এমনই চিজ! এর মতো মোক্ষম জিনিস আর নেই।'

ধর্মশব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বললেন, কথাটার উচ্চারণই ধর্‌ম। ধরেই যদি না থাকলো তবে, ঐ কথার অর্থই তো বাতিল। জীবনের সব-কিছুকেই যা ধরে রাখে, সেই কর্মকাণ্ডের সবটাই ধর্ম। মূলকথা হলো, ধরে রাখার ভাবের মধ্যেই ধর্ম। ধরে না রেখে যদি ছেড়ে দিলো, তবে তা আর ধর্ম থাকলো না। ধর্ম খুব বজ্র-আটুনি। এমন কঠিন মরাগিটের ক্রিয়া আর নেই। ধর্ম তাই জীবনের রক্ত-মাংস, ভাব-ভাবনা, ভোগ-উপভোগ সব কিছুর মধ্যে কঠিন ভাবে বসে আছে। ধর্মকে ধরে আছি বলেই আমরা আছি।

ধর্মকে যেমন ধরে রাখি, আমরা তেমন থাকি। ধরে থাকার ভাবটা ঢিলা হয়ে গেলে আমাদের জীবনও কেমন ফেঁসো-ফেঁসো হয়ে যায়। জীবনের আর দানা বাঁধার ভাব থাকে না। যে-জীবনের আঁট নেই, বাঁধন নেই, সেই ফস্‌কা জীবনের আর রইলো কী? তার না আছে স্বাদ, না আছে গন্ধ, না আছে অস্তিত্ব। সে জীবন তখন পচা-পচা ভ্যাপ্‌সা— লোকের পাতে দেওয়ার অযোগ্য।

তাই, ধর্মনীতিকে যেমন ধরে আছো, জীবনকে তেমন স্বাদ্য, ভোগ্য, মধুময় রূপে পাচ্ছো। অন্যথায়, জীবন দুর্বহ-দুঃস্বপ্ন মাত্র।

॥ সাঁইত্রিশ ॥

ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত আমেরিকাবাসী রে আর্চার হাউজারম্যান তাঁরই দেশবাসী ভক্ত আরউইন স্রডারের পাঠানো একখানি চিঠি পড়ে ঠাকুরকে শুনিয়ে একটি সমস্যার সমাধান চাইলেন। তার সমস্যাটি হলো, দূরে বিদেশে থেকে অর্থাৎ তার নিজ দেশে থেকে কি ঠাকুরের নিকটবাসী হওয়ার সুবিধাদি পাওয়া যায়। এই সমস্যার সমাধান করা যায় কি করে?

সবটা শুনে ঠাকুর বললেন, কাছে থাকার সুবিধা তো অনেক আছেই। কিন্তু যেখানে কাছে থাকা যাচ্ছে না, সেখানে মনে-প্রাণে ইষ্টে যুক্ত থাকাটাই বড় কথা। ইষ্ট থেকে বিচ্ছেদ না ঘটে। শিষ্য যদি গুরুর কাছে থাকতে পারে, তবে গুরু তাকে চোখে চোখে রাখার সুবিধাটা পান সব চেয়ে বেশি। তাতে গুরু নিজের গরজে শিষ্যের মঙ্গল সাধনের সুযোগ পান অনেক বেশি। সেটা না ঘটলে শিষ্যকেই সর্বতোভাবে গুরুগত হয়ে থাকতে হবে— তা সে যেখানেই থাকুক না কেন। ইষ্টগত জীবন যাপনই ইষ্টপ্রাণতার মাপকাঠি। এর চেয়ে বড় আর কোন বিধান নেই।

ধ্যান-সম্পর্কে ঠাকুর বলেছেন, নামধ্যানে স্নায়ুতন্ত্র খুব শক্তিশালী হয়। তবে নামধ্যান ধীরে ধীরে বাড়াতে হয়— হঠাৎ করে অতি উচ্চে তুলে দিতে নেই, ওতে স্নায়ুতন্ত্রে অসুবিধা দেখা দিতে পারে। নামধ্যান একটা যোগ-প্রক্রিয়া। এ ক্রিয়া ধীরে ধীরে বাড়াতে হয়।

বলেছেন, নামধ্যানে স্নায়ুতন্ত্র অত্যন্ত সাড়াপ্রবণ ও গ্রহণক্ষম হয়ে ওঠে। নামধ্যান প্রক্রিয়া অতি-সূক্ষ্ম ক্যামেরার মতো কাজ করে। অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জিনিসকে এ ধরে নিতে পারে। নামধ্যান মানুষকে অন্তর থেকে জাগ্রত করে রাখে— মানুষকে গ্রহণক্ষম করে তোলে। বোধ এবং ধৃতিশক্তি বহুগুণ বেড়ে যায়।

ঠাকুর একদিন কথা প্রসঙ্গে তাঁর কলকাতায় থেকে ডাক্তারি পড়ার আমলে প্রচণ্ড আর্থিক কষ্টের কথা এইভাবে বললেন, 'যখন ডাক্তারি পড়তে গিয়ে কলকাতায় গ্রে-স্ট্রীটের এক কয়লার গুদামে থাকতাম, তখনকার অর্থসংকটের কথা বলা যায় না। কত দিন এক পয়সার মুড়ি খেয়ে থেকেছি, আবার কতদিন বা শুধু রাস্তার ধারের কলের জল। খালি পেটে সারা দিন পেট পুরে জল খেয়ে কাটানোর ফলে মাঝে মাঝেই পেটে দুঃসহ বেদনা হতো। ঐ সময়ে

হোমিওপ্যাথিক ওষুধের দোকান লাহিড়ি কোম্পানির জনৈক কর্মচারী আমাকে একখানা মেটেরিয়া মেডিকা এবং এক বাক্স প্রচলিত ওষুধ দিয়েছিলেন— সাহায্য হিসেবে। তাই নিয়ে প্রাকটিস্ করতাম— লোককে ওষুধ দিতাম, তারা ভালো হয়ে যেতো এবং কিছু কিছু পয়সা দিতো। সেই পয়সায় আমিও কিছু কিনে খেতাম এবং অন্যান্য কয়লা-কুলিদের ক্ষুধা নিবারণের জন্যে কিছু দিতাম। তারা সবাই আমার একান্ত আপন হয়ে উঠলো। তারা জীবন দিয়ে আমাকে ভালোবাসতো এবং আমার উপকার করার জন্যে সর্বদাই হাত বাড়িয়ে রাখতো। এই ভাবে গণসংযোগের ফলে একটি সত্য আমার কাছে স্বতঃ-প্রকট হয়ে ধরা দিলো। বুঝতে পারলাম মানুষের জন্যে করলে মানুষ একান্ত আপনজন হয়ে ওঠে এবং তারাই হয়ে ওঠে সেবাকারীর সম্পদ। আর সেবাকারীর আর্থিক সংকটও তার ফলে কিছুটা মোচন হয়। বুঝলাম, মানুষই মানুষের আপন। ওষুধ খেয়ে সুস্থ হয়ে তারা যা দিতো, আমি আবার তাই দিয়েই জামা কাপড় কিনে তাদের কষ্ট নিবারণ করতাম। ফলে, শুধু কয়লা-কুলিরাই নয়, আশপাশের সব দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত লোকই আমাকে ভালোবেসে ফেললো। আমি তাদের দাদা হয়ে উঠলাম। বুঝতে শিখলাম, ভালোবাসার কী অসীম ক্ষমতা—ভালোবাসায় মানুষ কেমন করে আপন হয়ে ওঠে এত সহজেই।

বললেন, আরও বুঝলাম, মানুষকে যদি ভালোবাসা যায় প্রত্যাশাহীন হয়ে স্বতঃদায়িত্বে তাদের সেবা দেওয়া যায়, তাহলে নিজের অভাবও থাকেনা— যারা সেবায় সুস্থ হয়— তুষ্ট হয়, তারাই কিছু দেয়। বুঝলাম, সেবা কত দয়াময় বন্ধু।

ঠাকুর একদিন বিকেলে বড়াল বাংলোর বারান্দায় বসে আছেন। সেখানে হঠাৎ করে এসে পৌঁছলেন বিহার সরকারের সি, আই, ডি অফিসার রায় বাহাদুর রামকেদার সিং। তিনি প্রণাম করে বসার পর জনৈক ভক্ত বললেন, ইনিই রামাশঙ্করের মুক্তির ব্যাপারে সক্রিয় ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। প্রশংসা শুনে সিংজি বললেন, কথাটা ঠিক ঐ রকম না। প্রথম থেকেই আমরা কিছু অফিসার রামাশঙ্করের ব্যাপারে উল্টো মতই পোষণ করতাম। রামাশঙ্কর শতবার তার পক্ষে ওকালতি করলেও কিছু হতো না। কিন্তু দেখলাম, ঠাকুররের দয়ায় সব কিছুই উল্টো পালটা হয়ে গেল—রামাশঙ্কর বেকসুর খালাস হয়ে গেলো।

বিবিধ কথার শেষে সিংজি বললেন, এখানে কোন প্রকার অসুবিধা হলেই সরকারকে তা জানাবেন। আপনাদের উপকার করতে পারলে কৃতার্থ হবেন, এমন কিছু পদস্থ সরকারী অফিসারের নাম-ঠিকানা আমি দিয়ে যাচ্ছি, কোন প্রয়োজন হলেই এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে এখানে বসবাস করতে থাকুন। এটাও আপনাদের দেশ—একে বিদেশ ভাববেন না।

১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার প্রাতঃকালে ঠাকুর উত্তরাস্য হয়ে বড়ালের বারান্দায় ভক্তপোশে উপবিষ্ট। এমন সময়ে ভক্ত ভুবনেশ্বরীমা এসে উপস্থিত, হাতে পাত্রে একটা-কিছু আছে, তাই দেখে ঠাকুর সোল্লাসে জিজ্ঞেস করলেন, কিরে কী মাল আনিছিস্?

'আজ্ঞে আমলকীর মিষ্টি আচার,' উত্তর দিলেন ভুবনেশ্বরী-মা।

'তা, বেশ বেশ, খুব ভালো কাম করিছিস।' এদের সবার হাতে দে একটু একটু করে। সবাই খেয়ে দেখুক কেমন হয়েছে। সবাই হাত ধুয়ে আচার গ্রহণ করে খেলেন। ঠাকুর সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন, তা কেমন হয়েছে আচার?'

সবারই উত্তর—'অতি সুন্দর!'

ঠাকুর তখন ভুবনেশ্বরীকে আদেশ করলেন, 'যা নিয়ে গিয়ে বড় বউয়ের হাতে দে।'

বড়বউ অর্থে হেঁসেলের কর্ত্রী শ্রীশ্রীঠাকুরের পত্নী সরসীবালা দেবী।

সরসীবালার মতো গৃহিণী বড় একটা দেখা যায় না। ঠাকুর নিজেই বলেছেন, বড়বউ যেন রামকেষ্ট ঠাকুরের আমালেও ছিল—দুজনার মধ্যে ভারি মিল। এরা মহিলা-রত্ন সংসারজননী।

অন্নপূর্ণা নাম্নী একজন মা হঠাৎ বললেন, আমার খুব ইচ্ছে করে নিজেদের মধ্যে পরস্পর মেলামেশা যাতায়াত, আদানপ্রদান খুব ভালোভাবে চালু হয়ে মায়েদের মধ্যে একটা স্নেহ-সহানুভূতির সম্পর্ক গড়ে উঠুক। সেটা বড় উপভোগ্য হবে। আপনি যদি বলেন।

ঠাকুর বললেন, 'সে তো খুবই ভালো কথা। প্রীতিবন্ধনে যতোই দানা বেঁধে ওঠা যায়, ততই তো মঙ্গল। প্রীতি-সম্বেগের মতো আর জিনিস কী আছে?'

কথাপ্রসঙ্গে আরও বললেন, 'এখন আর কী দেখতিছো? আগের দিনে কত বিরাট পরিবার ছিল, ভাবলেই তাক্ লেগে যায়। একশো, দেড়শো লোকের একান্নবর্তী পরিবার আমি দেখেছি। পরিবারের কর্তাকে কেন্দ্র করে সবাই কেমন সংহত হয়ে একত্র থাকতো— সকলেই যেন সকলের জন্যে, কেমন একটা এক-গাট্টা ভাব—একবোরে জম-জমাট। সকলের মধ্যে দানা বেঁধেছে অন্তহীন প্রাণঢালা দরদ এবং মমতা। পরস্পরের সুখশান্তি ও সংসারের উন্নতির জন্যে সকলেই প্রাণের আবেগে কর্ম করতো। আর পরিবারের কর্তাব্যক্তি যার যা প্রয়োজন তার সুষ্ঠু যোগান দিতেন, যাতে প্রত্যেকে তার স্ববৈশিষ্ট্যে ফুটে উঠতে পারে— সার্থক হতে পারে। এই ব্যবস্থাকে বলতে পারো— ভারতের সাম্যবাদ। ঐ কথার জের টেনে ঠাকুর বললেন, শুনেছি দক্ষিণা সেনগুপ্তদের দেশে ঐ রকম একটি বিশাল যৌথান্ন-পরিবার এখনও আছে— বহাল তবিয়তেই আছে।'

প্রসঙ্গতঃ দিনলিপিকার প্রফুল্ল-দাস-দা বললেন, সৎসঙ্গীরা আপনার বাঞ্ছাপূরণে যথাসাধ্য তৎপরই থাকেন, অথচ সেই উপকরণ নিয়ে যথাকর্মে যথা সময়ে হাজির না হওয়ায় আপনার অনেক চিন্তাই আর বাস্তবায়িত হয় না। ভাবি এর জন্যে দায়ী কে? এমনটা তো নাও হতে পারতো।

উত্তরে ঠাকুর বললেন, 'দায়ী আমরা প্রত্যেকেই।' আরও বললেন, 'আমাদের আকুতি নেই। মুষ্টিমেয় সৎসঙ্গী আছে। তারা খুব করে। তারাই সব কাজ বারবার করে। মায়েদের মধ্যেও এই রকম কর্মী আছে। তারা ইষ্টের জন্যে সব-কিছু করতে পারে।'

ঠাকুর বলে চললেন, 'কথা কী জানো? আমরাই তো সৎসঙ্গীদের মধ্যে সবাইকে অমন ইষ্টচেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারিনি, তার জন্যে মনের মতো ফলও লাভ করতে পারছি না। তোমরা আমার ইচ্ছে মতো সব কাজের দায়িত্ব মাথায় নিয়ে তা যদি তড়িঘড়ি করে কর্মে রূপান্তরিত করতে পারতে, তাহলে নিশ্চয় দেশের চেহারাটা অন্যরকমই হতে পারতো।'

আরও বললেন, 'ইষ্টের জন্যে দেহ-মন-প্রাণ সব-কিছু ঢেলে দিতে পারলে তাঁর কাজ তিনিই করিয়ে নেন। মুশকিল হল ইষ্টের চেয়ে অন্য ধান্ধা প্রবল হয়ে উঠলে— তখন কার্যক্রমটাই পণ্ড হয়। তাই তো বলা হয়েছে— 'ইষ্টের চেয়ে থাকলে আপন,— ছিন্ন-ভিন্ন তার জীবন।' ইষ্ট নিষ্ঠাই তাই প্রধান কথা।

বললেন, 'বিপদটা আসে কোন্ পথ দিয়ে, জানো?'

'যখন ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার ধান্ধাবুদ্ধি এমন-ভাবে পেয়ে বসে না, যার ফলে অন্য সব প্রয়োজন বোধকে উপেক্ষা করা যায়, তখনই এই ভণ্ডুলদশা এসে ঘাড় চেপে ধরে।'

বললেন, মনে রাখা ভালো, ইষ্টনেশাই হলো প্রধান হাতিয়ার। ইষ্ট ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে মন জড়িয়ে পড়লেই ইষ্টকর্মটা পণ্ড হতে থাকলো। নানা জন নানা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে। কেউ বা বিয়ে, বউ-সংসার নিয়ে জড়িয়ে পড়ে, কেউ বিষয়-সম্পত্তি বা ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে নাজেহাল হতে থাকে— ইষ্টকর্ম করার ফুরসত আর হয় না।

সাধক-ভক্ত প্রফুল্লকুমার দাস এই অন্যমনস্ক জীবনের কথা মাথায় রেখে বললেন, কিছু মানুষকে যদি বিয়ে-থাওয়া না করিয়ে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত করে ইষ্টকর্মের সর্বকালীন কর্মী করে নিতেন, তাহলে, মনে হয় সুবিধা হতো।

উত্তরে ঠাকুর বললেন, সন্ন্যাসী মানে সম্যক্ ন্যস্ত—ইষ্টের সঙ্গে সর্বান্তঃকরণে যুক্ত—ইষ্টের সদাকর্মী। গৃহে থেকেও সন্ন্যাসী হয়ে কাজ করা যায়—সেই সন্ন্যাসই আসল সন্ন্যাস—সে সমাজ থেকে-সংসারীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হলো না। আমি এই রকম সন্ন্যাসীই চেয়েছিলাম— গৃহবিমুখ সন্ন্যাসী আমি চাই নি। তাতে গৃহস্থদের ক্ষতি হতো—সন্ন্যাসীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হতো।

বললেন, 'পরমপিতার দয়ায় তোমরা যে জিনিস পেয়েছো, তার তুলনা হয় না। দয়াল শতহস্তে তোমাদের আগলে রাখছেন, রক্ষা করছেন। তোমাদের কাজ হলো সবাইকে এই মহামঙ্গলের অধিকারী করে তোলা। তাই বলি অনন্যমনা, অনন্যকর্মা হয়ে পরমপিতাকে পরিবেশন করো—তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছা দিকে দিকে মূর্ত করে তোলো। মমত্বহীন ও শোকশূন্য হয়ে যুদ্ধ করো। লেগে দ্যাখো, ফল কী হয়।'

'পরমেশ্বরের জন্য কর্ম করছি, এই বুদ্ধি নিয়ে আমাতে সর্বকর্ম ন্যস্ত করে ফলাতিসন্ধিরহিত মমত্বহীন ও অ-শোক হয়ে আমার কারণে যুদ্ধ করো —দ্যাখো কী হয়, করেই দ্যাখো!'

'ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।

নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥'

দয়ালবাগের একজন সৎসঙ্গী জিজ্ঞেস করেন, 'সন্ত সদ্‌গুরু কি একসঙ্গে একাধিক থাকেন?'

ঠাকুরের উত্তর , 'তাঁরা যতজনই থাকুন, তাঁরা বহু নন। তাঁরা এক-জনই। তাঁদের মধ্যে কখনো বিরোধ বা অসঙ্গতি বলে কিছু থাকতে পারে না। তাঁরা এক কথাই কন।'

উক্ত সৎসঙ্গী—কিন্তু এখন তো কত জায়গায় রকমারি আছে।

ঠাকুর—'তবে আসলের সঙ্গে যেখানে ভেদ আছে, সেখানে গলতি আছে, বুঝতে হবে।'

একজনার কথা—'মহারাজ সাহেব লিখেছেন, তিনি বাংলায় আসবেন।'

ঠাকুর উত্তর—আমি ও-সব বাংলা-বিহার বুঝি না। আমি বুঝি, তিনি বাংলাতেই আসুন, মাদ্রাজেই আসুন, পাঞ্জাবেই আসুন, তাতে আসে যায় না। তিনি যেখানেই আসুন, সাচ্চা ভক্ত-মানুষ তাঁকে চিনিয়ে দেবে।

এক সময়ে সেকালের গুরুভাই বর্দ্ধমানের জমিদার যামিনী সিংহরায় জিজ্ঞাসা করেন,'ভক্তি না জ্ঞান—কোনটা বড়?'

ঠাকুর— 'ভক্তি থাকলে জ্ঞান আপনি আসে। ভক্তি বাদ দিয়ে প্রকৃত জ্ঞান হয় না।'

এক মহিলাভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন— শব্দ মিলনা কঠিন নেহি হ্যায়, গুরু মিলনা কঠিন হ্যায়। এর মানে কী।

ঠাকুর—'গুরু মিললে তাঁর প্রতি টান নিয়ে সাধনা করলে শব্দ আপনিই আসে। আর মিলনা মানে গুরুর প্রতি প্রেম হওয়া। গুরুপ্রেমই মোদ্দা কথা।'

একদিন বললেন, 'আমার মনে হয় প্রত্যেকটা মানুষই এক-একটা ভাবতরঙ্গ বা বীজ বিশেষ। অর্থাৎ, বিশেষ বৈশিষ্ট্যওয়ালা একটা তরঙ্গ। দুটো জিনিস তাই কখনো একরকম হয় না।'

একদিন ঠাকুর বললেন, 'বিদ্যা পড়ায় নেই— করায় আছে। করার মধ্য দিয়ে কোহিনুর গুলি তোলে। সব শাস্ত্রই তাই।' বললেন, 'আমার বিদ্যাবুদ্ধি নেই। আমার হচ্ছে করা, কুড়নো আর পাওয়া।'

আত্মসমর্পণ কথাটার মানে কী— এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আত্মসমর্পণ মানে, আমার যা-কিছু তার সবটার উপরে গুরুকে রাখা। তাঁর ইচ্ছাগুলি পূরণ করা। গুরুতে যদি শ্রদ্ধা না থাকে, তবে তাঁতে আত্মসমর্পণ করতে পারবো না। ইষ্টের উপর টান থাকলে মানুষ তাঁকে নিয়েই মত্ত থাকে। এ ভালোবাসা কোন মতলব নিয়ে নয়। তাঁর সঙ্গে যোগ থাকলে মানুষের কষ্ট-যন্ত্রণাগুলি ভোঁতা হয়ে যায়।'

একদিন বললেন, 'মৃত্যু মানে সব-কিছুর শেষ নয়। মৃত্যু একটা রোগ। তা থেকে মানুষকে সারিয়ে তোলা যায়। 'আবার একদিন বললেন, 'একজনের দুর্বল সদ্‌গুণ অপরের প্রবল অবগুণের চাপে ম্লান হয়ে যেতে পারে।'

একদিন কথাপ্রসঙ্গে হাউজারম্যানকে বললেন, 'একজনের স্বাভাবিক চরিত্র কেমন সেটা বোঝা যায়, বাড়িতে সে বাপ-মা-ছোট ভাই বোন, চাকর–বাকরের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করে ইত্যাদি দেখে।'

একদিন প্রশ্ন করা হলো—অন্যের শ্রদ্ধা অর্জন করা যায় কী ভাবে? উত্তর হলো- 'তুমি যদি ইষ্টের হও, তোমার চাওয়াটাও ইষ্টের হবে। কায়মনোবাক্যে তাই, তাঁর হয়ে ওঠাই আসল কাজ।'

একজনকে বললেন, 'কোন মানুষকে বাতিল করে দেওয়া ভালো নয়। তাকে সংশোধন করার চেষ্টা করতে হয়।'

কথাচ্ছলে একদিন বললেন— 'যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরপর জয় হচ্ছে দেখে অর্জুনের মনে একটু আত্ম-অহংকার এসেছে, শ্রীকৃষ্ণ সেটা বুঝলেন। আর তাই বুঝে অর্জুনের উপর যুদ্ধের ভার দিয়ে স্বয়ং দ্বারকায় গেলেন। এদিকে অর্জুন একলা যুদ্ধে নেমে পদেপদে বিধ্বস্ত হতে লাগলো। তখন আর দর্পচূর্ণ হলো। তখন বুঝলো কৃষ্ণ ছাড়া সে কত অসহায়।

একদিন ঠাকুর বললেন, 'জীবনের খুঁটি হলো ইষ্ট। খুঁটির সঙ্গে বাঁধনটা যদি ঠিক থাকে তবে শক্ত করে খুঁটি ধরে জলকে বশ করে তাকে উপভোগ করা যায়। তখন এই বোধ থাকে যে, আর ডুবে মরার ভয় নেই। এবার জলকেলিতে কী মজা।'

একদিন ঠাকুর জনৈক কর্মীকে যতি-আশ্রমে এসে থাকতে বললেন।

উত্তরে কর্মীটি বললে, তা, আপনি বললে থাকবো।

'সে আবার কেমন কথা?' ঠাকুর বললেন, 'না বলতে আসাই তো উচিত ছিল।' এই হলেন ঠাকুর।

একদিন দেখলেন, কে একজন যতি আশ্রমে একটি কোলবালিশ নিয়ে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি গুরু ব্যাপারটা ধরে ফেললেন— বললেন, এটি এলো কি করে— কে আনলে? যে এনেছিলো, সে উত্তর দিলে, আজ্ঞে, মা ঐ টি নিয়ে আসতে বলেন বলেই ওটা আনা হয়েছে।' ঠাকুর মনোভাবে দৃঢ় থেকেই বললেন, 'ভাগ্যিস মা বলেছে—বেঁচে গেলে। অন্য কারও পছন্দ নিয়ে যতি আশ্রমের আশ্রমিক হওয়া যায় না। এই তোমাদের শিক্ষাকেন্দ্র। এর উদ্দেশ্য ভুলবে না।'

একদিন প্রশ্ন হলো, পরমায়ু কি বাড়ানো যায়?

ঠাকুরের উত্তর হলো, দীর্ঘ করা চলে, কিন্তু অনন্তকাল বাড়ানো যায় না।

একদিন ঠাকুর তাঁর অনুলেখককে জিজ্ঞস করলেন, যে বাণীগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তা বই আকারে বেরোলে মানুষের সুবিধা হবে তো?

'হ্যাঁ কোন অবস্থায় কী করতে হবে 'তা সব আছে। একখানা অভিধানের মতো হয়েছে।'

'বইতে তো কিছু করে না, মানুষে করে। বই সাহায্য করে মাত্র।'

একদিন প্রশ্ন উঠলো— 'দেড়পাট্টা সাদা চাদর কি শুধু ঋত্বিকদের জন্যে?'

উত্তরে ঠাকুর বললেন— তা কেন, যার খুশি সেই পরতে পারে।'

একদিন শিষ্যদের লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমাদের এমন ভাবে ঠিক হওয়া চাই যাতে তোমরা ক'জনই ভারতের সর্ববিধ সমস্যার সমাধানের পক্ষে যথেষ্ট। তোমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে—ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠা। তাঁর জন্যেই তোমাদের থাকা, করা, বাঁচা।'

উপদেশচ্ছলে বললেন, 'কীর্তনের পর ধ্যান না করলে কাজ হয় না। ধ্যানের দিকে মানোযোগী থাকতে হবে।'

সৎসঙ্গ সম্পর্কে কোন ব্যক্তির সন্দেহমোচনের জন্যে বললেন, 'সৎসঙ্গের কেউ ক্ষতি করতে পারবে না— জগন্নাথের এই রথ চলবেই। ইচ্ছে করলে আমিই পরবো না এর গতি রোধ করতে— অন্যে পরে কা-কথা।'

॥ ঊনচল্লিশ ॥

১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের সাতাশে মার্চ, রবিবার। বড়াল বাংলোর ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুর মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর বিশ্রামরত। পুত্রবধূর মৃত্যু-শোকে কালীষষ্ঠীমা মর্মাহত।

সেই দৃশ্য দেখে ঠাকুর বললেন, 'যখন আমি কিছু বলি তখন কেউ আমার কথা শোনে না— পরে পস্তায়।'

এই প্রসঙ্গে যতি যতীন দাস প্রশ্ন করলেন, যতিদের চলন কেমন হবে?

'আমি যা বলেছি তার ঝলক যেন আপনাদের মধ্যে পাওয়া যায়। আপনাদের দেখেই যেন মানুষ কয়—এমন মানুষ দেখিনি—এক্কেবারে স্বর্গের জিনিস।'

প্রশ্ন হলো— আমাদের বেশ কেমন হবে?

সহজ, সুন্দর, পবিত্র।

ঠাকুর বললেন, 'শোনা যায়, হনুমানের নাকি রামচন্দ্রের প্রশাসনে মন্ত্রী হবার শখ ছিল, কিন্তু পরে রামচন্দ্রই প্রধান হয়ে উঠলেন—মন্ত্রিত্বের কথা চুলোয় গেল।'

ভক্তদের প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে বললেন, 'আমি আপনাদের মালগাড়ি বানাতে চাইনি—আমি করতে চেয়েছি ইঞ্জিন। নিজেরাও চলতে পারবেন, আবার অন্যকেও চালাতে পারবেন। পাঁচজনকে পরিচালনা করাই হবে আপনাদের ইষ্টকর্ম।'

বললেন, আবার দেখি তোমরা অনেকে আমার মেকদারের প্রশংসা করো, তাতে কিছু হবে না। আমাকে দেখে আমার মতো কিছুটা হলে, বুঝবো— অনেকখানি হচ্ছে।

রাত্রে যতি-আশ্রমে বসে যতিদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'অকারণ কিছু করা তোমাদের সাজে না, কোথাও গেলে, গল্পসল্প করলে—কথা বলতে বলতে চা-টা খেলে, তারপর এক সময়ে উঠে আসলে। তা ঠিক হয় না। তোমাদের একটা ঘন্টাও যেন অনর্থক না কাটে। তোমরা সর্বক্ষণের ইষ্টকর্মী— এইটে মনে রাখা চাই। আর নামধ্যান তো করতেই হবে— তোমরা যে-ঘরে বসে করবে তার সব কিছু নামে চার্জড় হয়ে থাকা চাই। তোমাদের কারও বিছানায় বসলেও যেন সেই নামের ধাক্কা টের পাওয়া যায়।

ঠাকুর একদিন কাশীশ্বর রায়চৌধুরীকে বললেন মঙ্গলামাকে দশটা টাকা এনে দে। কাশীদা দশটাকা এনে দিলে জিজ্ঞেস করলেন, কোত্থেকে আনলি?

কাশীদা বললেন, একটা তহবিল থেকে নিয়ে এলাম, পরে ওটা পুরিয়ে রাখবো।

'তাহলে আর হলো না—ও-টাকা কাজে লাগলো না।' সব বুঝে কাশীদা আবার তৎক্ষণাৎ চলে গেলেন টাকা জোগাড় করতে।

১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ বৃহস্পতিবার। প্রাতঃকালে ঠাকুর বসে আছেন যতি-আশ্রমের বারান্দায়। ঠাকুর যতিদের জিজ্ঞেস করলেন নাম চলছে তো মনে মনে?

কেউ কেউ বললেন, হচ্ছে, তবে মাঝে মাঝে কেটে যায়।

উত্তরে ঠাকুর বললেন, 'খুব করে অভ্যাস করতে হবে। নাম করলে শরীরে একটা দীপ্তি আসে, চোখ যেন সার্চলাইটের মতো হয়— আর মানুষ তা দেখে আকৃষ্ট হয়।' বললেন, 'তাই নিজের দোষ রাখতে নেই— একটু দেখলেই শুধরে নিতে হয়।'

বললেন, 'নামের গুণ আছেই। চোখ দিয়ে পর্যন্ত সরষের ফুলের মতো ঝরে পড়ে। অনন্ত মহারাজের স্পর্শে অন্য লোকের ঐ রকম হতো। নামের ছোঁয়া দারুণ জিনিস—ও স্বয়ং বিদ্যুৎ।'

যতিদের বললেন, 'ভালো মুনি না হলে ভালো কবি হওয়া যায় না। আবার মুনি আর ঋষিতে তফাৎ এই যে, মুনি মনন নিয়ে থাকেন আর ঋষি করার মধ্য দিয়ে জানেন।'

আবার বললেন, 'অজানাকে জানার আগ্রহ থেকেই মানুষ বিবর্তিত হয়ে চলে।'

নাম করা সম্বন্ধে বললেন, 'নাম যেন সর্বক্ষণ চলে। ঘুম থেকে উঠলেও যেন বোঝা যায় নাম চলছিলই।'

স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, সদগুরু প্রদত্ত নামই সৎনাম। সৎনামের মধ্যে থাকে আদিস্পন্দনের মরকোচ। নাম এবং নামী তাই এক।

আমার এক বুদ্ধি—তিনি দয়া করলেও আমি তাঁকে চাই, তিনি দয়া না করলেও আমি তাঁকে চাই। আবার আমি যদি না চাই তবে তিনি দয়া করলেও তা আমার বোধগম্য হবে না।

ভক্তদের স্পষ্টভাষায় বলে দিলেন, 'মনে রাখতে হবে, আমরা এখানে এসেছি বৃত্তিগুলি পোষার জন্য নয়, এসেছি সেগুলির নিয়ন্ত্রণ ও সংশোধন করতে। নিজে শায়েস্তা হলে সেই সঙ্গে নিজের ও অন্য দশজনের মঙ্গল হতে পারে।

আবেগভরা কণ্ঠে বললেন, 'পৃথিবীর কোটি কোটি লোকের মধ্যে তোমরা কেন এখানে এসে জুটলে? তোমরা কয়েক জন যতি হিসাবেই বা কেন এখানে একত্র আছ? সবটার পিছনেই একটা কারণ আছে। পরস্পর পরস্পরকে ভালোবেসে পৃথিবীর চোহারাটাই পালটে দিতে হবে তোমাদের। হাতে কলমে করার সঙ্গে সঙ্গে নামধ্যানও করা চাই খুব।'

একদিন দিনলিপিকার প্রফুল্লকুমার দাশের এক প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'জন্মরাহিত্য তো তোমাদের আছেই। অপরা প্রকৃতির পারে গেলে তখন জন্মেও আর জন্ম হয় না— জন্মরাহিত্যই এসে গেল।'

সৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা উঠলে বললেন, সৃষ্টি হয়ে থাকো বা নাই থাকো, আমি তোমারই আছি—এ সিদ্ধান্ত যেন না টুটে।

বললেন, 'তখন তুমি জন্মমৃত্যুর পারে চলে যাও। তখন তোমার যাতায়াত পরমপুরুষের কাজের জন্যে তাঁর আবির্ভাবে যার-যার প্রয়োজন, সে-সে তখন তাঁর সঙ্গে এসেই পড়বে। আবার কারও দরকার না হলে তাকে নাও আনতে পারেন।'

শরৎ হালদার মশাই বললেন, তিনি আর আমি যখন, তখন দুনিয়ার পারিপার্শ্বিক নিয়ে এত ভাবনা চিন্তা আসে কিসে?

ঠাকুরের উত্তর ঃ পারিপার্শ্বিকের মধ্যেও তিনি, আমার মধ্যেও তিনি। পারিপার্শ্বিককে বাদ দিয়ে আমার আমিত্বও জাগে না, অস্বিস্তও টেকে না— কর্মদক্ষতা, জ্ঞান ও বিবিধ শক্তির বিকাশও ঘটে না।

বললেন, 'কিন্তু তাঁতে যুক্ত না হয়ে শুধু পারিপার্শ্বিক নিয়ে থাকতে গেলে আমার ব্যক্তিত্ব ছিন্নভিন্ন টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে— ভিতরের নানা প্রবৃত্তি ও বাইরের নানা আকর্ষণের সংঘাতে পড়ে। সবটাই অনর্থের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। ভগবানের জন্য যা নয় তাই ব্যর্থ—শুধু ব্যর্থ নয়, দুর্ভোগ ও বন্ধনেরও কারণ।'

ভক্তসঙ্গ-সম্বন্ধ নিয়ে কথা উঠেছে।

ঠাকুর বললেন, 'প্রকৃত ভক্ত ভগবান ছাড়া আর কিছু চায় না—আর কিছু বোঝেও না।'

আরও বললেন, 'আমরা যাই পাই না কেন, তিনি ছাড়া আমাদের বুক ভরে না। মানে ভরবার নয়— তাই ভরে না। ভক্ত তার ইষ্টের মধ্যেই সব-কিছু পায়। তিনিই যে সারাৎসার, এই সারতত্ত্ব বুঝে নিয়ে সে সব তত্ত্বকে বুঝে ফেলে। আর তিনি কী করেন? তিনি দুবাহু বাড়িয়ে সবাইকে বুকে টেনে নিতে প্রস্তুত হয়ে থাকেন।'

দিনলিপিকার প্রফুল্ল দাস নিজের সম্বন্ধে বললেন, ছেলেবেলা থেকে যেটুকু সাধুসঙ্গ পেয়েছি তাতে করে মনে হয়েছে, আমার তো এমন বদ্ধ জীবন-যাপন করা সম্ভব নয়। তবে তা হলো কেন?'

ঠাকুর বললেন, 'ও সব বিচার করবে কে? যেমন চেয়েছো, তেমনই করেছো। পছন্দের বাইরে কি যাওয়া যায়?'

এখন কত দিনে তাঁর মতো করে চলাটা স্বভাবে আসবে—সেইটাই ভাবনার— বললেন প্রফুল্ল দাস।

'যার চলার তোড় যেমন তার সমস্ত তেমনি লাগে।' উত্তর হলো ঠাকুরের।

তবে কৃপাও তো চাই। ম্লান প্রশ্ন প্রফুল্লচন্দ্রের।

'তাঁর কৃপা আছেই। তাঁর কৃপার হাওয়ায় দুনিয়া ভেসে যাচ্ছে—আর তুমি ধরতে পারছো না।'

কথা উঠলো— 'সব সময় নাম করার সুবিধা কী?'

'নামও করতে হবে, কামও করতে হবে।'

শরৎ হালদার প্রশ্ন করলেন, এখন আপনি এখানে আছেন— দেখছি, ঠিক এই সময়েই কি আপনি বহুদূরে কোথাও উপস্থিত থাকতে পারেন— যাতে সেখানকার লোক আপনাকে এই রকমই দেখতে পারে?

উত্তরে ঠাকুর বললেন, মানুষের একটা পাঞ্চভৌতিক দেহ এবং একটা মানসিক দেহ থাকে। আমি এখানে এই রকম থেকেও হয়তো বার্মায় চলে গেলাম— সেখানকার লোকে আমাকে অবিকল এই রকমই দেখবে। যারা আমার সঙ্গে একতানযুক্ত তারা সব জায়গা থেকেই আমাকে সমান দেখবে। কিন্তু যারা প্রবৃত্তি-অভিভূত তারা দেখতে পারবে না।

অন্য একটি প্রশ্নঃ ঋত্বিকে যখন দীক্ষা দেয়, তখন সেখানে আপনি উপস্থিত থাকেন কি?

'ঋত্বিকের অন্তঃকরণে যদি উপস্থিত থাকি, তবে বাস্তব ক্ষেত্রে থাকি। অন্তর থেকে আমি আলাদা নই।'

এর ঠিক পরের দিনের ঘটনা। ঠাকুর যতি-আশ্রমের বারান্দায় মটিতে পাতা বিছানায় বসে যতিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে হাউজারম্যান, হেনরি প্রভৃতি ভক্তরাও আছেন। সকলেই ঠাকুরের তৎকালীন তন্ময় ভাব মূর্তি-দর্শনে ইষ্টময় হয়ে জ্বলজ্বল করছেন। মনোভাব বুঝে ননী চক্রবর্তী ঠাকুরের শ্রীহস্তে জলের ঘটি এগিয়ে ধরলেন, ঠাকুর আনমনে জলপান করলেন খানিকটা—তখন যেন সবাই অন্যলোকে।

ঠাকুর নিজেই যে একটা বিশেষ অন্তর্লোকবাহী, সেটা স্বতঃই প্রকট হয়ে দর্শনযোগ্য হয়ে উঠলো। সেদিন সবকিছুর মধ্যেই ঠাকুর এবং ঠাকুরের মধ্যেও ঢুকে আছে সব-কিছু— এই বোধ যেন দৃশ্যতঃ অনুভবযোগ্য হয়ে উঠলো সবার কাছে। ঠাকুরের ইচ্ছাতেই এমন হওয়া সম্ভব এবং তাই হয়েছিল সেদিন— সব কিছুকেই ঠাকুরময় অনুভব করতে পেরেছিলেন সেদিন ঠাকুর সান্নিধ্যে উপস্থিত ভক্তগণ।

॥ চল্লিশ ॥

সেদিন ১৯৪৯ সালের ৯ই এপ্রিল শনিবার।

ঠাকুর রহস্য-পূর্বক সেদিন কাশীশ্বর রায়চৌধুরী, প্রবোধমিত্র, শৈলেন ভট্টাচার্য প্রভৃতি ভক্তদের জিজ্ঞেস করলেন, বিয়ে করা সম্পর্কে তোদের কার কী মত— বলতো?'

ঠাকুরের আদেশ মতো ওরা নিজনিজ চিন্তা-ভাবনার কথা নিবেদন করলেন। ওঁদের মন্তব্য হলো, ঘরে-ঘরে বিবাহ উত্তর পারিবারিক চিত্র যেমন দেখা যায় তাতে মনে মনে সবারই যথেষ্ট অনাগ্রহই ছিল।

ঠাকুর এই কথা শুনে বললেন 'এ তো হলো একপেশে ভাবনা। এটা বিবেচনা সম্মত কথা হলো না। আমি বলেছি, সত্য-নির্ধারণ করতে—ভোট নিতে বলিনি। জনমতে প্রভাবিত হতে বলিনি। তোমরা পাইকারি ভাবে জনমতের ছবি তুলে ধরলে।

এই সব কথা চলছে, এমন সময়ে বর্ধমানের জমিদার শ্রীযুক্তযামিনী সিংহ মহাশয় এলেন ঠাকুর দর্শন করতে। তাঁকে বসতে দেওয়া হলে তিনি জিজ্ঞাসু হয়ে বললেন, ধর্ম জিনিসটা কী? শব্দটা তো খুবই শোনা যায়।

উত্তরে ঠাকুর বললেন, 'ধর্ম মানে সেই চলনে চলা যাতে সপরিবেশ বাঁচাবাড়া সুনিশ্চিত হয়—ধর্ম একা চলার জিনিস নয়।'

জমিদার মশাই পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা নামের কথা তো খুব শোনা যায়, তা নাম করলেই কি মানুষ উদ্ধার হয়?'

উত্তরে ঠাকুর বললেন, 'কোটি জন্ম করে যদি নামসংকীর্তন, তথাপি না পায় সে ব্রজেন্দ্রনন্দন। আবার বলা হয়—একবার হরিনামে যতপাপ হরে জীবের সাধ্য নাহি তত পাপ করে'।

আসল কথাটা হলো নাম তো চাইই—কিন্তু নামটা করতে হবে গভীর অনুরাগ নিয়ে। ইষ্টছাড়া আমার আর দ্বিতীয় কেউ পরিচালক থাকবে না। উনিই হবেন আমার জীবনের কেন্দ্রবিন্দু বা মূল খুঁটি। আবার নামের সঙ্গে চাই ইষ্টের প্রতি তৎপরিপোষণী চলনা। ধর্মের মধ্যে আছে ধৃতি। ইষ্টপোষণই সেই ধৃতি জীবনের মূল কীলদণ্ড।'

আবার বললেন আমার কিছু কথা তো তোমাদের চরিত্রগত হয়েই গেছে—যতিদের উদ্দেশ্য করেই কথাগুলো বললেন। আমি বলেছি, গায়ে গা ঠেকিয়ে পাশে বসে খেও না— তা তোমরা করো না। বলেছি, সব-কিছু ঘটার কারণ অনুসন্ধান করে দেখতে— লক্ষ্য করেছি, তা তোমরা করো। এইসবই তো ইষ্টনির্দেশ পালন। কিছু কিছু তো হচ্ছে!

এরপর একবার তামাক খেয়ে নিয়ে যতিদের উদ্দেশ্যে আবার বললেন, 'মেয়েদের সম্পর্কে খুব হুশিয়ার থাকবে। তোমাদের কারও আর আরামের জন্যে বাড়ি থেকে বউ বেশ আরামদায়ক পাশ-বালিশ পাঠিয়েছে আর তুমি সেই পাশ-বালিশের মাধ্যমে পত্নী-স্মৃতি ভোগ বুকে নিয়ে পাশ-বালিশ জড়িয়ে ধরে যতি-আশ্রমে রাত কাটালে সেটা কিন্তু তোমার যতি-আশ্রমে রাত কাটানো হলো না। এখানে থেকে গুরু দেবের সঙ্গে ছল করতে যেও না— তার তুল্য অপরাধ আর নেই। তোমাদের এখানে থাকা কেন? না, তাঁর পছন্দ মতো মানুষ হয়ে ওঠার জন্য। যতি–আশ্রম লক্ষ্মগণ্ডি। তাঁর লক্ষ্মণগত দেওয়া এলাকা। এ তাঁর চোখের পাতা দিয়ে ঢাকা— এখানে থেকে তোমরা ইষ্টদেবের পূর্ণদৃষ্টির আওতায় আবদ্ধ।'

কম কথা আর বেশি কথা বলা নিয়ে কথা উঠেছে। ঠাকুর বললেন, 'এ সম্বন্ধে তো বলেই দিয়েছি। অপ্রয়োজনীয় কথাই বেশি কথার মধ্যে পড়ে। কম কথার খাতিরে কারও সঙ্গে কথা কমিয়ে তাকে প্রায় বয়কট করে বসলে, তা কিন্তু বলা হয়নি। অন্তর্নিহিত হয়ে নামমগ্নতা-সহকারে চলাচল করতে যেমন যতটুকু বাঙ্ নিয়ন্ত্রণ করা দরকার ততটুকুই করতে হবে। কম কথা অভ্যাস করতে গিয়ে নিজে এক-ঘরে হয়ে উঠবে না—নামচর্চা বাড়িয়ে সংযতবাক্ হয়ে সঙ্গ করবে। বাক্ সংযমের মধ্যেও টের পাবে তোমার ভালোবাসা। বুঝতে পারবে তোমার সেবা-সহযোগিতা। তোমার ইষ্টনেশাই মানুষকে মুগ্ধ করে তুলবে, ইষ্টকৃতিতে—ভরপুর থাকার আগ্রহে।

সুরেণ বিশ্বাসের এক প্রশ্নের উত্তরে একবার বলেছিলেন, নামময় ভক্তজনের মধ্যে পারস্পরিক নামের স্পন্দনাঘাত-জনিত ইষ্টপ্রভাব—লাভের কথা। এতে এক জনের নামমগ্নতা অপর জনের মনের মধ্যেও সৃষ্টি করে থাকে ইষ্ট জগতের এক ভাবের তরঙ্গমালা। এ বস্তু অবদ্ধ দুর্লভ— গভীর সক্রিয় ইষ্টময় জীবনের অনুসঙ্গ এটি।

সেদিন হলো ১৯৪৯ সালের ১১ই এপ্রিল সোমবার। ঠাকুর বড়াল বাংলোর বিস্তৃত প্রাঙ্গণে একখান কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট। উপস্থিত ভক্ত— সে·কগণ তাঁকে ঘিরে বসে দেহধারী পরমপুরুষের সঙ্গসুখ ভোগ করছেন এন্তার হয়ে। হঠাৎ তাঁর একটি বেদনাদায়ক স্মৃতি মনের আকাশে ভেসে ওঠায় তিনি যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়লেন।

ব্যাপার কী? সকল ব্যাকুল ভক্ত চিত্তেই এই জিজ্ঞাসা।

ঠাকুর নিজেই বল্লেন, একদিন দেখলাম, একজন লোক পাঁঠা কেটে নিয়ে যাচ্ছে আমার সামনে দিয়ে। আমার মন ছ্যাঁৎ করে উঠলো— মনে হলো, আমাকেই যেন কেটে নিয়ে যাচ্ছে।

'কেমন করে ছাগল কেটে খায়, দ্যাখো। একটা আস্ত জলজ্যান্ত চরে বেড়ানো জীব—তাকে এমন নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা, করে কিনা স্বাদ মিটিয়ে আহার করার জন্যে। খাদক মানুষটির এ সয় কেমন করে? বাইরের গঠনটি ছাড়া—ক্ষুধাতৃষ্ণার অনুভূতিময় সুখ ও দুঃখের চেতনাও তো ওদের আমাদের মতোই। মানুষ বুদ্ধিমান উন্নত জীব হয়ে এটা করে কী করে?'

এক ভক্ত বললেন, 'আপনি তো বলে থাকেন, সব-কিছুরই প্রাণ আছে। কাজেই আমরা নিরামীষাশিরাও প্রাণ হরণের দায়ে পড়ে যাই।'

এই ভাবে জীব হত্যা করার সঙ্গে ধানগাছ থেকে ধান সংগ্রহ করে ভাত রেঁধে খাওয়ার মধ্যে তফাত আছে অনেক। যখন ধান পাকে, তখন ধানগাছের আয়ুই শেষ হয়ে আছে কচি জীবন্ত ধানগাছ থেকে ভাত রাঁধার খাওয়ার মতো ধান পাওয়া যায় না। ধান গাছের জীবনাগ্নগ্নবসান হলে তবে তুমি ধান পাও। গাছেরপাকা আমটি যখন আর গাছে থাকতে পারবে না, তুমি তার কাছাকাছি সময়েই তাকে সংগ্রহ করে থাক। তাছাড়া আমরাই ফসলের চাষ করে থাকি নিজেদের ভোগের জন্যে— তাদের সেবা যত্নও করে থাকি আপন ভেবে। অবশ্য সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে কিছুটা প্রাণিক্লেশাদানের দায়ে পড়তেই হয়। কিন্তু ছাগল কেটে খাওয়া এবং আমগাছ থেকে আম পেড়ে খাওয়ার দোষবহতা এক আইনের একই ধারায় বিচার্য হতে পারে না। তাই, ভূমি-জাত কৃষিপণ্য উৎপাদন করে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা তেমন বিশেষ দোষবহ হয় না।

আবার খেয়ে আত্মরক্ষার কারণে যে সব কৃষিজাত দ্রব্য আমরা উৎপাদন করে থাকি, তাতে সেই সব ফসল মানুষের হাতের পরিচর্যা পেয়ে যথেষ্ট উপকৃত হয়— তাদের জীবনকাল কেবল মনুষ্যহস্তে সুরক্ষিত হয় তাই নয়, কীটপোকার আক্রমণ থেকেও তারা বেঁচে যায় এবং আয়ুকাল সুখ ও সাচ্ছন্দ্যময় হয়ে থাকে।

একদিন বললেন, জীবন শুরুই হচ্ছে ব্রহ্মচর্য থেকে। ব্রহ্মচর্য মানে ব্রহ্মজ্ঞানী গুরুর আশ্রমে থেকে গুরুচর্যার মধ্য দিয়ে তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানে জ্ঞানী হওয়া। এই জ্ঞান হাতে-কলমে শিক্ষালব্ধ জ্ঞান। এ হলো একেবারে মোক্ষম গুরুদত্ত বাস্তব জ্ঞান। হিন্দুধর্মমতে, জীবনের শুরু এইখান থেকে।

ভক্ত শরৎ হালদারমশাই জিজ্ঞেস করলেন, বাইবেলে আছে, ঈশ্বরের জন্য নপুংসক হওয়া চাই। এর মানে কী?

ঠাকুর বললেন, 'এর মানে যে, ঈশ্বরের জন্যে ভক্তের এতটাই প্রেম থাকা চাই যে, তার মধ্যে ঈশ্বর প্রেম ছাড়া অন্য কারও প্রতি তেমন প্রেম থাকবে না। প্রেমের জগতে ঈশ্বরই হবেন তোমার একমাত্র সর্বাত্মক দাবিদার। প্রকৃত ঈশ্বর প্রেম জাগ্রত হলে এই দুনিয়ার পরিচিত প্রেম আর মাথা তুলতে পারে না সেখানে।

তাই সে এক-রকমের অপ্রেমিকতা বা নপুংসকতা। ব্যাখ্যাকে টেনে আরও বললেন, তারা ঈশ্বরীয় ভাব ও ঈশ্বরীয় কর্মে এতই বিভোর থাকে যে, কাম-প্রবণতা তাদের জাগতিক যৌন ব্যাপারে আকর্ষণই করতে পারে না। তাদের প্রেম কেবল ঈশ্বরেই অর্থাৎ জীবন্ত ঈশ্বরবিগ্রহেই নিবেদিত। এদেরই বলতে পারো, জাগতিক প্রেমে নপুংসক।

প্রসঙ্গক্রমে আবার বলেছেন, যারা প্রকৃত ভদ্র ও শিষ্ট, তারা রাগের সময়ে কড়া কথা বললেও ইতরের মতো ব্যবহার করে না। কুৎসিত ভাষায় ও কুৎসিত আচরণের দিকে তাদের মন টানেই না— সকল গরম মুহূর্তেও তাদের কথা ও কার্যের মাত্রাজ্ঞান থাকেই।

যতি-আশ্রম স্থাপিত হবার পর থেকে ঠাকুর প্রায় সব সময়েই যতিদের পিছনে লেগে থাকতেন। ওঁদের মধ্যে প্রায়ই গিয়ে বসতেন এবং ঘনিষ্ঠভাবে মেলা মেশা করে তাঁদের মনের মতো করে গড়ে তুলতে সদা-সচেষ্ট থাকতেন। তিনি যতিদের প্রতি বলতেন, আপনারা শুধু বাত-কে-বাত যতি না হয়ে যদি সত্যিকারের যতি হয়ে যান, তাহলে আর মানুষের অভাব থাকে না। ফলকথা, কায়মনোবাক্যে ষোল-আনা ইষ্টের জন্যে হয়ে ওঠা লাগে। ভালো হওয়ার, হাউস আছে, অথচ মন্দটাও পুষে রাখছি, এইভাবে চললে হবে না। সাফল্যের আবার বিকল্প কী আছে? একমাত্র ইষ্টগুরুকেই সর্বস্ব করে নিয়ে চলতে শিখলেই ইষ্টলাভ হলো। বাজিমাৎ করার অন্য রাস্তা নেই। পেছটানহীন ঊর্জী যতিরাই পারবে মানুষকে ইষ্টগ্রস্ত শুভ পাগল মানুষ করে গড়ে তুলতে।

যতিদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা যদি আদত মানুষ হও, তোমাদের কথা শুনে, তোমাদের চলন-চরিত্র দেখে মানুষ যে কত উপকৃত হবে, তা ভাবতেও আমার মনে শিহরণ জাগে। তোমাদের সেই রূপটা যে কবে দেখতে পাবো, সেই আশাতেই বসে আছি ব্যাকুল ছটফটানি সয়ে। যতিদের সেই আসল রূপটা যে কবে পরমপিতা দেখাবেন!

১৯৪৯ সালের ১৩ই এপ্রিল সেদিন। ঠাকুর ঋত্বিগাচার্যকে বললেন, 'আগামী কাল পয়লা বৈশাখ, সব যতিদের ভজনদীক্ষা দিয়ে দেন। ফিঙে হয়ে লাগুক— দেখেন কী করে!'

বলা দরকার ভজনদীক্ষা এক বিশেষ উন্নততর মানের সাধন-ভজন প্রক্রিয়া যা সৎসঙ্গীদের আরও বেশি ক্রিয়া-পরায়ণ তপস্বী করে তোলে।

তোমাদের প্রত্যেককে সেই ইষ্টচেতন ব্যত্যয়বারণ সর্বশুভংকর সন্ন্যাসীর জীবন-জৌলুশে জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠার দৃশ্যটা চোখের সামনে দেখতে চাই। এই আশা বুকে নিয়েই তোমাদের মুখের দিকে চেয়ে বসে আছি। তোমরা আমার এই দীন আকাঙ্ক্ষা মেটাও। বলো, পারবে না?

আমি বলছি— পারবে। তোমরা যে পরমপিতার সন্তান।

******
****
***
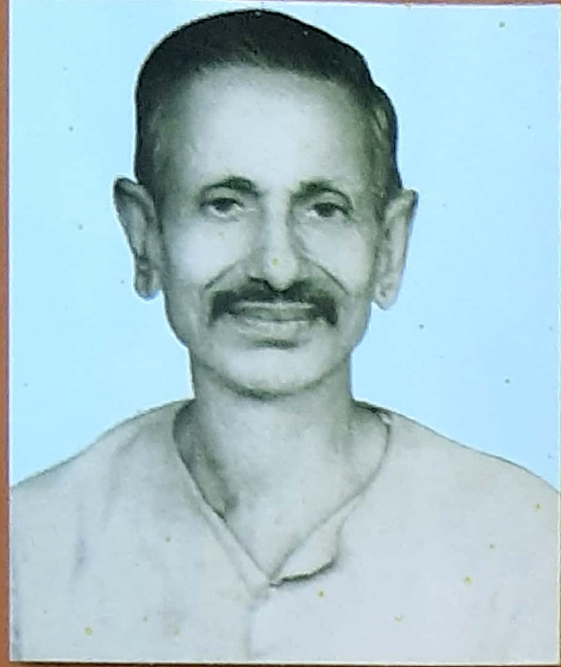
শ্রীনাথ। আসল নাম শ্রীউমাপদ নাথ। জন্মঃ ৬ নভেম্বর ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দ। ২০ কার্তিক ১৩২৭ বঙ্গাব্দ। বাবা কুষ্টিয়ার খ্যাতনামা এড্‌ভোকেট, সৎসঙ্গ কর্ম-আন্দোলনে আত্মনিবেদিত সক্রিয় ব্যক্তিত্ব শ্রীযতীন্দ্রমোহন নাথ। মা শ্রীমতী-মানদাদেবী, নবদ্বীপের মেয়ে। লেখাপড়া নবদ্বীপের মিশনারি স্কুলে। মায়ের পূর্ব-পুরুষের নিবাসভূমি পাটুলীগ্রাম, বর্ধমান, পরিশেষে নবদ্বীপ। নবদ্বীপধামের পোড়ামাতলার অনতিদূরে মহাপ্রভুপাড়ায় শ্রীনাথের জন্ম, মাতুলালয়ে।

পৈত্রিক সূত্রেই প্রেমময় ঠাকুর আর সৎসঙ্গ-আশ্রমের সাথে সম্পৃক্ত। দেশ-বিভাগের পর দেওঘর-আশ্রমে অবস্থানকালে সৎসঙ্গের মাসিক মুখপত্র 'আলোচনা'র সম্পাদনার সাথে সহযোগী ছিলেন কিছুকাল। প্রথম যুগে লিখেছেন মাসিক 'ভারতবর্ষ'-এ, 'প্রবাসী'তে, বিভিন্ন দৈনিকে, সাপ্তাহিকে। প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প।

যে লেখাগুলি তাঁকে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা দিয়েছেঃ

এক. যেমন তাঁকে দেখি
দুই. যেমন তাঁকে বুঝি
তিন. যেমন তাঁকে দেখেছি
চার. শ্রীশ্রীঠাকুরকে যেমন দেখেছি
পাঁচ. The Man of Man.

এক পর্যায়ে বসবাস মেদিনীপুরে। প্রধান অধ্যাপক মেদিনীপুর ডিগ্রি কলেজে। বিষয় বাংলাভাষা ও সাহিত্য। এখন বয়স পঁচাশি। ঠাকুরকে নিয়ে লেখায় আত্মনিবেদিত আজও নিরন্তর।